গৌরকিশোর ঘোষ
গৌরী আইয়ুব
সুশীল ভদ্র

তিন বন্ধুকে

"The answer to fear cannot always be in the dissipation of the external causes of fear , sometimes it lies in courage"

রবার্ট ওপেনহাইমার।

GANATANTRA, SANSKRITI O ABASKHAY
A Collection of Bengali Essays
by
Shibnarayan Ray,
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073

শিবনারায়ণ রায়ের অন্যান্য বই—

প্রেক্ষিত
সাহিত্যচিন্তা
প্রবাসের জার্ণাল
নায়কের মৃত্যু
মৌমাছিতন্ত্র
কথারা তোমার মন
কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা

Radicalism
In Man's Own Image (এলেন রয়ের সঙ্গে)
Explorations
Gandhi, India and the World
I have seen Bengal's face (ম্যারিয়্যান ম্যাডার্নের সঙ্গে)
Autumnal Equinox
Apartheid in Shakespeare & Other Reflections

সূচীপত্র

উদারতন্ত্রের অবক্ষয়

এখন থেকে শ'পাঁচেক বছর আগে পশ্চিম ইয়োরোপে আধুনিক সভ্যতার সূচনা ঘটেছিল। পরের যুগে সেই সূচনারই নামকরণ হয় রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম। গ্রীক্‌রা ইয়োরোপে মনুষ্যত্বের যে জাগরণ ঘটিয়েছিলেন রোমান সভ্যতার পতনের পর তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। একদিকে আর্থিক ব্যবস্থা একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের মান নেমে যেতে থাকে ; অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে খুদে খুদে জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে চলে। জনসাধারণের হতাশার আবহাওয়ায় পূর্বদেশ থেকে আমদানি নতুন এক ধর্মমত দ্রুত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। খৃস্টধর্ম জীবনবিমুখ এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতায় অবিশ্বাসী। এরই আওতায় ইয়োরোপের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও ক্রমে ভাবতে শেখেন যে মানুষ পাপগ্রস্ত জীব ; আনন্দ নয়, বিকাশ নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই মনুষ্যজীবনের সাধনা ; এবং তারি জন্যে স্বেচ্ছায় প্রাতিস্বিকতার বিলোপ ঘটিয়ে, সহজাত কৌতূহলকে সম্মোহিত করে, বুদ্ধির নির্দেশ এবং প্রবৃত্তির তাগিদকে আতঙ্কিত উগ্রতার সঙ্গে দমন করে, কল্পিত দৈবের প্রতিনিধি পুরোহিতকুলের বিধান নির্বিচারে মেনে যাওয়া মানুষের অবশ্য-কর্তব্য। ফলে ইয়োরোপ থেকে বিজ্ঞান এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় ; শিল্প এবং সাহিত্য পুনরাবৃত্তিপ্রধান হয়ে ওঠে ; ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসে ; ভৌগোলিক এবং সামাজিক গতিশীলতার পথে বিধিনিষেধের বাধা বেড়ে চলে ; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নিরক্ষরতা, অত্যাচার এবং সর্বব্যাপী দুর্নীতিকে মানুষ দৈবের অমোঘ বিধান বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়।

এই দুর্দশা থেকে ইয়োরোপের উদ্ধার শুরু হোল রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে।

গ্রীক্‌দের বিস্মৃত সাধনার উত্তরাধিকার পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার ফলে চার্চের একচ্ছত্র শাসনে ফাটল দেখা দিল। সমুদ্রপথ খুলে যাওয়ায় সমাজজীবনে এল গতিশীলতা। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু হোল; উদ্যোগী বণিক এবং কৌতূহলী বুদ্ধিজীবীরা দাবি তুললেন স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন প্রচেষ্টার, স্বাধীন সংগঠনের। আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটল; এবং ষোল শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এই সভ্যতা শুধু পশ্চিম ইয়োরোপের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনল না, তার প্রভাব ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর দিকে দিকে, এশিয়া এবং আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায়। পশ্চিম ইয়োরোপের আধুনিক সভ্যতার আদলে গড়ে উঠতে লাগল মানব-ইতিহাসের প্রথম বিশ্বজনীন সভ্যতা।

আধুনিক সভ্যতার প্রবর্তন এবং বিকাশের মূলে যে সমাজদর্শন তারি নাম উদারতন্ত্র বা লিবর্‍্যালিজম্‌। এর মূল বৈশিষ্ট্য কী তা নিয়ে গত আড়াইশো বছর ধরে পশ্চিমের মনীষীরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। মোটামুটি ভাবে বলা চলে লিবর‍্যাল জীবনদর্শনের মূল কথা হোল, ব্যক্তির বিকাশই সর্ববিধ মানবীয় কল্যাণের উৎস এবং মানদণ্ড; এই বিকাশের জন্য একদিকে দরকার ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অন্যদিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ। তাঁর দেশবাসীদের লিবর‍্যাল আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে আঠারো শতকের শেষভাগে জার্মান মনীষী ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ হুম্বোল্ট্‌ লিখেছিলেন যে যুক্তি সেই ব্যবস্থাকেই মানুষের উপযোগী বলে নির্দেশ দেয় যেখানে মানুষ নিজের চেষ্টায় শুধু নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে না; যেখানে বাহ্য-প্রকৃতিকেও প্রতিটি মানুষ স্বীয় সামর্থ্য এবং অধিকার অনুযায়ী নিজের প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তির নির্দেশে স্বাধীনভাবে রূপান্তরিত করতে পারে।[১]

মধ্যযুগীয় সমাজে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কোনো স্বীকৃতি লাভ করেনি; উচ্চতর কোনো শক্তির নির্দেশ নির্বিচারে মেনে চলাই ছিল ব্যক্তির কর্তব্য। ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরপুত্র যীশু থেকে সেন্ট পিটার, তার থেকে পোপ, তারপর কার্ডিন্যাল-আর্চবিশপ-বিশপ, সম্রাট-রাজা-ভূম্যধিকারী, এইভাবে উচ্চতর শক্তি ধাপে ধাপে নেমে এসে জনজীবনকে সবদিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করত। এই প্রাধিকার-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা এবং জীবনদর্শনের অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে লিবর‍্যালিজম্‌ আবির্ভূত হয়।

ব্যক্তিকে স্বাধীন করার জন্য উদারতন্ত্রের প্রধান নির্ভর ছিল মানুষের সহজাত যুক্তিশীলতা। মধ্যযুগীয় শাস্ত্রকারদের মতে বিচারবোধ প্রাধিকারকে বরবাদ করলে মানুষের চিন্তায়, নীতিবোধে এবং জীবনযাত্রায় ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটা

অবশ্যম্ভাবী। ধর্মশাস্ত্র এবং রাজশক্তির নির্দেশ যদি অনির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়, তবে সাধারণ মানুষ কীভাবে সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিত নির্ণয় করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে উদারতন্ত্রী মনীষীরা দেখালেন যে বিচিত্র, বহুবাচনিক এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার জগতে যুক্তিই নির্ভরযোগ্য ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করে; এবং এই ঐক্যের ওপরে ভিত্তি করে জ্ঞান, নীতিবোধ, আইন-কানুন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির প্রয়োগের ফলে এটাও স্পষ্ট যে সংসারে কোনো সিদ্ধান্তই চরম সত্য নয়; প্রতিটি ধারণা, ব্যবস্থা, রীতিনীতি পরিবর্তনসাপেক্ষ। ফলে উদারতন্ত্রী ব্যবস্থায় কোনো একটি মতবাদ বা বিধানকে জবরদস্তি করে সকলের ঘাড়ে চাপানো হয় না, বিভিন্ন বিকল্প চিন্তাধারাকে সহ্য করা হয়, প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যাতে নানা ধারণার ঘাত প্রতিঘাত এবং বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রকৃষ্টতর ধারণা এবং ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি সিদ্ধান্তকে অভিজ্ঞতা এবং সমালোচনার কষ্টিপাথরে বারবার নতুন করে যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা উদারতন্ত্রের একটি প্রধান লক্ষণ।

উনিশ শতকে উদারতন্ত্রী চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল্ বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য অন্তত তিনটি কারণে সমাজে চিন্তা এবং মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। প্রথমত, কোনো ব্যক্তি বা সিদ্ধান্ত নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবী করতে পারে না; বিপরীত মতের মধ্যেও যেহেতু সত্য থাকা সম্ভব, সেহেতু ঐ মতকে দমন করলে প্রচলিত মতের ভ্রান্তি অপনোদন কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই সীমাবদ্ধ, সেকারণে আমাদের প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্তে যেটুকু বা সত্য থাকে, তাও অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে, তাতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর যাথার্থ্য থাকা সম্ভব। তৃতীয়ত, কোনো প্রচলিত ধারণা যদি সম্পূর্ণ সত্যও হয়, তবু বিরোধী সমালোচনার অভাবে তা ক্রমে অন্ধ সংস্কারে পরিণত হতে বাধ্য; এবং ফলে তা মনের বিকাশে সাহায্য না করে মনের জড়তা সম্পাদন করে।[২] ফলত মধ্যযুগীয় পুরোহিততন্ত্রের অসহিষ্ণু সর্বজ্ঞতার দাবিকে সযত্নে পরিহার করে উদারতন্ত্রী মনীষীরা বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করতে এবং তাদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় ঘটাতে উৎসুক।

উদারতন্ত্রীর দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তিই অনন্য এবং সে কারণে সমান মূল্যবান। প্রতি ব্যক্তিই সৃজনসামর্থ্যের অধিকারী; এই সামর্থ্যের সার্থকায়ন সমাজ

সংগঠনের উদ্দেশ্য। প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের ফলে সমগ্র মানবজাতির জীবন সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়; তাই উদারতন্ত্রী সমাজের একমাত্র কর্তব্য হোল ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ। চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা ও চলাফেরার স্বাধীনতা। যুক্তি একদিকে যেমন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে জ্ঞানকে সম্ভবপর করে, অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ-সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে সমাজব্যবস্থা, নীতিরীতি, আইনকানুনের উদ্ভাবনা ঘটায়। সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়; ব্যক্তির জন্যই সমাজ। উদারতন্ত্রে ব্যক্তির মূল্য স্বতঃসিদ্ধ। অধ্যাপক স্যাবাইন তাই উক্ত সমাজ-দর্শনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঠিকই লিখেছেন যে উদারতন্ত্র অনুসারে স্থায়ী সমাজের ভিত্তি হোল ব্যক্তিমানুষ—তার স্বার্থ, তার উদ্যোগ, তার সুখ এবং সাফল্যের কামনা, বিশেষ করে তার যুক্তি; যে যুক্তি তার অন্যসব ক্ষমতার সার্থক প্রয়োগ সম্ভবপর করে। উদারতন্ত্রের এই ব্যক্তিমানুষ ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় নয়; কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা সামাজিক স্তরের অন্তর্গত নয়, সে শুধু মানুষ, 'প্রভুহীন মানুষ'। উদারতান্ত্রিক চিন্তায় মানুষ উপায় নয়, উদ্দেশ্য। যুক্তি এবং নীতি উভয় দিক থেকেই ব্যক্তি আদি সত্য, সমাজ তার পরে। লিবর‍্যাল্ দার্শনিকদের বিচারে সম্বন্ধের চাইতে বস্তু অধিকতর সত্য। মানুষ সেই বস্তু। সমাজ আসলে সম্বন্ধের বিন্যাস মাত্র।[৩] উদারতন্ত্রী চিন্তা অনুসারে সমাজব্যবস্থায় অধিক-সংখ্যক মানুষের অধিকতর বিকাশের সুযোগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নাম প্রগতি। এই প্রগতি কোনো মানবোর্ধ দৈবশক্তি বা ঐতিহাসিক নির্দেশের ফল নয়। এর উৎস হোল মানুষের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং যুক্তিশীলতা, এবং উভয়ের মিলনের ফলে মানুষের সৃজনধর্ম।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিচালিত জীবনযাত্রার কথা রেনেসাঁসের পূর্বেও উচ্চারিত হয়েছে বটে, কিন্তু উদারতন্ত্রে এই দুটি ধারণা যতখানি অর্থসমৃদ্ধি এবং প্রাধান্য লাভ করেছে, রেনেসাঁসের পূর্বে তার তুলনা চোখে পড়েনা। অনেকের বিশ্বাস যে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য খৃস্টধর্ম থেকে আহরিত। কিন্তু খৃষ্টীয় দর্শনের ব্যক্তি আর উদারতন্ত্রের ব্যক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে ব্যক্তির নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ খৃস্টধর্মের সাধনা; অপরপক্ষে ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাতিস্বিকতার প্রতিষ্ঠা উদারতন্ত্রের আদর্শ। বুর্কহার্ট দেখিয়েছেন যে রেনেসাঁসের জীবনদর্শন অনুসারে 'একক মানুষ' থেকে 'অনন্য মানুষে' বিকশিত হওয়াতেই

ব্যক্তির সার্থকতা ; খৃস্টধর্মে এজাতীয় চিন্তার কোনো ইঙ্গিত নেই। উদারতন্ত্রের অনন্য ব্যক্তি স্বাধীন অনুশীলনের দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বের সর্বমুখী বিকাশে উদ্যোগী ; এরি ফল 'বৈশ্বিক মানব' বা uomo universale।[৪] বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট খৃস্টান দার্শনিক রাইন্‌হোল্ট্‌ নীবুর্‌ও তাই স্বীকার পেয়েছেন যে রেনেসাঁসের 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি' সম্পর্কিত কল্পনার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে খৃস্টান এবং ক্লাসিক চিন্তার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অত্যন্ত অভিনব কল্পনা।[৫] ব্যক্তি সম্বন্ধে এই অভিনব কল্পনা উদারতন্ত্রের দুটি বিশিষ্ট প্রত্যয়ের উৎস। সমাজ-সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হোল সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকারাবলীর প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ ; যে সমাজ বা রাষ্ট্র এই সব মৌলিক অধিকার খর্ব অথবা অপহরণ করতে চায়, তার প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য অকর্তব্য। দ্বিতীয়ত, সামাজিক জীবন ছাড়াও ব্যক্তির একটি একান্ত ব্যক্তিগত জীবন আছে ; এই ক্ষেত্রে সমাজের হস্তক্ষেপ অন্যায় এবং অসহ্য। ব্যক্তির ব্যক্তিগত (private) এবং সামাজিক (public) জীবনের মধ্যে এই পার্থক্যের কল্পনা উদারতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ।

যুক্তিপরিচালিত জীবনযাত্রা বিষয়ে উদারতন্ত্রী চিন্তা ধর্মীয় চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। খৃস্টধর্মেও যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু যুক্তি সেখানে বিশ্বাসের ভৃত্য। খৃস্ট, ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত মহাপুরুষরা এবং চার্চ যেসব নির্দেশ দিয়েছেন, তা বিচারোর্ধ ; যুক্তি শুধু তার ব্যাখ্যা করতে পারে, বিচার করতে পারে না। রিফর্মেশ্যনের সময়ে চার্চের প্রাধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল বটে, কিন্তু বাইবেলের অথরিটি সম্বন্ধে কোন খৃস্টানের মনে সংশয় ছিল না। বস্তুত লুথার এবং কালভাঁ এদিক থেকে ক্যাথলিকদের চাইতেও বেশী গোঁড়া এবং অসহিষ্ণু ছিলেন।[৬] রেনেসাঁসের মনীষীরাই প্রথম যুক্তিকে জ্ঞান এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একমাত্র অথরিটি রূপে স্বীকার করেন। আর্ণ্‌স্ট্‌ কাসিরার লিখেছেন যুক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতা মধ্যযুগীয় দর্শনে অকল্পনীয়।[৭] শাস্ত্রবচন, গুরুবাদ এবং অপরোক্ষানুভূতির জায়গায় রেনেসাঁস যুক্তিকে জ্ঞান এবং নীতিবোধের মুখ্য নির্দেশক হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যুক্তিশীলতা মানুষের অন্যতম সহজাত বৈশিষ্ট্য। এরি সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে একটি সাধারণ ধারণার সূত্রে গ্রথিত করতে পারে ; কোনো ধারণার মধ্যে অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা বা স্ববিরোধ থাকলে তা দূর করতে পারে ; জগতের ঘটনাক্রম থেকে সাধারণ নিয়ম কল্পনা করতে পারে ; কল্পিত নিয়মের যাথার্থ্য নিরূপণ করতে পারে।

আবার যুক্তির সাহায্যেই মানুষ উচিত-অনুচিত নির্ণয় করতে সক্ষম। প্রতিটি মানুষ অনন্য হওয়া সত্ত্বেও সব মানুষের মধ্যেই একটি সাধারণ মানবীয় প্রকৃতি বর্তমান। যুক্তিশীলতা একদিকে এই সাধারণ মানবপ্রকৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ; অন্যদিকে যুক্তির সাহায্যে মানবপ্রকৃতির নিত্য প্রয়োজন এবং প্রক্রিয়াবলী আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। উদারতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারাবলী এইসব সামান্য এবং নিত্য মানবীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতেই নিরূপিত হয়ে থাকে। যে সব বিধিব্যবস্থা বা নিয়মকানুনের দ্বারা উদারতান্ত্রিক সমাজসংগঠন পরিচালিত হয়, মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণের দ্বারা যুক্তিই সেগুলিকে প্রথম কল্পনা করে। উদারতন্ত্রের অন্যতম আদি প্রবক্তা গ্রোটিয়সের ভাষায় যুক্তি যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে, তেমনি মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করে নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে। সামাজিক নিয়মকানুন এই নৈতিক নিয়মের স্বীকার মাত্র।[৮] মৌলিক অধিকার এবং নৈতিক নিয়মের উৎস হোল মানবপ্রকৃতি; যুক্তির নির্দেশের ফলে তারা ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে স্বীকার লাভ করে।[৯] উদারতন্ত্র অনুসারে সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভয়ে আইনকানুন মেনে চলা বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নয়; যুক্তিশীলতাই নিয়মানুগত্যের যথার্থ ভিত্তি। তাই যে নিয়ম যুক্তি-বিরোধী তা যত প্রাচীন হোক, তার পেছনে রাষ্ট্রশক্তির যতখানি সমর্থনই থাক, উদারতন্ত্রীর মতে তা অমান্য করা ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য।

উদারতন্ত্রের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং যুক্তিনির্ভর জীবনদর্শন রেনেসাঁসের যুগেই প্রথম ইয়োরোপের মনীষীদের রচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এরি প্রভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা দেয়, শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি নিত্য নতুন প্রতিভার উন্মেষ সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে মুষ্টিমেয় অভিজাতদের একচেটিয়া ক্ষমতা ক্রমে অপহৃত হয়ে সাধারণ নাগরিকদের নানা মৌল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নত হয়, ব্যাধি এবং অকালমৃত্যুর প্রকোপ কমে, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে, গ্রামীণ সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের সুযোগ বাড়তে থাকে। যন্ত্রবিপ্লবের পর উদারতন্ত্র আর পশ্চিম ইয়োরোপে আবদ্ধ না থেকে দূরদূরান্তরের দেশে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। পশ্চিম থেকে আগত উদারতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে উনিশ শতকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণের সাড়া জেগেছিল। এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অধ্যাপক হব্‌হাউস তাঁর লিবর‍্যালিজম্ নামে প্রামাণ্য গ্রন্থে তাই নিঃসংকোচে লিখেছিলেন, "উদারতন্ত্র হোল আধুনিক সভ্যতার সর্বব্যাপী প্রাণশক্তি।"[১০]

॥ দুই ॥

তারপর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। এক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং আরেক যুদ্ধের সূচনার মাঝখানে বিশ বছরের মধ্যে একটির পর একটি দেশে উদারতন্ত্রবিরোধী বিভিন্ন মতবাদ এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোল। রাশিয়া, ইতালি, পর্তুগাল, জার্মানী, স্পেন প্রমুখ দেশে সমষ্টিগত স্বার্থের নামে মুষ্টিমেয় কিছু কিছু লোক সর্ববিধ ক্ষমতা দখল করল। ফাসিজ্‌ম্ এবং কম্যুনিজ্‌ম্ দুই-ই স্পষ্টভাবে উদারতন্ত্রবিরোধী। মতবাদের দিক থেকে প্রথমটি জাতির কাছে এবং দ্বিতীয়টি শ্রেণীর কাছে ব্যক্তিকে বলি দিতে উদ্যোগী ; ব্যবহারের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের ক্রীতদাস মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে প্রধান কয়েকটি ফাসিস্ত্ রাষ্ট্র পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে কোথাও বা ফাসিজ্‌ম্, কোথাও বা কম্যুনিজ্‌মের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

উদারতন্ত্রের এই ব্যাপক অবক্ষয়ের কারণ কি ? গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে পশ্চিমের মনীষীরা বিভিন্ন দিক থেকে এ প্রশ্নের বিচার করেছেন। নানা জনের নানা মত। ইতালিয়ান দার্শনিক মাসিমো সাল্‌ভাদোরীর "লিবর‍্যাল ডিমোক্র্যাসি" গ্রন্থে এবিষয়ে কিছু মূল্যবান আলোচনা আছে। সাল্‌ভাদোরী আজীবন ফাসিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং ফলে তাঁকে দীর্ঘকাল স্বেচ্ছানির্বাসনে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতে উদারতন্ত্রের ওপর তাঁর আস্থা কমেনি। উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য, এজাতীয় ঐতিহাসিক জ্যোতিষে তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন না ; কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য উদারতন্ত্র অপরিহার্য, এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

সাল্‌ভাদোরীর মতে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা স্ফুরিত না হওয়া পর্যন্ত উদারতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। উদারতান্ত্রিক আদর্শের কোন মৌল ত্রুটির জন্য আজকের যুগে উদারতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েনি ; আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষ আজো স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত

হয়নি বলেই উদারতন্ত্রবিরোধী নানা মতবাদ এবং আন্দোলন এত প্রবল হয়ে উঠতে পেরেছে। আদিম যুগ থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত ; বেশীর ভাগ মানুষ এখনো আপন আপন অনন্যতা বিষয়ে সচেতন পর্যন্ত হয়নি। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণী অথবা জাতি কেন্দ্রিক সমষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবী তাদের মনে আবেগ সৃষ্টি করে বটে ; কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা তাদের কাছে এখনো একটা শব্দ মাত্র। যন্ত্রবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে ; তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ; কিন্তু সেই অনুপাতে মানুষের মন পরিণত হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে বহু শতাব্দী ধরে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার মূল প্রত্যয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, তার আদর্শ হোল গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির আত্মবিলোপ। যারা বহু পুরুষ ধরে শাস্ত্রের অনুশাসন এবং গুরু কিংবা পুরোহিতের নির্দেশ মানতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে রাতারাতি নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে ওঠা সহজসাধ্য নয়। উদারতন্ত্রের প্রসারের ফলে এইসব গোষ্ঠীবাদী এবং কর্তাভজা প্রাচীন ঐতিহ্যের মূলে ধাক্কা লেগেছে ; ফলে এইসব ঐতিহ্যে যারা অভ্যস্ত তারা আজ একযোগে উদারতন্ত্রের বিনাশে উদ্যোগী।

তাছাড়া যন্ত্রবিপ্লবের ফলে অনেক নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছে। যদি সাধারণ মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রবৃত্তি এবং স্বাধীনতার অর্থ বিষয়ে বোধ বিকশিত হত, তাহলে এসব সমস্যা মানুষকে বিভ্রান্ত না করে তার সৃষ্টিপ্রতিভাকে সক্রিয় করে তুলত। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশ না হওয়ায় যন্ত্রবিপ্লব সমাজজীবনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে। অন্যদিকে, উদারতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আইনের চোখে সাধারণ মানুষের নানা অধিকার স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সেসব অধিকারের অর্থ আজো তাদের কাছে অস্পষ্ট। ফলে সাধারণ মানুষের এই মানসিক অপরিণতির সুযোগে রাষ্ট্র জনকল্যাণের নামে নিজের হাতে নানা দায়িত্ব এবং ক্ষমতা গ্রহণ করে চলেছে। এযুগের সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার এই হোল পটভূমি।[১১]

সাল্‌ভাদোরীর বিচারে উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোনো সমাজের আর্থিক উন্নতির ওপরে নির্ভরশীল নয়। উদারতন্ত্রের প্রধান শর্ত হোল মানুষের মনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ। আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও দাসব্যবস্থা সম্ভব ; প্রাচীন বহু অত্যাচারী রাষ্ট্র এবং আধুনিককালে নাট্‌সী জার্মানী এবং কম্যুনিস্ট রাশিয়া তারই প্রমাণ। কিন্তু স্বাধীনতার মূল্যবোধ জাগ্রত

হোলে তার তাগিদে আর্থিক, রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের স্ফুরণের ফলে মানুষ বুঝতে শেখে যে কোনো একটি-মাত্র উদ্দেশ্যের ছাঁচে সব মানুষের সাধনাকে ঢালার চেষ্টা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। তাছাড়া একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করা সম্ভব। এবং ফলাফলের দিক থেকে উদ্দেশ্যের চাইতে উপায়ের মূল্য কম নয়। বিভিন্ন বিকল্পের ঘাতপ্রতিঘাত মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। অধিকাংশ লোকের সমর্থনের জোরে কোনো সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় না। গোঁড়ামির অভ্যাস থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। পৃথিবীর জন-সাধারণকে স্বাধীন চিন্তায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তবেই আধুনিক সভ্যতা বিশ্বব্যাপী উদারতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণতি লাভ করবে। এই শিক্ষার অভাবই উদারতন্ত্রের সমকালীন সঙ্কটের মূল কারণ।

॥ তিন ॥

সাল্‌ভাদোরী উদারতন্ত্রের সঙ্কট নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন ওঠে, এশিয়া, আফ্রিকা, এবং লাতিন আমেরিকায় না হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাব উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে; কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপে উদারতন্ত্রের সমকালীন অবক্ষয়ের কারণ কি? প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদিকে কম্যুনিজ্‌ম্ এবং অন্যদিকে ফাসিজ্‌ম্-এর আঘাতে ইয়োরোপে উদারতন্ত্র এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল কেন? যে ইতালিতে রেনেসাঁসী জীবনবোধের প্রথম প্রস্ফূরণ ঘটেছিল, সেখানে মুসোলিনীর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিপত্তির কারণ কি? গোয়েটের জন্মভূমি জার্মানীতে নাট্‌সীরা কি করে ক্ষমতায় এল? তার চাইতেও যা বিস্ময়কর, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর দেশ ফ্রান্স কেন দ্য গলের একনায়কত্ব মেনে নিয়েছিল? ইংল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশ কটি বাদ দিলে পশ্চিম ইয়োরোপের কোথায়ই বা উদারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, অথবা টিকে আছে?

উদারতন্ত্রী ঐতিহাসিক স্যালুইন শাপিরো তাঁর একটি গ্রন্থে এপ্রশ্নের আংশিক জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন।[১২] আংশিক, কেননা তাঁর আলোচনা শুধু ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তিনি উদারতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শুধু ফাসিজ্‌ম্-এর উদ্ভবের কয়েকটি সূত্র নিয়ে বিচার করেছেন। শাপিরো-র বিশ্লেষণ অনুসারে বিংশ শতাব্দীতে ফাসিজ্‌ম্-এর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটলেও উনিশ শতকের ইতিহাসের মধ্যে তার

প্রস্তুতি চোখে পড়ে। মধ্যযুগের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা এবং নিগ্রহনির্ভর জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে কিছু মনীষীর বিদ্রোহ হিশেবেই পশ্চিম ইয়োরোপে প্রথম উদারতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। আবার ঐ একই কালে কৃষিনির্ভর সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নগরবাসী বণিক ও ব্যবসায়ীদের সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামে শেষোক্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে উদারতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। কিন্তু উদারতন্ত্র কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের দর্শন নয়; তার নির্দেশ হোল সব মানুষের মধ্যে মুক্তিস্পৃহা এবং যুক্তিশীলতার বিকাশ ঘটানো। যে সমাজে উদারতন্ত্রের এই সর্বজনীন নির্দেশ স্বীকার লাভ করেছে, সেখানে উদারতন্ত্র পরিণতি পেয়েছে লিবর্যাল গণতন্ত্রে। কিন্তু যে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী উদারতন্ত্রের এই নির্দেশ মেনে নেয়নি, সেখানে জনসাধারণের দাবিদাওয়ার চাপে বুর্জোয়ারা ক্রমেই উদারতন্ত্রবিরোধী হয়ে উঠে অবশেষে ফাসিজ্‌ম্ বা জুলুমতন্ত্রের আশ্রয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা পেয়েছে।

এই পার্থক্য বোঝাবার জন্য শাপিরো সবিস্তারে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের ইতি-হাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের রক্তহীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডে উদারতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত গত প্রায় তিনশো বছরের মধ্যে ওদেশে এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের, একদলের সঙ্গে অন্যদলের বহুবার বিরোধ ঘটেছে বটে, কিন্তু কোন পক্ষ বিজয়ী হয়ে অন্যপক্ষের উচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করেনি। একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে নয়, রফার মাধ্যমে বিলেতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক, বহুবিধ সংস্কার সাধিত হয়েছে। ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী কোনো আকস্মিক বিপ্লব ঘটিয়ে জমিদারদের ধ্বংস করার প্রয়াস করেনি; শেষোক্তদের ক্ষমতা এবং বিত্তপসার ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে তাদের বুর্জোয়াসমাজের অংশীভূত করেছে। পরে উনিশ শতকে যখন বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংগ্রাম দেখা দিল, তখন এই রফার অভ্যাসের ফলে সে সংগ্রাম গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত না হয়ে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে পরিণতি লাভ করল। বিলেতেও যে ফাসিজ্‌ম্-এর কোন প্রবক্তা দেখা দেননি, তা নয়; শাপিরো উদাহরণ হিসেবে কার্লাইলের উদারতন্ত্রবিরোধী চিন্তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ফাসিজ্‌ম্ বিশেষ প্রভাব ছড়াতে পারেনি। কারণ ওদেশে রক্ষণশীল দলও উদারতন্ত্রে বিশ্বাসী। ফলে স্রেফ

জনসমর্থনের জোরেই ওদেশে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসতে পারে ; তার জন্যে কোনো রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন ঘটে না। ইংল্যাণ্ড তাই মহাসঙ্কটের সময়েও ডিক্‌টেটরী ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয় নি।

অপরপক্ষে ফ্রান্সে বুর্জোয়ারা উদারতন্ত্রকে শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠার উপায়মাত্র হিশেবে গ্রহণ করেছিল ; উদারতন্ত্রী জীবনবোধের দ্বারা তারা উদ্বুদ্ধ হয়নি। ফলে ফরাসী বিপ্লব পর্যবসিত হোল "রেন্ অব টেরর"এ, এবং তারি প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল নাপোলিয়নী ডিক্‌টেটরশিপ্। বুর্জোয়ারা চার্চ এবং অভিজাতশ্রেণীকে উৎখাত করার ফলে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি শেষোক্তদের কোনো আনুগত্য গড়ে উঠল না ; এব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানোই হয়ে উঠল এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যদিকে উনিশ শতকে যন্ত্রবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াদের নতুন শত্রু হিসেবে দেখা দিল শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়ারা রফা করতে শেখেনি। ফলে দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে তাঁরা ক্রমেই সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে লাগল। উদারতন্ত্রের সম্প্রসারণ-শীল জীবনবোধকে বর্জন করে তারা রাষ্ট্রকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ টিকিয়ে রাখার যন্ত্র হিশেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল। ফ্রান্সে উদারতন্ত্র বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে না উঠে শুধু নিষ্প্রাণ নিয়মকানুনে পর্যবসিত হোল। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ ফরাসী বুর্জোয়াদের আত্ম-পরীক্ষার যুগ। ১৮৪৮-এর পর থেকে ফরাসী বুর্জোয়ারা প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে শুধু নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হোল। ফরাসী জনসাধারণও উদারতান্ত্রিক সহনশীলতা এবং সহযোগিতার আদর্শে দীক্ষিত হয়নি। ফলে ঘটল আবার বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা, আর তারি প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হোল লুই নাপোলিয়ঁর ডিক্‌টেটরশিপ্। ফ্রান্সে গণতন্ত্রের সঙ্গে উদারতন্ত্রের মিলন ঘটল না। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীর উগ্র সংঘাতের মধ্যে উদারতন্ত্রের সমাধি রচিত হোল।

শাপিরোর মতে ইতিহাসের ধারায় এই পার্থক্যের ফলে ইংল্যাণ্ডে জন-স্টুয়ার্ট মিলের মত মনীষী বুর্জোয়া উদারতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক উদারতন্ত্রে বিবর্তনের পথ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পেরেছিলেন ; এবং সেকারণে তাঁর চিন্তা শ্রেণী অথবা দল নির্বিশেষে ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পেরেছে। অপরপক্ষে তাঁরই সমসাময়িক ফরাসী উদারতন্ত্রী আলেক্‌সিস্ দ্য তক্‌ভিল স্বদেশে উদারতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং এ-দুয়ের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্য তাঁর

আজীবন প্রয়াস আপন দেশবাসীর ওপরে প্রায় কোন প্রভাব ফেলেনি। আবার যেক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে কার্লাইলের বীরপূজার আদর্শ সমাজের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি, সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সে প্রুধঁর প্রচ্ছন্ন শক্তিবাদ বৈনাশিকতার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। ফরাসী দেশে উদারতান্ত্রিক জীবনবোধ শেকড় ছড়াতে না পারার ফলে সেখানে অভিজাত সম্প্রদায়, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে কোনো সহযোগিতার ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতে হিটলারী আক্রমণের সামনে ফ্রান্সের পতন তাই আকস্মিক নয়, প্রত্যাশিত।

॥ চার ॥

সালভাদোরী এবং শাপিরো-র বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক সার কথা আছে। কিন্তু উদারতন্ত্রের সমকালীন অবক্ষয়ের ব্যাখ্যা হিশেবে তাঁদের যুক্তি অন্তত আমার কাছে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ঠেকেছে। এঁরা দুজনেই আমাদের যুগে উদার-তন্ত্রের যেটি মূল সমস্যা সেটিকে যেন অনেকটা এড়িয়ে গেছেন। রেনেসাঁস থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত উদারতন্ত্র ছিল সম্প্রসারণশীল সমাজ-দর্শন; ঐ সময়ে জীবনের দিকে দিকে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। অপরপক্ষে বর্তমান শতাব্দীতে উদারতন্ত্রের প্রভাব ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। শুধুতো এশিয়া কিম্বা আফ্রিকা নয়, পশ্চিম ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতেও কি উদারতন্ত্রের সমর্থন ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে না? জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জার্মানী এবং জাপানে শিক্ষার ব্যাপক বন্দোবস্ত সত্ত্বেও জনসাধারণ উদারতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে স্বৈরতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের দ্বারা এত প্রভাবান্বিত হোল কেন? আমাদের দেশেও হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর প্রধান সমর্থন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই আসছে না? ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে জার্মানীর মত অনগ্রসর দেশেও যখন হ্যানোভারের সরকার দেশের গঠনতন্ত্রকে বরবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন দেশের চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হিশেবে গোয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। একশ বছর পরে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে হিটলারী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জার্মান মনীষীরা বিশেষ কোনো প্রতিবাদ তো করলেনই না, বরং তাঁদের অনেকেই নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এর কারণ কী? পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জ্ঞানীগুণী-সমাজ কয়েক বছর ধরে যে বিনা প্রতিবাদে অসহায়

আতঙ্কে ম্যাকার্থির হুমকির সামনে মৌন অবলম্বন করেছিলেন, সালভাদোরী বা শাপিরোর যুক্তি দিয়ে উদারতন্ত্রীদের এই ক্লৈব্যকেই বা কী ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এমনকি ব্রিটেনেও যে সংগঠন হিসেবে উদারতন্ত্রীরা নিতান্ত দুর্বল, সেখানেও যে জনকল্যাণের নামে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে চলেছে, তারই বা হেতু কী? পৃথিবীর কোনো দেশেই যে আজ তার তরুণসমাজ উদারতন্ত্রে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে না, এটাই কি উক্ত জীবনদর্শনের সম্প্রতিকালে প্রধান সমস্যা নয়?

আমি মোটামুটিভাবে উদারতান্ত্রিক জীবনদর্শনে শ্রদ্ধাবান, এবং সে কারণে এই জাতীয় নানা প্রশ্ন অনেকদিন ধরেই আমাকে পীড়িত করে এসেছে। এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে দুটি বইতে ইংরেজি ভাষায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি; কৌতূহলী পাঠক বই দুটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখতে পারেন।[১৩] এখানে শুধু সংক্ষেপে এই সমস্যা বিষয়ে আমার মূল বক্তব্যটি পেশ করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি আধুনিক ইতিহাসের সূচনায় উদারতন্ত্র ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সমাজদর্শন হিশেবেই গড়ে উঠেছিল। এই সমাজদর্শন যে বৃহত্তর জীবনদর্শনের অংশ তার নাম মানবতন্ত্র। মানবতন্ত্রের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা ছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক—অর্থাৎ এক কথায় বুদ্ধিজীবী। মধ্যযুগের খৃস্টান ধর্ম এবং জমিদারতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা, এমন কি বিকাশের ইচ্ছাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে এনেছিল, তখন এই বুদ্ধিজীবীরাই উক্ত আত্মঘাতী ঐতিহ্যের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জমিদার এবং পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁদের এই প্রয়াসের বিরোধিতা করেছিল, আর নিজেদের স্বার্থেই তখনকার সংখ্যালঘু বণিক সম্প্রদায় এ প্রয়াসের সমর্থক হয়ে উঠেছিল। ক্রমে বণিক এবং ব্যবসায়ী-সমাজ উদারতন্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল; কিন্তু তার ফলে উদারতন্ত্রের সঙ্গে মানবতন্ত্রের যোগ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এল। মানবতন্ত্র ব্যক্তিকে শুধু অনন্য এবং সৃষ্টিশীল প্রাণী হিশেবে কল্পনা করেনি; তার মধ্যে যে বহুমুখী বিকাশের সম্ভাবনা বর্তমান, তার ওপরেও জোর দিয়েছে। কিন্তু আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমের দেশে দেশে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মানুষ সম্বন্ধে উদারতন্ত্রীদের ধারণায় অলক্ষিতভাবে একটা গভীর পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তনের কিছুটা পূর্বাভাস সতেরো শতকেই ইংল্যাণ্ডের পিউরিট্যান আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল।

ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিপোষিত উদারতান্ত্রিক জীবনদর্শনে সৃষ্টির চাইতে উৎপাদন প্রাধান্য পেল; সম্ভোগ এবং বিকাশের চাইতে সঞ্চয় এবং সম্পত্তির ওপরে বেশী ঝোঁক পড়ল। মানুষের অন্যসব সম্ভাবনাকে অবহেলা করে তার বৈষয়িক দিকটাকেই সব চাইতে বড় করে ধরা হোল। উনিশ শতকের উদারতন্ত্রীদের দর্শনে রেনেসাঁসের বৈশ্বিক মানুষ (uomo universale) পর্যবসিত হোল বিষয়সর্বস্ব মানুষে (economic man)।

মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে এইভাবে খর্ব করার ফলে শুধু যে মনের সম্পদে উনিশ শতকের উদারতন্ত্রী সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হোল তাই নয়। হিশেবী বুদ্ধিকে সংসারের সেরা জিনিষ বলে উপস্থিত করার ফলে একদিকে শিল্পী ও মনীষীরা এবং অন্যদিকে আদর্শবাদী তরুণ সমাজ ক্রমেই উদারতন্ত্রের ওপরে বিমুখ হয়ে উঠল। তরুণ সমাজের ব্যর্থকাম আদর্শবাদ ক্রমে বিকৃত হয়ে উদারতন্ত্র-বিরোধী নানা উগ্র সমাজদর্শনের দিকে চালিত হয়েছে। আবার গত দেড়শো বছর ধরে তাই শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমরা উদারতন্ত্রের সব চাইতে কড়া সমালোচক হিশেবে দেখি। ব্যবসায়ীদের সঙ্কীর্ণ হিশেবী-বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় এঁরা ক্রমেই উদারতান্ত্রিক সমাজ-সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। উদারতান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কল্পনার এই বিযুক্তি আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় রোমান্টিক আন্দোলনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈষয়িকতার প্রতি আক্রোশবশত রোমান্টিকরা জীবনের কেন্দ্র থেকে যুক্তিশীলতাকেই বরবাদ করলেন; যুক্তির বদলে আবেগ, পরীক্ষাসাপেক্ষ সিদ্ধান্তের বদলে অপরোক্ষানুভূতি তাঁদের কল্পনায় জীবনের নিয়ামকরূপে প্রতিভাত হোল। মানবতন্ত্র ব্যক্তির মনে বিভিন্ন বৃত্তির বিরোধকে যুক্তির সাহায্যে নিরসন করে সৌষম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিল; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত-সম্ভাবনাকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে সমাজে বহুবাচনিক ঐক্য গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছিল। যুক্তির পথ ত্যাগ করে রোমান্টিকরা ব্যক্তির মনে সংঘাতজাত আবেগকে প্রাধান্য দিলেন; সমন্বয়কে অগ্রাহ্য করে তাঁরা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধকে প্রবল করে তুললেন। সংস্কারের চাইতে বিপ্লব, পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের চাইতে অপরিস্ফুট সাংকেতিকতা, বিকাশের চাইতে বিক্ষোভ তাঁদের বেশী আকৃষ্ট করল। তাছাড়া রোমান্টিকরা প্রথমে ব্যক্তির অনন্যতার ওপরে জোর দিলেও ক্রমে সেই অনন্যতার কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি না খুঁজে পেয়ে অনাত্মবাদী হয়ে উঠলেন, আর না হয় গোষ্ঠীসত্তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার নিমজ্জনকে মোক্ষ বলে কল্পনা করলেন।

মানবতন্ত্র সর্বমানবীয় ঐক্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মিলন ঘটিয়েছিল ; রোমাণ্টিকরা উভয় কল্পনাকেই বর্জন করে জাতিগত গোষ্ঠীসত্তাকে প্রাধান্য দিলেন।[১৪]

মানবতন্ত্রের বৈশ্বিক মানবকে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের বৈষয়িক মানবে পর্যবসিত করে উদারতন্ত্র একদিকে শিল্পীসাহিত্যিক এবং আদর্শবাদীদের বিরাগভাজন হয়ে উঠল ; অন্যদিকে এই রূপান্তরের অন্তর্নিহিত যুক্তির চাপে উদারতন্ত্রের মূল প্রত্যয়গুলি ক্রমেই শীর্ণ এবং দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। উনিশ শতকের গোড়া থেকে দেখা যায় যে উদারতন্ত্রের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তির সৃজন-সামর্থ্যের চাইতে ইতিহাসের নিয়ামকশক্তির ওপরে বেশী জোর দিচ্ছেন ; মার্ক্সের ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থন তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালীন উদারতন্ত্রীদের রচনাতে মোটেই দুর্লভ নয়। আবার উনিশ শতকে উদারতন্ত্র ক্রমেই পজিটিভিস্ট চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী উদারতন্ত্রীরা ব্যক্তির মূল্য এবং মানুষের মৌলিক অধিকারাবলীকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধারণা করেছিলেন ; তাঁদের বিচারে সামাজিক নিয়মকানুনের যথার্থ ভিত্তি হোল মানুষের যুক্তিশীলতা। পজিটিভিজ্‌মের প্রভাবে পরবর্তী-কালের উদারতন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে অধিকারের উৎস মানুষের সর্বজনীন প্রকৃতি নয়, তার ভিত্তি হোল সামাজিক নির্দেশ এবং দেশের গঠনতন্ত্র ; নিয়ম-কানুন লোকে করে এবং মানে যুক্তির জন্য ততটা নয়, যতটা নিয়মানুবর্তিতার প্রভাবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাপে। অধ্যাপক হ্যালোয়েল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে পজিটিভিজ্‌ম্‌-এর আওতায় উনিশ শতকের শেষভাগে উদারতন্ত্রীরা নিজেরাই বিশ্বাস করতে শেখে যে মৌলিক অধিকার যেহেতু রাষ্ট্রের দান, সেহেতু ইচ্ছা করলে রাষ্ট্র এই সব অধিকার হ্রাস করতে পারে, এমনকি উচ্ছেদও করতে পারে।[১৫] পজিটিভিজ্‌ম্‌ উদারতন্ত্রীদের মনে ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে বিশ্বাস শিথিল করে আনে ; ব্যক্তির অধিকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রের নির্দেশের ওপরে নির্ভরশীল করে ; উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বোধকে যুক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত না রেখে সাময়িক লাভ-লোকসানের হিশেব দিয়ে নিরূপিত করতে শেখায় ; মূল্যমানের মধ্যে সর্বজনীনতার সন্ধান ত্যাগ করে তার আপেক্ষিকতাকেই প্রধান করে তোলে। এইভাবে উদারতন্ত্রের প্রত্যয়গত প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে অবসিত হয়ে আসে ; ক্রমে তা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোতে পর্যবসিত হয়। ফলে বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন উদারতন্ত্রবিরোধী মতবাদ এবং আন্দোলন যখন প্রকাশ্যভাবে উদারতন্ত্রকে আক্রমণ করে, তখন তার বিরুদ্ধে উদারতন্ত্রীদের তরফ থেকে

বলিষ্ঠ প্রতিরোধের প্রচেষ্টাও যে দেখা যায়নি, এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়।

একদিকে যেমন উদারতন্ত্র ক্রমেই তার মূল মানবতন্ত্রী প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণের ক্ষমতা হারাতে শুরু করে, অন্যদিকে তেমনি তার আদর্শের উপযোগী সমাজসংগঠন গড়তে না পারার ফলে উদার-তন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উদারতন্ত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা প্রায় সব দেশেই আজ ব্যর্থ প্রতিপন্ন। উদারতন্ত্র সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে গভীর বৈষম্য দূর করার কোনো কার্যকরী পন্থা বার করতে পারেনি। সমাজে যদি মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে প্রচুর বিত্ত এবং ক্ষমতা সঞ্চিত থাকে, আর বাকি মানুষেরা যদি দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অসংগঠিত হয়, তাহলে যে যার ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে চললেই সমাজে ন্যায়সঙ্গত সৌষম্যের প্রতিষ্ঠা ঘটবে, এ প্রত্যাশা নিতান্তই অবাস্তব। প্রতিযোগিতার স্বপক্ষে অবশ্যই অনেক কিছু বলার আছে; কিন্তু প্রতিযোগিতার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে শক্তিমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে দুর্বলদের লোপ পাওয়াটাই স্বাভাবিক, তাহলে সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই সেই স্বাভাবিক নিয়মকে স্বাগত করবে না। অথচ ডারউইন্-এর "প্রাকৃতিক নির্বাচন" তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে উনিশ শতকের শেষভাগে অনেক বুদ্ধিমান লেখক এই অন্যায়কে সমর্থন করেছিলেন। মানুষে-মানুষে বৈচিত্র্য বজায় রেখে বৈষম্য দূর করা যে মানবীয় সমাজসংগঠনের যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য, মানবতন্ত্রীরা এ বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হয়ে উনিশশতকী উদারতন্ত্র এই দায়িত্বের কথা ভুলতে বসেছিল। যন্ত্রবিপ্লবের ফলে উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় ধনিক-শ্রমিকের বৈষম্য যখন আরো প্রকট হয়ে উঠল, তখন সেই বৈষম্য দূর করার নামে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান ক্রমেই নিজের হাতে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত করতে লাগল। ইতিমধ্যে উদারতন্ত্রী চিন্তাধারার প্রভাবে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে নির্বাচননির্ভর পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসারিত হতে শুরু করেছে। আইন-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার মুষ্টিমেয় বিত্তবান সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সর্বসাধারণের অধিকার হিশেবে দেশে দেশে কমবেশী স্বীকৃতি পাচ্ছে। ফলে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের সমর্থনে রাষ্ট্রের কৈফিয়ৎ হোল যে রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রতিভূদের নিয়েই গঠিত; অতএব রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিত্তবানের স্বার্থরক্ষায় প্রযুক্ত না হয়ে জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োজিত হবে।

আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের এই দাবি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফলে জনসাধারণ ক্রমেই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠেছে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে।

কারণ পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার অনেক গুণ থাকলেও এ ত্রুটি অনস্বীকার্য যে জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সে ক্ষমতার কার্যকরী প্রয়োগের সুযোগ এ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জনসাধারণ কয়েক বছরে একবার করে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায়; কিন্তু তারপর সেই প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপের ওপরে তাদের আর প্রায় কোনোই হাত থাকে না। তাছাড়া প্রতিনিধি নির্বাচনেও তাদের স্বাধীন বাছাইয়ের সুযোগ খুব কম। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এইসব প্রতিনিধিদের নাম তাদের সামনে উপস্থিত করে এবং ব্যাপক প্রচারের মারফৎ সেইসব ব্যক্তির পেছনে জনমত গড়ে তোলে। দলের সমর্থন ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হওয়া অত্যন্ত শক্ত। আবার নির্বাচিত হওয়ার পর আইনসভাতে এইসব প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ দলীয় নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিনিধিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। তাছাড়া সরকারী কাজকর্ম আসলে নির্ভর করে আমলাদের ওপরে, আইনসভার সদস্যদের ওপরে নয়। এদিকে সংগঠন, বিত্তসামর্থ্য এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে জনসাধারণ তাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ মেটানোর জন্যে সরকারের ওপরে নির্ভর করে। আর সেই নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নিজের হাতে আরো দায়িত্ব, আরো শক্তি গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ারই চরম পরিণতি এ যুগের সর্বগ্রাসী (totalitarian) রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা যে জনসমর্থনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, জার্মানীতে হিটলারের সাফল্য তার-ই প্রমাণ। কিন্তু এই ধারার বিকল্প হিশেবে উদারতন্ত্র অন্য কোনো ব্যবস্থার কার্যকরী পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি। অথচ কোনো প্রকৃষ্টতর বিকল্প যে ছিলনা বা নেই, একথা মেনে নেওয়া শক্ত। কীভাবে এযুগের সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার কবল থেকে উদারতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকে মুক্ত করে তার পোষণ এবং বর্ধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব, তার অন্তত একটি সম্ভাব্য রূপ আমি আমার পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থ দুটিতে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর শেষ জীবনের বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক রচনায় এসম্পর্কে আরো বিশদ এবং পরিচ্ছন্ন আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে

বলা চলে যে একদিকে সমবায়ের ভিত্তিতে স্থানীয় গণসংগঠন এবং অন্যদিকে সামাজিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের ক্রমিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত করে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভবপর বলেই আমাদের বিশ্বাস।[১৬] উদারতন্ত্রীরা সে চেষ্টা করেননি এবং তার ফলে আজকের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজে উদারতন্ত্রের প্রভাব প্রায় অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত।

পরিশেষে উদারতন্ত্রের অবক্ষয়ের একটা বড় কারণ হোল, উদারতন্ত্রের যাঁরা ব্যাখ্যাতা এবং সমর্থক তাঁদের নিজেদের আচরণের দ্বারাই উক্ত সমাজদর্শন পদে পদে খণ্ডিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ কোন সামাজিক আদর্শের যাথার্থ্য তার ধারকদের ব্যবহার দিয়েই বিচার করে থাকে। তাছাড়া ব্যবহার যদি আদর্শের বিরোধী হয়, তাতে সে আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে তাদের মনেও উক্ত আদর্শের প্রতি আনুগত্য ক্রমে দুর্বল হয়ে আসতে বাধ্য। আদর্শের দিক থেকে উদারতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। কিন্তু ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করার নামে উদারতন্ত্রীরাও পদে পদে শাস্তির ভয়, রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতা এবং বিবর্ধমান পুলিশবাহিনীর ওপরে নির্ভর করে এসেছেন। যুক্তির দ্বারাই বিরোধের যথার্থ সমাধান সম্ভব, একথা প্রচার করার পর উদারতন্ত্রীরাই জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে এবং সামষ্টিক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনন্য একথা বলার পর উদারতন্ত্রীদের মধ্যে একটা বড় অংশ জাতীয় স্বার্থের কাছে ব্যক্তির বিবেককে বলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। উদারতন্ত্র সর্বমানবীয় ঐক্যে বিশ্বাসী; অথচ যেসব সমাজে উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তারাই ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা আপন আপন সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করার প্রয়াস পেয়েছে। ফলে উদারতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার পরও যদি এই সব উপনিবেশের অধিবাসীদের মধ্যে উদারতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষের ভাব প্রবল হয়ে উঠে থাকে, তাতে দুঃখ পেলেও বিস্মিত হওয়া অযৌক্তিক। অপর পক্ষে জাতিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ অবলম্বন করার ফলে উদারতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশগুলিতেও অধিকাংশ মানুষ উদারতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেনি।

তবু এসব সমালোচনা থেকে আমি এ সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে করি না যে উদারতন্ত্র প্রকৃষ্ট সমাজদর্শন নয়, অথবা তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। উদারতন্ত্রের যেগুলি মূল প্রত্যয়—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিশীলতা, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং

সহযোগিতা—এগুলি ছাড়া কোনো যথার্থ মানবীয় সভ্যতা অকল্পনীয়। কিন্তু এই প্রত্যয়গুলিকে সার্থক করার জন্য সমকালীন উদারতন্ত্রের ত্রুটি, বিকৃতি এবং স্ববিরোধ দূর করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে মানবতন্ত্র থেকে উদারতন্ত্রের উদ্ভব তারই জীবনবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ না করতে পারা পর্যন্ত উদারতন্ত্রের অবক্ষয় রোধ করা অসম্ভব। একদিকে মানবতান্ত্রিক শিক্ষা এবং অন্যদিকে সামাজিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ব্যক্তিকে স্বপ্রতিষ্ঠ, জিজ্ঞাসু, পরমতসহিষ্ণু এবং সমবায়ী করে তুলতে পারলে তবেই এযুগে উদারতন্ত্র আবার প্রভাবশালী সমাজদর্শন হয়ে উঠবে। আর সেই প্রভাব যত সক্রিয় হবে ততই সামাজিক বৈষম্য এবং সংঘাতের সম্ভাবনা কমে আসবে, জাতিবাদের প্রভাব ক্ষীণতর হবে, সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা এবং যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বনাগরিক সভ্যতার উদ্ভব আসন্ন হয়ে উঠবে। এর মধ্যে কোন ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা নেই। মানুষের ইতিহাস এই বিকল্পের পথে গড়ে উঠবে কিনা সেটা নির্ভর করছে মানুষের পথ নির্বাচন এবং প্রয়াসের ওপরে। কিন্তু ক্ষমতার সাধনায় মত্ত হয়ে পরমাণবিক মহাযুদ্ধে মানবজাতির বিলোপসাধন যদি আমাদের কাম্য না হয়, তাহলে উদারতন্ত্রের ত্রুটি এবং স্ববিরোধ দূর করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটানো যে আবশ্যিক, এবিষয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই, কিন্তু এ বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতই একমত যে গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রীক দার্শনিকদের মনেই প্রথম রূপ-পরিগ্রহ করে। আদি যুগের অন্যান্য অনেক মানবসভ্যতার তুলনায় গ্রীক সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে সুমারীয় ও আক্কাদীয় সভ্যতা এবং তারপর বাবিলনীয় এবং অসুর সভ্যতা, অথবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার সভ্যতা—এর প্রত্যেকটিই গ্রীক সভ্যতার চাইতে অনেক প্রাচীন। এমনকি চৈনিক, হিব্রু, পারসিক এবং হিন্দু সভ্যতার হিশেবেও গ্রীক সভ্যতাকে কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ বলা চলে। তবু (কিংবা হয়ত সেকারণেই) গ্রীসেই প্রথম সভ্যতার যথার্থ বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছিল। গর্ডন্ চাইল্ড সাহেব বলেছেন যে উপকরণগত সমৃদ্ধির দিক থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার আবিদস, উর কিম্বা মোহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতি তাদের থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেকার আথেনীয় সংস্কৃতির চাইতে মোটেই খাটো ছিল না।[১] কিন্তু মনের বহুমুখী পরিণতির দিক থেকে পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন যেকোনো সভ্যতার চাইতে গ্রীস অনেক বেশী উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। গ্রীক দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনেতাদের দ্বারা পরিকল্পিত গণতন্ত্রের আদর্শ এই মানসিক পরিণতির অন্যতম প্রমাণ।

যে যুগে চারপাশের সভ্য সমাজে কোনো না কোনো ধরণের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত, সেকালে গ্রীকদের মনে গণতন্ত্রের ধারণা গড়ে উঠল কিসের জোরে? পণ্ডিতপ্রবর আর্নেস্ট্ বার্কার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে গ্রীকরাই সর্বপ্রথম চিন্তায় এবং ব্যবহারে যুক্তিকে

ধর্মপ্রত্যয়ের ওপরে স্থান দেয় এবং ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। গ্রীক সমাজে দাস-ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল, এবং গ্রীকরা আপন সমাজের বহির্ভূত ব্যক্তিদের বর্বর আখ্যায় অভিহিত করতেন—এই দুই অভিযোগই সত্য। কিন্তু গ্রীক মনীষীরাই প্রথম যুক্তিবিস্তার করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে উচ্চ এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায় তার কোন প্রাকৃতিক বা দৈব ভিত্তি নেই, তা শুধু সামাজিক ব্যবস্থার ফলমাত্র, এবং সে কারণে তা দূর করা সম্ভব। প্রতি মানুষই অনন্য এবং কোন ব্যক্তিকে অপরের উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র মনে করা অসঙ্গত, অতএব দাসব্যবস্থা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। মানুষে মানুষে ভৌগোলিক, রাষ্ট্রীয় অথবা সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচনা করলে মানুষের বিকাশ ব্যাহত হয়, সুতরাং বিশ্বনাগরিকতা সভ্যসমাজের উদ্দেশ্য। ব্যক্তির সর্বতোমুখী স্বাধীনতার স্বীকৃতি ভিন্ন সুস্থ সমাজসংগঠন অসম্ভব; একদিকে প্রতিটি নাগরিকের অধিকারাবলীর প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে ব্যক্তি-নির্বিশেষে বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি। সমাজজীবনে বিরোধ দূর করার উপায় শক্তি নয়, যুক্তি, শাস্তি নয়, শিক্ষা, আক্রমণ নয়, আলোচনা; এবং রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রাজা অথবা মুষ্টিমেয় শাসকসম্প্রদায়ের হাতে কেন্দ্রীভূত না রেখে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ আধুনিক কালে গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি তার অনেকগুলি মূলনীতি গ্রীক সফিস্ট্‌দের চেতনাতে প্রথম প্রতিভাত হয়।[২]

এবং গ্রীকরা তাদের এই অভিনব সমাজদর্শনকে শুধু তত্ত্বালোচনার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি, বাস্তব সমাজসংগঠনের মধ্যে রূপ দেবারও প্রয়াস পেয়েছিল। এই প্রচেষ্টা গ্রীক "নগর-রাষ্ট্রের" বৈশিষ্ট্য। এই প্রচেষ্টার সবচাইতে বিখ্যাত উদাহরণ আথেন্স। খৃস্টজন্মের প্রায় ছ'শ বছর আগে সোলোন আথেনীয় গঠনতন্ত্রের আমূল সংস্কারসাধন করে দরিদ্র কৃষক এবং কারিগরসম্প্রদায়কে (Thetes) আইনসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণের এবং শাসকনির্বাচনের অধিকার দেন; তাছাড়া এই সংস্কার সাধনের ফলে উক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিচারপতিরূপে নির্বাচিত হবার অধিকারও লাভ করে। আথেন্স-এর নাগরিকরা একদিকে আইনসভায় (Ecclesia) সমবেত হয়ে শাসকদের নির্বাচন করতেন এবং রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা ঠিক করতেন; অন্যদিকে বিচারসভার (Heliaea) সদস্যরূপে শাসকদের ক্রিয়াকলাপের বিচার এবং প্রয়োজনমত শাস্তিবিধান করতেন। সোলোন রাষ্ট্র পরিচালনায় জনসাধারণের ক্ষমতা বাড়ান; অপরপক্ষে

তিনি অভিজাত-পরিষদের (Areopagus) ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অনেকটা খর্ব করেন। তাছাড়া বিত্তের অসাম্য কমাবার উদ্দেশ্যে তিনি আইন করেন যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাপের অতিরিক্ত জমির মালিক হতে পারবেনা, কোনো ব্যক্তিকে ঋণ অথবা বন্ধকের দায়ে ক্রীতদাস করা চলবেনা, এবং ইতিপূর্বে ঋণের দায়ে যারা ক্রীতদাস হয়েছে তাদের সমস্ত ঋণ খারিজ করে তাদের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বীকার করা হবে।[৩]

সোলোন প্রবর্তিত আথেনীয় গণতন্ত্র প্রথমে ক্লেইস্থেনেস এবং পরে পেরিক্লেস-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রাচীন যুগের সবচাইতে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র-রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। সভ্যজগতের সামনে আথেন্স যে আদর্শ উপস্থিত করেছিল তার সবচাইতে সুন্দর বিবরণ মেলে পেরিক্লেসের 'সমাধি-ভাষণে' (থুকিদিদেস তাঁর অমর ইতিহাসগ্রন্থে পেরিক্লিসের এই অতুলনীয় ভাষণটিকে ভবিষ্যৎকালের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন)।[৪] আথেন্স-এর নাগরিকরা যেমন নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যোগী ছিল, তেমনি অপরের স্বাধীনতাকেও তারা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করত। অসহিষ্ণুতা এবং সন্দিগ্ধতাকে তারা সযত্নে বর্জন করেছিল। তাদের রাষ্ট্রে কোনো ভিন্‌দেশীর স্বাধীন আসা যাওয়ার পথে তারা বাধা রাখেনি; রাষ্ট্রের কোনো গোপন তথ্য ঐ বিদেশীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার আশঙ্কায় তারা কোনো লৌহযবনিকা অথবা "আন্‌হেলেনিক্ অ্যাক্‌টিভিটিজ্ কমিটি" খাড়া করেনি। কবে বিপদ ঘটতে পারে তারি ভাবনায় আগেভাগেই তাদের জীবনকে নিষেধ-নিয়ন্ত্রিত করতে চায়নি; তারা বীর্যের সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের সমন্বয় ঘটাবার সাধনা করেছিল। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অবহেলা করত না। তাদের বিশ্বাস ছিল, আলোচনা কার্যকরী শক্তিকে ব্যাহত না করে তাকে শক্তিশালী করে। অজ্ঞতাজাত দুঃসাহস নয়, জ্ঞান-পরিচালিত প্রত্যয়কেই তারা বেশী মূল্য দিত।

উপরোক্ত পেরিক্লেস-বর্ণিত আদর্শ গ্রহণ করার ফলে আথেন্স নগর-রাষ্ট্রের সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটে; উক্ত রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, আসলে গণতন্ত্র আর সংস্কৃতি পরস্পরের পোষক এবং সম্বর্ধক। আথেন্সে যেমন একদিকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং সামাজিক জীবনযাত্রায় জনসাধারণের অধিকার এবং দায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা চোখে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, নাট্যকলা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মনস্বিতার অসামান্য উন্মেষ আজো আমাদের মনে বিস্ময়

জাগায়। আথেন্সের প্রতিবেশী গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টা গণতান্ত্রিক আদর্শকে সযত্নে পরিহার করেছিল; মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে স্পার্টার কোন দানের কথা আমরা জানিনা।

গণতান্ত্রিক সংগঠনের সহায়তায় ব্যক্তির সর্বতোমুখী বিকাশের যে প্রতিশ্রুতি আথেন্স বহন করে এনেছিল, সমগ্র গ্রীক সভ্যতা তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার আগেই পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের ফলে আথেন্স-এর পতন ঘটে। তারপর মাসেদোনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের ফলে একদিকে যেমন এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্রের আদর্শ একরকম লোপ পায়। আথেন্সের পতনের পরবর্তী দু'হাজার বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের উল্লেখ মাঝে মাঝে ঘটলেও সেই আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংগঠনের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস বিশেষ চোখে পড়েনা। পরাজিত গ্রীসকে বিজয়ী রোম গুরু বলে স্বীকার করেছিল বটে, কিন্তু রোমের ক্ষমতা সাম্রাজ্যতন্ত্রকে আশ্রয় করে বিবর্ধিত হয়, সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এদিকে ভারতবর্ষে হিন্দুরা ব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধির কথা বললেও তাদের সমাজ অলঙ্ঘ্য বর্ণভেদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে খৃস্টধর্ম এবং ইসলাম উভয়েরই যদিও আদিতে প্রস্তাব ছিল সাম্যের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু কোনোটিতেই যুক্তিশীলতা অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেনি। একটিতে মেসায়া এবং অন্যটিতে পয়গম্বরের বাণীকে বিচারোর্ধ নির্দেশ হিশেবে ধরে নেওয়া হয়। ফলে স্বাধীন চিন্তা এবং পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য ক্রমে লোপ পায়; সমাজ প্রাধিকার-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তাছাড়া খৃস্টধর্ম ইয়োরোপে এসে রোমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার পর তার সাম্যবাদী আদর্শ থেকেও ক্রমে বিচ্যুত হয়। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগে একদিকে পোপ, কার্ডিন্যাল, বিশপ প্রমুখ চার্চ-কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদিকে সম্রাট, রাজা ও ভূস্বামী সম্প্রদায় এই ধর্মকে ভূমিদাস ব্যবস্থার প্রধান সমর্থকে পর্যবসিত করে। ইসলামের বিপ্লবী প্রেরণাও একই ভাবে বিকৃত হয়। একদিকে সাম্রাজ্য স্থাপন এবং অপর দিকে সর্বসাধারণের ওপরে মুষ্টিমেয়ের একচ্ছত্র ক্ষমতা বিস্তারের উপায় হিশেবে তার প্রয়োগ ঘটে। ফলত আথেনীয় সভ্যতার পতনের পর থেকে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও আর সুস্পষ্টভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়ে তোলার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চোখে পড়ে না।

॥ দুই ॥

পশ্চিম ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে সে প্রয়াস আবার নতুন করে সূচিত হয় রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে। পশ্চিমী মনীষীরা বহুযুগের বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে হেলেনিক উত্তরাধিকারকে পুনরুদ্ধার করলেন; দুঃসাহসী নাবিকরা সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে কৃষিনির্ভর ইয়োরোপের সামনে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা খুলে দিলেন। স্থবির সমাজে গতি সঞ্চারিত হোল। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের পরিবর্তে মানবীয় অধিকার, যুক্তিশীলতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার অভীপ্সা প্রবল হয়ে উঠল। চার্চকে ঘুষ দিয়ে, রাজা-জমিদার এবং পুরোহিতদের অশেষ অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নিয়ে নিজেদের নানাভাবে নিগৃহীত করে কল্পিত আদিপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার যে মূঢ় প্রয়াস সর্বসাধারণের আত্মপ্রত্যয় এবং বিচারবোধকে এযাবৎ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী জীবনবোধ তার মূলে আঘাত করে। ফলে শুধু দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা অর্থাৎ সমগ্রভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনী-প্রতিভা চমকপ্রদ স্ফুরণ ঘটল না; আর্থিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর সূচিত হোল; এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগঠনে নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

সতেরো, আঠারো এবং উনিশ শতকে পশ্চিমের বিভিন্ন সমাজে দুটি পরস্পরের অনুপূরক সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিকে রাজা, জমিদার, চার্চ এবং বিত্তবান ব্যক্তিদের অভ্যস্ত সুবিধাবলী বা প্রিভিলেজ হ্রস্বতর হয়ে আসে; অন্যদিকে নাগরিকসাধারণের অধিকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে রাজা এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে ত্রিপাদশতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের শেষে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে 'বিল অব রাইট্‌স্'-এর ভিত্তিতে আধুনিক ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। মধ্যযুগের অবসানে এবং রেনেসাঁসের সূচনায় পাদুয়ার চিকিৎসক-দার্শনিক মার্সিলিও বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে সেটিই সবচাইতে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র যেখানে নাগরিকসাধারণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাঁর মতে রাজা, পোপ কিংবা মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবার নয়, সমগ্র সমাজই হোল আইন

প্রণয়নের যথার্থ অধিকারী।[৫] কিন্তু মার্সিলিওর এই যুগান্তকারী প্রস্তাব তত্ত্ব হিশেবে প্রথম ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করল প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর পরে সতেরো শতকের ইংল্যাণ্ডে। রক্তহীন বিপ্লবের ফলে সেদেশে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা লোপ পেল। বিপ্লবের দুবছর পরে দার্শনিক লক্ রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁর অমর দুটি নিবন্ধে স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন যে রাষ্ট্রশক্তির আদি এবং একমাত্র উৎস হোল জনসাধারণ, রাষ্ট্র জনসাধারণের হাতের যন্ত্র মাত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয় ততক্ষণই তা জনসাধারণের সমর্থন পেতে পারে, এবং কোনো রাষ্ট্র জনস্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রতিপন্ন হোলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করার অধিকার একমাত্র জনসাধারণেরই আছে।[৬] রক্তহীন বিপ্লবের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবং লক্ কর্তৃক ব্যাখ্যাত উপরোক্ত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গত আড়াইশ' বছর ধরে ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করেছে।

ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা এবং লক্-এর রাজনৈতিক দর্শন আঠারো এবং উনিশ শতক ধরে প্রথমে পশ্চিম এবং তারপর পুবের বিভিন্ন দেশে প্রভাব ছড়ায়। আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন লক্-এর প্রতিধ্বনি করেই তারা বলেছিল যে জন্মসূত্রে সব মানুষই সমান ; তাদের কতগুলি মৌলিক অধিকার আছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না ; এই সব অধিকার সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব ; এবং কোনো রাষ্ট্র জনস্বার্থের বিরোধী হয়ে উঠলে তার উচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রকৃষ্টতর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার জনসাধারণের আছে।[৭] উক্ত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মার্কিন গঠনতন্ত্রের বিল অব রাইটস্ রচিত হয় ; এরি ফলে পরে উনিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ঘটে এবং ক্রমে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক ভোটের অধিকার অর্জন করে ; গৃহযুদ্ধের পর ১৮৭০ খৃস্টাব্দে গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধন প্রস্তাব অনুসারে নির্দিষ্ট হয় যে যুক্তরাষ্ট্র অথবা কোনো অঙ্গরাষ্ট্র কোন কারণেই নাগরিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার খর্ব করতে পারবে না অথবা কেড়ে নিতে পারবে না।[৮] এইভাবে ইংল্যাণ্ডের অনুপ্রেরণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ ঘটে।

আবার ফ্রান্সেও লক্-এর চিন্তার প্রভাবে আঠারো শতকে র‍্যাডিক্যালরা প্রচার করেন যে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং চার্চ ও অভিজাতসম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগসুবিধার পিছনে যুক্তি কিংবা সামাজিক কল্যাণবোধের কোনো

সমর্থন নেই। তাঁদের মতে একমাত্র জনসাধারণই সমষ্টিগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; ন্যায়সঙ্গত বিধিব্যবস্থা তাকেই বলা যায় যার উদ্দেশ্য হোল নাগরিকদের মৌলিক অধিকারাবলীর সংরক্ষণ; সেই আইনই আনুগত্য দাবি করতে পারে যার মধ্যে নাগরিকদের ইচ্ছা প্রতিফলিত এবং যার চোখে সব মানুষই সমান। এইসব ধারণার প্রচারের ফলে বিক্ষুব্ধ ফরাসী জনসাধারণ বিপ্লব করার প্রেরণা পায়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গণপ্রতিনিধিরা পার্লামেন্টকে জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত করার দু-মাস পরেই মানবীয় অধিকারাবলীর যে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেন তার প্রতিটি অনুচ্ছেদে পূর্বোক্ত চিন্তাধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।[১] নানা কারণে ফরাসী বিপ্লব শেষ পর্যন্ত নাপোলিয়নী ডিক্টেটরশিপে পর্যবসিত হয়; এই গ্রন্থের অন্যত্র তার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতে জনসাধারণের অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের যে প্রয়াস হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের নাটকীয় আতিশয্য সে প্রয়াসকে আরো প্রবল, পরিস্ফুট এবং ব্যাপক করে তোলে। উনিশ শতকে যন্ত্র-বিপ্লবের ফলে প্রথমে পশ্চিমে এবং তারপর পশ্চিমের সঙ্গে যোগসূত্রে এশিয়ার সমাজগুলিতেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। শহর এবং কলকারখানা যতই সংখ্যায় এবং আয়তনে বাড়তে থাকে, ততই একদিকে যেমন সমাজ সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের অধিকারবোধ প্রবলতর হয়। পশ্চিমের দেশে দেশে শ্রমিকসংগঠন গড়ে ওঠে; সাম্যের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে; ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং রাশিয়াতে দাসব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়; বিভিন্ন দেশে সর্বজনীন নির্বাচনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনে পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সমান অধিকারের নীতি ক্রমে স্বীকৃত হতে থাকে; সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে; উপনিবেশগুলিতে শিক্ষিতসম্প্রদায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সংস্কারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে দাবি তুলতে শুরু করে। মুষ্টিমেয়ের দ্বারা শাসিত সমাজের পরিবর্তে সর্বসাধারণের সমান অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের আদর্শ জগৎ জুড়ে প্রভাব ফেলতে থাকে।

উনিশ শতক ধরে উপরোক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসার লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শতকেই প্রথম সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে গণশক্তির অভ্যুত্থান প্রকট হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিশেবে বলা যায় যে আধুনিক ইতিহাসের সব চাইতে বনেদী এবং মজবুত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্রিটেনে ভোটের সর্বজনীন অধিকার গত শতকে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম মহাযুদ্ধের আগে

পর্যন্ত সে দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। শতাব্দীব্যাপী সাফ্রাজিস্ট আন্দোলন যা পারেনি যুদ্ধের চাপে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হোল; মেয়েরা প্রতিনিধিনির্বাচনের অধিকার লাভ করল। তেমনি ওদেশে সর্বজনীন শিক্ষার নীতি গত শতকে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ায়; কিন্তু বেশীর ভাগ উপনিবেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। বর্তমান শতকে কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উপার্জনক্ষম স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেছে। ফলে একদিকে যেমন তাদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তারা আগের তুলনায় অনেক বেশী সংগঠিত হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনের মান উঁচু হয়েছে; তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে; তাদের সমর্থন ছাড়া কোনো ব্যক্তি অথবা দলের পক্ষে আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসা প্রায় অসম্ভব। জনগণের এই সমকালীন অভ্যুত্থান পশ্চিমের সমাজে বেশী প্রকট হলেও এটা যে কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ নেই সেকথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এশিয়া এবং আফ্রিকার দিকে চাইলেই বোঝা যায়। অন্য দেশের কথা দূরে থাক, যে ভারতবর্ষে আজ প্রায় দু'হাজার বছর ধরে রাজা, জমিদার এবং পুরোহিত নির্বিরোধে সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা উপভোগ করে এসেছে, সেখানে বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোল। ভোটের অধিকার অর্জন করার জন্য বিলেতে শ্রমিকরা প্রায় পঞ্চাশ বছর, স্ত্রীলোকরা একশ বছর ধরে আন্দোলন করেছিল। এদেশে স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বছর পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচন স্ত্রী-পুরুষ, মালিক-মজুর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলত মোটামুটি একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে বর্তমান শতকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার মান যে হারে উন্নত হয়েছে ও হচ্ছে, এবং তাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার যেভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অথবা করছে, দ্রুতগতি এবং ব্যাপকতার দিক থেকে তার তুলনা প্রাগাধুনিক ইতিহাসে মেলেনা। এ শতকে রাজনৈতিক আচরণের দিক থেকে যারা গণতন্ত্রের সব চাইতে প্রবল শত্রু সেই ফাসিস্ত্ এবং কম্যুনিস্ট্‌রা পর্যন্ত রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে জনগণকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার মূল উৎস বলে স্বীকার করে। আঠারো এবং উনিশ শতকে শুধু

গুটিকয়েক পশ্চিমী রাষ্ট্র জনসাধারণের কয়েকটি মৌলিক অধিকারে আস্থা প্রকাশ করেছিল। বিশ শতকে ইউনাইটেড নেশ্যন্‌স্‌ মানবীয় অধিকারাবলীর যে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে তা যেমন বিশদ এবং বহুমুখী, তার সমর্থন তেমনি দু-চারটি দেশের মধ্যে আবদ্ধ নয়; উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রই সে ঘোষণার সমর্থক। ঈশ্বর, রাজা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, ভূস্বামী, যোদ্ধা কিংবা বণিক-শিল্পপতি নয়, জনগণকেই যে নব্য ইতিহাসের নায়ক রূপে কল্পনা করা হয়েছে, ইউ. এন. চার্টারের মুখবন্ধের ভাষা তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

॥ তিন ॥

এখন গণতান্ত্রিক আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা স্বভাবতই প্রত্যাশা করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটলে সমাজের সাংস্কৃতিক মানও উঁচু হবে। কারণ সেক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বিত্তবান এবং ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের খামখেয়ালের ওপরে শিল্পী-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণীজনদের জীবিকা এবং মানমর্যাদা নির্ভর করবে না; তাঁদের চিন্তা, কল্পনা অথবা প্রকাশের প্রেরণা সংখ্যালঘিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকদের তোষণের প্রয়োজনে আর খর্বিত বা বিকৃত হবে না; সাধারণ মানুষদের কাছে সমর্থন লাভ করার ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে জ্ঞান এবং রূপের সাধনা করার পূর্ণ সুযোগ পাবেন। কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের রাজা কিংবা জমিদার অথবা চার্চ অথবা ব্যবসায়ীর কাছে সাহায্য চাইতে হবে না; জনসাধারণ নিজেদের গরজেই তাঁদের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেবেন। ভালো বইয়ের তখন লাখ লাখ কপির সংস্করণ হবে; ভালো গানের তখন অসংখ্য সমঝদার শ্রোতা জুটবে। এঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে অবস্থার উন্নতি ঘটলে সর্বসাধারণ বৈদগ্ধ্য অর্জন করবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা ঘটল এবং ঘটছে তার ফলে গণতন্ত্রীদের পক্ষেও এই প্রত্যয় টিকিয়ে রাখা আজ আর সহজ ঠেকছে না। পশ্চিমের প্রায় সব দেশেই এখন সাধারণ মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে লেখাপড়া শিখছে; সেখানে ঘরে ঘরে রেডিও এবং টেলিভিশন, পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার। কিন্তু অক্ষর-পরিচয় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে ক্লাসিক্‌স্‌-এর পাঠক যে-হারে বেড়েছে, তার চাইতে অনেক উঁচু হারে বেড়েছে ক্রাইম্‌-কমিক্‌স্‌-এর খরিদ্দার। অনেক শিক্ষক এবং সমাজতাত্ত্বিকের মতে গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে পশ্চিমে সংস্কৃতির মান উঁচুতে না উঠে ক্রমেই নীচের দিকে নেমে চলেছে। থিয়েটার, সিনেমা,

সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, সব ক্ষেত্রেই নাকি অনুশীলনহীন জনরুচির চাপে যা-কিছু উৎকৃষ্ট তা লোপ পেতে বসেছে, আর যা নিতান্ত স্থূল, ব্যঞ্জনারিক্ত এবং অমার্জিত তারই একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশেও গত বিশ বছরের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং সাংস্কৃতিক মানের দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করার পর উপরোক্ত অভিযোগকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত।

এখন থেকে প্রায় দেড় শ' বছর আগে বিপ্লব-পরবর্তী ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা বিচার করে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদারতন্ত্রী আলেক্সিস্ দ্য তক্‌ভিল এবংবিধ আশঙ্কার আভাস দিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশের এবং তিরিশের দশকে ওর্তেগা গাসেত, উইল্যাম লুইস্, এফ. আর. লীভিস, টি. এস. এলিয়ট, প্রমুখ মনীষীরাও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বৃদ্ধির ফলে তার মান যে নেমে যেতে বাধ্য, এবিষয়ে তাঁদের সমসাময়িক বিদগ্ধ সম্প্রদায়কে সতর্ক করার প্রয়াস পান। কিন্তু সে সময়ে রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ফলে অধিকাংশ তরুণ বুদ্ধিজীবীর মন সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট; যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষাজাত বৈদগ্ধ্য জনসাধারণ থেকে তাঁদের পৃথক করেছে, তার জন্য তাঁরা অনেকেই আন্তরিকভাবে লজ্জিত এবং পীড়িত; "বুর্জোয়া" গণতন্ত্র থেকে "সমাজতান্ত্রিক" গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য অনেকেই তৎকালে একান্ত উৎসুক। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পৃষ্ঠপোষণ বিষয়ে সতর্কবাণী তাঁদের অনেকের কাছে শুধু উন্নাসিক প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রকাশ হিশেবে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক গণতন্ত্রীর মনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠেছে। রুশ এবং চীন প্রমুখ কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে শিল্পীসাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকদের আর্থিক অবস্থার যেমন অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটেছে, তেমনি তাঁদের স্বাধীনতাও যে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, এবিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্য দিকে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার মত দেশে সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সেখানে অত্যন্ত অপকৃষ্ট রচনার প্রচারও প্রবল-ভাবে বেড়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুটিকয়েক সংবাদপত্র বাদ দিলে অধিকাংশ জনপ্রিয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিকের পাতা মুখ্যত কেচ্ছাকাহিনী, মোটা রসিকতা, খুনখারাপির বিশদ বিবরণ আর নির্বোধ অশ্লীলতায় ভরা থাকে। সেখানে যেক'টি মননশীল মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের অধিকাংশের খরচ আসে কোনো না কোনো ফাউণ্ডেশ্যন অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে; তাদের গ্রাহকসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। ইংল্যাণ্ডের দশাও এর চাইতে আশাপ্রদ নয়। যে-দেশে সমাজের অধিকাংশ

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শ্রমিক ও শহরবাসী এবং যে দেশের শ্রমিকরা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সংগঠিত, সেখানেও লেবার পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের একটি দৈনিক মুখপাত্র চালাতে অপারগ। অথচ কিছুকাল আগে প্রকাশিত ফ্রান্সিস উইলিয়মস্-এর একটি প্রামাণিক গ্রন্থের হিশেব অনুসারে ইংরেজদের মত সংবাদপত্র-অনুরাগী পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।[১০] ব্রিটেনে মাথাপিছু খবরের কাগজ বিক্রির পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ, ফ্রান্সের তিন গুণ। ব্রিটেনে প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জন অন্তত একখানা দৈনিকপত্র এবং অনেকে দুখানা দৈনিক-পত্রের নিয়মিত খরিদ্দার। কিন্তু এই বর্ধিষ্ণু পাঠকসম্প্রদায় থেকে কোন্ জাতীয় কাগজ সবচাইতে লাভবান হয়েছে? 'টাইম্স্' অথবা 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' নয়। এদের পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছে প্রধানত 'ডেলি মিরর'-এর মত স্বীকৃতভাবে স্থূল এবং লঘুরুচি পত্রিকা—১৯৩৪ সালের আট লক্ষ গ্রাহক থেকে বিশ বছর পরে যে কাগজ চল্লিশ লক্ষ পাঠক অর্জন করে।

'ডেলি মিরর'-এর এই সাফল্যের কারণ কী? বিলেতী সংবাদপত্র সম্বন্ধে আরেকটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে ম্যাথুজ নামে একজন মার্কিন সাংবাদিক এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১১] তাঁর মতে এই সাফল্যের কারণ 'ডেলি মিরর' জাতীয় জনপ্রিয় পত্রিকারা সচেতনভাবে সাধারণ পাঠকের নির্বোধ প্রত্যাশা মেটাতে উদ্যোগী। ম্যাথুজ-এর ভাষায় এই সব পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মস্ত চাটুকার। এরা সাধারণ পাঠকদের প্রত্যহ এই আশ্বাস যোগায় যে তারা বড় ভালো মানুষ, যে তাদের অন্ধ সংস্কারগুলো খুবই সঙ্গত, যে তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং অনুভূতি খুবই সুস্থ, যে যা কিছু তাদের অভিজ্ঞতা অথবা বোধবুদ্ধির বাইরে তার বিশেষ কোন দাম নেই।[১২]

এসব পত্রিকায় তাই এমন কিছু থাকে না যা পাঠকের মনে প্রসারতা আনে, তাকে ভাবতে বাধ্য করে, তাকে অপ্রীতিকর সত্য স্বীকার করতে শেখায়, মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাকে কৌতূহলী করে তোলে। এবং যেহেতু অধিকাংশ অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন নাগরিকের জ্ঞানচর্চার দৌড় সংবাদপত্র পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাদের মনে মানব সংস্কৃতির যে রূপটি গড়ে উঠছে সেটিকে শ্রদ্ধার্হ বলা চলে না। ম্যাথুজ তাঁর গ্রন্থের শেষে একই তারিখের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' এবং 'ডেলি মিরর'-এর বিষয়সূচীর বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, মিররে যে মালমশলা থাকে এবং তা যেভাবে পরিবেশন করা হয় তার ফলে সমাজের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী ; তা থেকে জগৎ সম্বন্ধে

পাঠক যে ধারণা লাভ করে তা গ্রাম্য, অতিসরলীকৃত, অসত্য এবং আবেগাতি-শয্যের দ্বারা চিহ্নিত। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ সেহিশেবে কিছুটা সত্যনিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ দেখা যায়; কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে সেখানেও ক্রমশ লঘুরচনার প্রলোভন প্রবল হয়ে উঠেছে।

'ডেলি মিরর' অকস্মাৎ জনপ্রিয় হয়নি; তিরিশের দশক থেকে এই পত্রিকার পরিচালকরা সচেতনভাবে তাকে জনপ্রিয় করার সাধনা করেছেন। 'মিরর'-এর সম্পাদক হিউ কড্‌লিপ্‌-এর ভাষায় তিরিশের দশকে এই পত্রিকা সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের মূল ধারার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল। জনসাধারণ যখন ক্রমশই সমাজের প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে, তখন ক্ষীয়মাণ বিদগ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষণের ওপরে নির্ভর করে দৈনিক পত্রিকা চালানোর চেষ্টা ঘোর নির্বুদ্ধিতা। সুতরাং জনসাধারণ যা চায় ধীরে ধীরে পত্রিকায় তাই পরিবেশন করার ব্যবস্থা হোল। কড্‌লিপের ভাষায়, 'মিরর'-এর সাফল্যের মূল কারণ হোল, জনসাধারণ যা ভাবে, যা পছন্দ করে, যা চায়, 'মিরর'-এর সম্পাদক, লেখক এবং রিপোর্টাররা কোনো চিন্তা না করেই তা বুঝতে পারে এবং সে চাহিদা মেটাতে পারে। অর্থাৎ জনশিক্ষা নয়, জনতোষণ 'মিরর'-এর নীতি। সুতরাং 'মিরর' খাঁটি "গণতান্ত্রিক" পত্রিকা; সংখ্যাগরিষ্ঠের যা সংস্কার, এই পত্রিকার মতে তাই বর্তমানের পক্ষে সত্য। পত্রিকা তখনি শুধু কোনো পরিবর্তনের কথা বলতে পারে যখন পত্রিকা সিদ্ধান্ত করার আগেই জনমত পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকেছে। সাফল্যকামী পত্রিকার পক্ষে স্বাধীন চিন্তা মারাত্মক বিলাস; পত্রিকার পাঠককে জনরুচির দ্বারা পরিচালিত করতে পারাই সম্পাদকের প্রকৃত কর্তব্য।[১৩]

অথচ ফ্রান্সিস উইলিয়াম্‌স্‌-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সংবাদপত্রের এ অবস্থা ছিল না। উইলিয়াম্‌স্‌ 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর নিয়মিত লেখক; সংবাদপত্রের সমকালীন অবনতি তাঁকে কিছুটা পীড়িত করলেও তিনি এই রূপান্তরকে এক রকম অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছেন। স্পেণ্ডার, মবুলি, স্টেড প্রমুখ এডওয়ার্ডিয়ান যুগের বার্তাজীবীরা জনরুচির চাইতে সত্যকথন এবং স্বাধীন চিন্তাকে বেশী মূল্য দিতেন। উইলিয়াম্‌স্‌-এর মতে, যখন সংবাদপত্রের পাঠকদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের তুলনায় অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন জনসাধারণ অনেক বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন এই সব সাংবাদিকরা জনশিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ না করে উন্নাসিকতায় আশ্রয় নিলেন। ১৮৭০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ফলে উনিশ শতকের

শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় বিলেতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে; কিন্তু সেই স্বল্পশিক্ষিতদের অধিকাংশেরই বিদ্যা-বুদ্ধি চিন্তাশক্তি অথবা রুচির মান বেশী উঁচুতে ওঠার সুযোগ পায় না। তাঁরাই যখন সংখ্যার জোরে প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংবাদপত্রের প্রধান খরিদ্দার হয়ে উঠলেন, তখন কোনো বিদগ্ধ এবং বিবেকবান সাংবাদিকের পক্ষে তাঁদের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এই পাঠকরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনার চাইতে চিত্রতারকাদের কেচ্ছা বিষয়ে অনেক বেশী কৌতুহলী; চিন্তাশীল সম্পাদকীয় পড়ার চাইতে স্নানরতা সুন্দরীর ছবি দেখে কিম্বা বলাৎকারের বিবরণ পড়ে অনেক বেশী আরাম পান। সুতরাং এঁদের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন নর্থক্লিফ, সাউথ্‌উড্‌, বীভারব্রুক্‌, গাই বার্থোলোমিউ, কড্‌লিপ, জেকব্‌সন, কনর প্রমুখ চতুর গণতোষক সংবাদসেবীর দল। অর্থাৎ গণশক্তির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ সংবাদপত্রের মান ক্রমেই নেমে এল। গণসংস্কৃতির ধারক এবং বাহকরূপে প্রতিষ্ঠিত হোল 'ডেলি মেল', 'ডেলি মিরর', 'ডেলি এক্‌সপ্রেস'।

সংস্কৃতির এই সমকালীন অবক্ষয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই, এবং তার চিহ্ন শুধু ব্রিটেনেই দেখা যাচ্ছে না। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির মতে পশ্চিম ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সর্বত্র সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানের অবনতি আজ প্রত্যক্ষ। এই অবক্ষয় যে কত সর্বগ্রাসী, দুজন মার্কিনী সমাজতাত্ত্বিকের যুক্তসম্পাদনায় পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত "গণসংস্কৃতি" নামে বিরাট সংকলনগ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় মেলে।[১৪] এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখক সাধারণভাবে গণসংস্কৃতির ইতিহাস ও চরিত্র এবং বিশেষভাবে কথাসাহিত্য, পত্রপত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণরুচির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন গণসংস্কৃতির সম্ভাব্য সুফলের কথা উল্লেখ করলেও সাধারণভাবে অধিকাংশ আলোচকের সিদ্ধান্ত হোল যে গণসংস্কৃতির প্রসারের ফলে প্রকৃত সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এই লেখকদের অনেকেই এক সময়ে মার্কস্‌বাদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন (যথা, ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্টের ইনষ্টিট্যুট ফ্যর সোট্‌জিয়াল ফরশঙ্‌-এর পরিচালক ম্যাক্‌স হর্ক্‌হাইমার্‌ এবং তাঁর সহযোগী অধ্যাপক ভিসেনগ্রুণ্ড আডোর্নো; ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিও লোয়েনথাল; 'পলিটিক্‌স্‌' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ডোয়াইট ম্যাকডোন্যাল্ড; 'ডিস্‌সেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক বার্নার্ড রোজেনবার্গ ইত্যাদি)। এঁদের একদা

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে এবং সংগঠনশক্তি বাড়লে সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সেই বিশ্বাসকে সমর্থন না করায় এঁদের লেখায় আশাভঙ্গের বেদনা এবং জ্বালা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন নয়। গুণ এবং যুক্তিবিস্তারের দিক থেকে এঁদের রচনার মধ্যে অনেক তারতম্য থাকলেও এঁদের সাধারণ সিদ্ধান্তে খুব বেশী অমিল নেই।

এঁদের সংগৃহীত তথ্য এবং সে তথ্যের বিশ্লেষণ অনুসারে, যন্ত্রবিপ্লবের পর থেকে জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও তার সঙ্গে তুলনীয় মানসিক বিকাশ ঘটেনি। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে সংস্কৃতির উপাদানও আর ব্যক্তিমনের অনন্য সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যন্ত্রজাত অন্যান্য উৎপন্নের মত কারখানার একই ছাঁচে তৈরি হয়ে পাইকারীভাবে বাজারে বিক্রির মালে পর্যবসিত হয়েছে। এবং যেহেতু বাজারের মাল খরিদ্দারের চাহিদা অনুযায়ী কারখানায় তৈরি করানো হয়ে থাকে, আর যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের ফলে যেহেতু শ্রমিকরাই বাজারের সংখ্যাগরিষ্ঠ খরিদ্দার, সেকারণে আধুনিক যুগে সাংস্কৃতিক উৎপাদন মুখ্যত এদের রুচির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনের লেখক, শিল্পী, গাইয়ে, সম্পাদক, প্রকাশক, রেডিও কিংবা টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষ, চলচ্চিত্রের প্রযোজক এবং পরিচালক নিজের রুচি বা শিল্পবোধের ওপরে নির্ভর করতে অপারগ; প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে জনসাধারণের চাহিদার হিশেব করে তাঁদের প্রতিপদে চলতে হয়। সব সংস্কৃতিতেই অল্প কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি সংস্কৃতির স্রষ্টা; বাকি লোক ভোক্তা। গণসংস্কৃতিতে সেই ভোক্তাদের মন নিতান্ত অপরিণত; অথচ যেহেতু তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেকারণে তাদের মন জয় করতে পারলে তবেই কোনো লেখক, প্রকাশক অথবা প্রযোজক রাতারাতি বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। অন্যদিকে গণচাহিদাকে অগ্রাহ্য করে নিজের বিবেক অথবা প্রেরণা অনুযায়ী কিছু সৃষ্টি করে তাকে সমাজের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা বর্তমানকালে ব্যর্থ হতে একরকম বাধ্য। অধ্যাপক ভান ডেন হ্যাগ-এর ভাষায় গণচাহিদার যুগে শিল্পীসম্প্রদায় স্বভাবতই রুচির চাইতে বাজার সম্বন্ধে বেশী সচেতন। তাঁরা সৃষ্টি করেন সৃজনের তাগিদে ততটা নয় যতটা অজ্ঞাত খরিদ্দারের কথা স্মরণ রেখে।[১৫] যে দু'চারজন বিবেকবান শিল্পী এবং মনীষী স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করছেন তাঁদের পথে প্রলোভন অসংখ্য, তাঁদের ওপরে চাপের শেষ নেই।[১৬] সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাঁদের রচনা ক্রমেই বিরস এবং দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। অপর পক্ষে আজকের

দিনে খুব কম প্রকাশকই মননশীল সাহিত্য প্রকাশের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত; সাধারণ পাঠকরা চায় কোনো উচ্ছ্বাসময় হাল্কা কাহিনী অথবা সেক্স্, ক্রাইম এবং ভাঁড়ামি পাঞ্চ করা উপন্যাস। সুতরাং অনেক সৎ রচনাই শেষ পর্যন্ত ছাপা হয় না।[১৭]

সৎসাহিত্যের পাঠক কমে অপকৃষ্ট রচনার খরিদ্দার যে কী ভয়াবহ হারে বাড়ছে তার একটি উদাহরণ হোল, এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নাকি প্রতি মাসে ছয় থেকে সাত কোটি কমিক্স্ বিক্রি হয় এবং তার বড় অংশ হোল ক্রাইম-কমিক্স্।[১৮] নিকৃষ্ট গণরুচির চাপে শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনেও শিল্পবিবেক, মনস্বিতা ও সূক্ষ্ম কল্পনা আজ প্রায় একরকম নিষিদ্ধ। গণসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একদিকে যেমন বৈদগ্ধ্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, অন্যদিকে তেমনি লোকসংস্কৃতির বিনাশ সুনিশ্চিত। অধ্যাপক হায়াকাওয়া অতীত দিনের সুন্দর এবং বলিষ্ঠ নিগ্রো লিরিক গানের সঙ্গে বর্তমান মার্কিন দেশের জনপ্রিয় নির্বোধ ন্যাকা পপ্ গানের তুলনার ভিতর দিয়ে শেষোক্ত বিপদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ এই সব পণ্ডিতদের বিচার-অনুসারে গণসংস্কৃতির প্রসারের ফলে শিল্পী এবং মনীষীদের সর্বনাশ ত বটেই, জনসাধারণেরও মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা দ্রুত কমে আসছে। এরি চরম পরিণতির কথা ভেবে বার্নার্ড রোজেনবার্গ তাই লিখছেন, “mass culture threatens to cretinize our taste and to brutalise our senses” এবং তার ফলে সমাজে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। গণসংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট মন ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত, সত্যমিথ্যার বিচারে অশক্ত। এই ধরনের সমাজে গুণের চাইতে সংখ্যাকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়; নিজস্ব সিদ্ধান্তের ঝুঁকি এড়িয়ে প্রত্যেকেই আর পাঁচজনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। ফলে তাদের এই নির্বোধ পরতন্ত্রতার সুযোগ নিয়ে ডিক্টেটররা সহজেই রাষ্ট্রে এবং সমাজে নিজেদের একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েম করতে পারে।

॥ চার ॥

এখন পণ্ডিতদের এসব কথা কতখানি সত্য? তবে কি ম্যাক্ডোন্যাল্ডের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে যে প্রকৃত সংস্কৃতি মাত্রই অধিকারীদের সংস্কৃতি (elite culture)? সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য আসলে কি জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষণ

দায়ী ? গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতির মিলন কি সুফলপ্রসূ হয়নি বা হতে পারে না ?

বস্তুত, এ সংশয় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে প্রবলতর হয়ে উঠলেও রাজনৈতিক চিন্তার প্রায় আদিকাল থেকেই এসব প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতরা কমবেশী মাথা ঘামিয়ে আসছেন। আমরা পূর্বে তক্‌ভিল্‌-এর উল্লেখ করেছি ; কিন্তু তাঁর অনেক আগেই আরিস্টটল লিখেছিলেন যে যদিও সমূহের স্বার্থে নাগরিকসাধারণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সবচাইতে বেশী, তবু সেই রাষ্ট্রেরও গণসমর্থিত স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হবার আশঙ্কা বড় কম নয়।[১৯] পেরিক্লেস বিশ্বাস করতেন যে যথার্থ গণতন্ত্রে বংশ, কুল অথবা শ্রেণীনির্বিশেষে গুণীকেই সবচাইতে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের সবচাইতে খ্যাতিমান দার্শনিক প্লেটোর কাছে এ প্রত্যয় যুক্তিসহ ঠেকেনি। গণতন্ত্রের জন্মভূমি আথেন্স-এ বসে প্লেটো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দার্শনিক জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আধুনিককালে যাঁরা গণশক্তির অভ্যুত্থানকে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করেন, তাঁদের অধিকাংশ যুক্তির পূর্বাভাস উক্ত গ্রীক মনীষীর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা অনেকেই যেখানে নিজেদের যুক্তির মধ্যে নিহিত সিদ্ধান্তটিকে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করেন, প্লেটো সেক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা না রেখে গণতন্ত্রের প্রকৃষ্টতর বিকল্প হিশেবে দার্শনিক-অভিজাততন্ত্রের স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। অন্তত তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ না ঘটলে সমাজের কল্যাণ অসম্ভব।[২০]

কিন্তু আমরা যারা এদেশে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত, তাদের পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া একটু শক্ত। আমাদের মনে এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতই গুটিকয়েক প্রশ্ন জাগ্রত হয়। অতীত ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে, সাংস্কৃতিক মানের সমকালীন নিম্নগামিতার জন্য জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু দায়ী ? সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করার কতটুকু সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন ? যন্ত্রবিপ্লবের পর গত একশ' দেড়শ' বছরের মধ্যে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার এবং ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে বটে ; কিন্তু রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে আজো কি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই জনসাধারণের নামে সমস্ত শক্তি নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখেনি ? এই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই কি জনসাধারণের অনভিজ্ঞতা এবং সংগঠনশক্তির অভাবের সুযোগ নিয়ে সমাজের ভাবনা, চিন্তা, রুচি এবং চাহিদাকে

নিয়ন্ত্রিত করছে না ? তাছাড়া সংস্কৃতির সমকালীন অবক্ষয় রোধ করার জন্য বিদগ্ধ-সম্প্রদায় কতটুকু চেষ্টিত ? অথবা তাঁরাও কি জনসাধারণের মতই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ব্যক্তির চাপের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেননি ?

সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য জনসাধারণকে দায়ী করার আগে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির বিবেচনা করা প্রয়োজন। সম্প্রতিকালে যাঁরা ফাসিস্ত্‌ কিংবা কম্যুনিস্ট্‌ মতাবলম্বী না হয়েও গণতন্ত্রের শ্রেয়ত্বে সংশয়ী, তাঁদের অনেকেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলি-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। অথচ বর্তমান প্রসঙ্গে এ প্রশ্নগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এদের সম্পর্কে নেহাৎ কম তথ্য এতাবৎ সংগৃহীত হয়নি। রিচার্ড হোগার্ট নামে জনৈক ইংরেজ লেখক বছর বাইশ আগে "অক্ষর পরিচয়ের উপযোগিতা" নামে একটি বই লিখে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীমহলে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন।[২১] হোগার্ট নিজে শ্রমিক পরিবারের সন্তান ; শ্রমিকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অনেকটাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া। তাঁর মতে শ্রমিকসংস্কৃতি এবং গণসংস্কৃতির মধ্যে একটা আমূল পার্থক্য বর্তমান। শ্রমিকসংস্কৃতি একধরনের লোকসংস্কৃতি। অনেকগুলি মানুষ এক অঞ্চলে একই অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন বাস করার ফলে তাদের পারস্পরিক হার্দিক সম্পর্ক এবং সুখদুঃখের সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংস্কৃতির উপাদান গড়ে উঠেছে। অপরপক্ষে গণসংস্কৃতি আসলে কারখানায় তৈরী ; বিত্তবান সম্প্রদায় জনসাধারণ সম্বন্ধে নিজেদের ধারণার ছাঁচে বাজারে বিক্রির জন্য যেসব মাল তৈরি করছে, তারি সামষ্টিক ফল এই গণসংস্কৃতি। হোগার্ট বিস্তারিত বিবরণ-সহযোগে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কীভাবে যান্ত্রিক গণসংস্কৃতির চাপে স্বভাবজ শ্রমিকসংস্কৃতি ক্রমে লোপ পেতে বসেছে। শ্রমিক-সংস্কৃতির যেগুলি বৈশিষ্ট্য—স্থানীয় জীবনের প্রতি অনুরাগ এবং বাসস্থান পরিবর্তনের অনিচ্ছা, গোষ্ঠীবোধ এবং পরস্পরের প্রতি সহজাত আনুগত্য, ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষের প্রতি আকর্ষণ এবং বিমূর্ত-কল্পনা অথবা নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক বিষয়ে ভয় এবং সন্দেহ ; দেহ এবং যৌনজীবনের দাবিকে নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়ার প্রবণতা —এ-সবই গণসংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে আজ লুপ্তপ্রায়। শ্রমিকদের স্বকীয় জীবনযাত্রার মধ্যে যে সরল সহজ প্রাণৈশ্বর্য ছিল তা গণসংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি ; উল্টে বাজারে সংস্কৃতির 'বিকৃত চাকচিক্য' শ্রমিকদের মন বিষাক্ত করে তুলছে। গণসংস্কৃতিতে শ্রমিকরা ভোক্তা নয়, তারা ক্রেতা মাত্র : তারা এর স্রষ্টা নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে এর বলি।

কিন্তু শ্রমিকরা বিদ্যার্জনের সুবিধা লাভ করার পরও কেন যথার্থ সংস্কৃতির

প্রতি আকৃষ্ট হয় না? তার একটা কারণ, অধিকাংশ শ্রমিকই এতাবৎ প্রকৃত উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়নি; ফলে শেক্‌সপীয়র-মিল্টন পড়ে উপভোগ করার সামর্থ্য তাদের আজো অনায়ত্ত। সত্য বটে, বিলেতে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক; এবং সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য বেতন দিতে হয় না। কিন্তু গণতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে শিক্ষা শুধু তারাই পায় যারা হয় স্কুলের পরীক্ষায় নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে বৃত্তিলাভ করেছে, অথবা যারা ভাগ্যক্রমে বিত্তবান পরিবারের সন্তান। অধিকাংশ ছাত্রই এগারো বছর বয়সে পরীক্ষা দেওয়ার পর আরো চার-পাঁচ বছর যে অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করে তার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অংশীদার হবার সামর্থ্য অর্জন করে না। ফলে তাদের এ কূলও যায়, ও কূলও যায়। শ্রমিকজীবনের অমার্জিত ভোগশক্তিতে তারা বঞ্চিত, "উচ্চ সংস্কৃতি" তাদের অনায়ত্ত। তখন গণসংস্কৃতিই তাদের একমাত্র সম্বল এবং সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রমিক পরিবারের যেসব ছেলেমেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বৃত্তির জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়, হোগার্টের বিশ্লেষণ-অনুসারে তাদের অবস্থা আরো করুণ। উচ্চশিক্ষা ক্রমেই এই তরুণদের আপন পরিবার এবং সমাজ থেকে বিযুক্ত করে। লেখাপড়ার জন্য যেটুকু নিভৃতি প্রয়োজন, শ্রমিক সংসারে তা একান্তই দুর্লভ। তাছাড়া কাব্য, দর্শন, চিত্রকলা, উচ্চস্তরের সঙ্গীত ইত্যাদির যে রস, তার সঙ্গে তাদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন একেবারেই অপরিচিত। তাদের সমবয়স্ক অন্য শ্রমিক-তরুণরা যখন শিক্ষা সমাপ্ত করে উপার্জনে ব্যস্ত, তখন এই স্বল্পসংখ্যক বৃত্তিভোগী তরুণরা স্বাবলম্বী না হয়ে লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাকার ফলে তাদের নিজেদের সমাজে তারা ঠাট্টার পাত্র হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে তারা আবিষ্কার করে যে বিত্তবান ঘরের ছাত্রদের তুলনায় সে জগতে তারা নিতান্ত বেমানান। পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় নেই। তারা পারিবারিক গ্রন্থাগারের আবহাওয়ায় বড় হয়নি; তাদের চোখ এবং কান ভালো ছবি দেখে কিংবা গানবাজনা শুনে অনুশীলিত নয়; পোশাক, খাদ্য-পানীয়, আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা সব ব্যাপারেই তাদের দারিদ্র্য এবং স্থূল রুচি পদে পদে প্রকাশ পায়। ফলে উচ্চশিক্ষা তাদের মনে আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার না করে হীনমন্যতাবোধকেই দৃঢ়মূল করে। একদিকে তারা বিত্তবান সহপাঠীদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে; অন্যদিকে পদে পদে

আত্মাবমাননা এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণায় তারা অভিজাতসংস্কৃতির প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। মূল গ্রন্থ পড়ে আনন্দ পাবার শক্তি তারা অনেকেই সংগ্রহ করতে পারে না; অথচ বুদ্ধিজীবীসমাজে কল্কে পাবার লোভে তারা প্রাণপণে মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং সরলীকৃত ব্যাখ্যা পড়ে বৈদগ্ধ্য অর্জনের ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এদের পক্ষে তাই নতুন কোনো সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করা দূরের কথা, কোনো প্রাণবান সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হওয়াও শক্ত।

সুতরাং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী অথবা জনসাধারণ (বিলেতের মত দেশে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই) সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধারাকে রোধ করতে আজো অসমর্থ। সেই সামর্থ্য অর্জন করার জন্য যতখানি সুযোগ এবং সময় প্রয়োজন তা তারা পায়নি। দু'চার পুরুষ ধরে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-চারুকলা চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ এবং অবসর পাওয়ার পরও জনসাধারণ যে "উচ্চ-সংস্কৃতি"র অনুরাগী হয়ে উঠবে না, এ সিদ্ধান্ত করার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ গণসংস্কৃতির সমালোচকরা উপস্থিত করেননি। এবং দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পরও যদি বিলেতের মত দেশে জনসাধারণ এবং বিত্তবান সম্প্রদায়ের মাঝখানে সুযোগ-সুবিধার ঐতিহ্য-শ্রয়ী পার্থক্য আজও দুরতিক্রম্যরূপে টিকে থেকে থাকে, তবে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে সে ব্যবধান যে রাতারাতি লোপ পাবে, এ আশা অযৌক্তিক। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে বর্তমান শতকে জনসাধারণের কোনো কোনো অংশের অবস্থার যতটা উন্নতিই হয়ে থাক না কেন, সমাজব্যবস্থায় সত্যিই কি গণশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে? কারণ তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে সাংস্কৃতিক মানের সমকালীন নিম্নগামিতার জন্য মুখ্যত গণতন্ত্রের সম্প্রসারণকে দায়ী করা সঙ্গত ঠেকে না।

॥ পাঁচ ॥

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে অতীতে স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা বর্ণ-বিন্যস্ত সমাজে জনসাধারণের না ছিল কোনো মৌল অধিকারের স্বীকৃতি, না ছিল কোনো কার্যকরী ক্ষমতা। আবার আধুনিককালের সর্বাত্মক ডিক্‌টেটরশিপে জন-সাধারণের কোনো কোনো অধিকার কাগজপত্রে স্বীকৃত হলেও ৭.স্তবে সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের চালক রাজনৈতিক দলবিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত। সেখানে জনসাধারণের হাতে কোন শক্তি নেই; তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে না, স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে

না, স্বাধীন কোনো সংগঠন গড়ার অধিকার তাদের নেই। সুতরাং সেখানকার অবস্থার জন্য জনসাধারণকে দায়ী করা অর্থহীন। কিন্তু যে সব সমাজকে আমরা গণতান্ত্রিক বলি, সেখানে এসব অধিকার স্বীকৃত; সেখানে কোনো দল বা গোষ্ঠীর হাতে যত ক্ষমতাই থাক, তাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা যায়। তাদেস বিরুদ্ধে জনমত গড়া চলে এবং নির্বাচনের সময় জনসাধারণ ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। প্রশ্ন হোল, এই সব গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, মতামত প্রকাশ, সংগঠন, প্রতিনিধিনির্বাচন ইত্যাদি বিবিধ মৌল অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্বেও সেখানে প্রকৃতপক্ষে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনসাধারণের কার্যকরী ক্ষমতা কতটুকু? অর্থাৎ আদর্শগতভাবে যাই হোক, বাস্তবক্ষেত্রে সমকালীন গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে জনসাধারণের প্রয়োজন-ইচ্ছা-ভাবনা-প্রচেষ্টার দ্বারা ইতিহাস রচিত হচ্ছে, না জনসাধারণের নামে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, পরিবার বা সম্প্রদায় সমাজজীবন পরিচালিত করছে? এক কথায়, গণতন্ত্রে জনগণের শক্তি কতটুকু?

এখন একথা নিশ্চয়ই সত্য যে আধুনিক সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রে যেখানে জন-বিক্ষোভকে পুলিশ এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অনির্দিষ্টকালের মত দমন করে রাখা সম্ভবপর, আধুনিক গণতন্ত্রে সেক্ষেত্রে জনসাধারণের সমর্থন হারিয়ে কারো পক্ষে বেশীদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকা সম্ভব নয়। যুদ্ধের পর চার্চিল এবং রক্ষণশীল দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে ব্রিটেনের জনসাধারণ বিশেষ বেগ পেয়েছিল, এমন কেউ বলে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষকে হত্যা করা সত্বেও স্ট্যালিন অথবা তাঁর দলকে রুশদেশে সর্বগ্রাসী ক্ষমতার আসন থেকে কেউ হঠাতে পারেনি। জার্মানী এবং ইতালিতে যুদ্ধ বিনা শুধু আভ্যন্তরীণ চাপে নাট্‌সী এবং ফাসিস্ত্‌দের গদী থেকে সরাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল, ইতিহাসে একথার সমর্থন মেলে না। স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে এই মূল প্রভেদ অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত এবং এটি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও কি সত্য নয় যে স্বৈরতন্ত্রের মত অতটা প্রকট না হলেও আধুনিক গণতন্ত্রেও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপস্থিতি অনস্বীকার্য? সেখানে কয়েক বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের সময় ছাড়া রাষ্ট্রপরিচালনায় জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিশেষ সুযোগ নেই? এবং (এটাই সম্ভবত সবচাইতে মারাত্মক অভিযোগ) সেখানে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি এবং প্রত্যয় অনেকটাই কি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পরিকল্পিত প্রচারব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়?

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন স্বাধীন আলোচনার

সুযোগ নেই। কিন্তু গণতন্ত্রে এ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ শুধু সম্ভবপর নয়, তা নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে। সেই সূত্রে সংগৃহীত কিছু তথ্যাদি এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মার্কিন গণতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর আর কোনো দেশের সাধারণ মানুষ এখানকার মানুষদের চাইতে বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে বলে আমার জানা নেই। এদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা প্রচুর; এখানে সমাজের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ওঠার সুযোগ বিস্তর; শিক্ষা এবং সম্ভোগেব যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; মতপ্রকাশ এবং সংগঠনের ওপরে আইনগত বিধিনিষেধ খুব কম; এমন কি আমাদের দেশে র‍্যাডিকাল মতাবলম্বীরা যেসব বিশেষ ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে দাবি করে থাকেন (যথা, ইনিসিয়েটিভ্, রেফারেণ্ডাম এবং রিকল) মার্কিনের অনেকগুলি অঙ্গরাষ্ট্রে সেগুলি স্বীকৃত এবং প্রচলিত। তবু অনেক মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ-অনুসারে এই গতিশীল গণতন্ত্রেও জনসাধারণের কার্যকরী প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের পরিচালনা গুটিকয়েক ক্ষমতাবান ব্যক্তি, পরিবার অথবা "ক্লিক"-এর হাতে কেন্দ্রীভূত; দেশের যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিকয়েক অতিকায় আর্থিক সংগঠন বা "কর্পোরেশনে"র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এমন কি বিত্তবান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে ওদেশে শ্রমিকদের যেসব বিরাট সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেগুলিতেও অধিকাংশ সদস্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় শ্রমিকনেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অনেক বেশী; সুতরাং কাগজপত্রে নাগরিকের বহুবিধ অধিকার থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ সহজ নয়; বরং অনেকক্ষেত্রে সে চেষ্টা রীতিমত বিপজ্জনক।

মার্কিনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যে কতদূর সুদূরপ্রসারী তা নিয়ে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ বই বেরিয়েছে। টি. কে. কুইন তাঁর "দানবীয় কর্পোরেশন" গ্রন্থে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে মার্কিনে আর্থিক ব্যবস্থা গুটিকয়েক বিরাট প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়।[২২] এদের মধ্যে জেনর‍্যাল মোটরস, ইউনাইটেড স্টেট্স্ স্টিল, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল (নিউ জার্সি) এবং ফার্স্ট ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রায় অর্ধেক শ্রমিক এই ধরণের গুটিকয় দৈত্যাকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করে। এরা ইচ্ছামত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জনপদ গড়ে তুলতে পারে; প্রতিযোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির হয় উচ্ছেদ ঘটিয়ে নয় তাদের সঙ্গে রফা করে এরা নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিসপত্রের দাম ওঠায় নামায়;

এদের কার্যকলাপের ওপরে না শ্রমিক না ক্রেতাসম্প্রদায়ের বিশেষ কোন প্রভাব আছে। এদের উদ্যোগে যেসব শহরে জনপদ গড়ে উঠেছে, সেখানে সমাজ-জীবনের স্থান নিয়েছে কোম্পানীকেন্দ্রিক জীবন (এই জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জামসেদপুর শহরে)। ক্ষমতার এই ভয়াবহ কেন্দ্রাভিগতার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের ইচ্ছা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজকর্ম-জীবনযাত্রা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছে করলে কোনো কর্মী অবশ্য কোনো কর্পোরেশনের চাকরী ছেড়ে দিতে পারে; আইনত সে বিষয়ে তার পুরো স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ছেড়ে সে যাবে কোথায়? অন্য আরেক কর্পোরেশনে? তাছাড়া এক প্রতিষ্ঠানে ঝগড়া করে কাজ ছাড়লে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ মেলাও শক্ত। ফলে দেশের গঠনতন্ত্র অনুসারে নাগরিকের অনেক অধিকার থাকলেও এইসব অতিকায় কর্পোরেশনের চাপে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্রমেই সমাজজীবন থেকে লোপ পেতে বসেছে।

কুইন পরোক্ষসূত্রে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন নি; তিনি এক সময়ে জেনর‍্যাল ইলেক্‌ট্রিক নামে বিরাট প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ক্ষমতার এই কেন্দ্রাভিগ ধারার বিরোধিতা করে তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর তথ্য এবং যুক্তির পিছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন আছে। ফাণ্ড ফর দি রিপাবলিক থেকে প্রকাশিত বার্ল্ সাহেবের একটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও তারি সমরূপ।[২৩] বার্ল্-এর হিশেব অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানা বা ম্যানুফ্যাকচারিং-এ নিয়োজিত মোট মূলধনের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ দেড়শটি মাত্র কর্পোরেশনের করতলগত। যদি কৃষি-শিল্প বাদ দিয়ে বাকী উৎপাদন ব্যবস্থার হিশেব ধরা যায়, তাহ'লে সম্ভবত দেখা যাবে যে মোট অ্যাসেট্‌স্-এর তিন ভাগের দু'ভাগ পাঁচশটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি। এই সব কর্পোরেশনের মধ্যে আবার মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিই সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনার ক্ষমতা দখল করে আছে। অর্থাৎ সমাজের বুকে এই কর্পোরেশন-গুলি কয়েকটি শক্তির পিরামিড; আর সেই পিরামিডের চূড়ায় কয়েকজন ব্যক্তি বা কয়েকটি পরিবার একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যদি স্মরণ রাখা যায় যে বর্তমান পৃথিবীর উৎপাদন-শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সবচাইতে বড় অংশ আজ মার্কিনীদের দখলে, তাহলে বার্ল্-এর এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় আর অতিস্ফীত ঠেকে না যে মার্কিনী গণতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার তুলনায় মধ্যযুগের সামন্ত-ব্যবস্থা নিতান্ত ছেলেমানুষি।[২৪]

বার্ল্-এর মত কুইনও আধুনিক গণতন্ত্রে মুষ্টিমেয় বিত্তবান গোষ্ঠীর হাতে

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের তুলনা করেছেন। মধ্যযুগের শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে নর্ম্যান এবং টিউডর রাজারা প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়িয়ে সামন্তদের শক্তি লোপ করার চেষ্টা পেয়েছিলেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও মাঝে মাঝে আইন করে কর্পোরেশনদের ক্ষমতা কমাবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। গুরুশিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা এ সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব নয়। তার ফলে কয়েকটি ব্যক্তিস্বত্বভিত্তিক ক্ষমতাকেন্দ্র লোপ পাবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয়বিধ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অপরপক্ষে মার্কিনের মত দেশে ট্রাষ্ট ব্যবস্থাকে দমন করার জন্য আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ থেকে সন্দেহ হয় যে কর্পোরেশনদের ক্ষমতাবৃদ্ধির পিছনে সরকারী সমর্থন বর্তমান। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্টার অ্যাডাম্স্ এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোরেস গ্রে তাঁদের একটি গ্রন্থে প্রমাণাদি সহকারে দেখিয়েছেন যে আমেরিকাতে অতিকায় আর্থিক সংগঠনদের হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা আসার জন্য সে দেশের ফেডরাল সরকার মুখ্যত দায়ী।[২৫] বিভিন্ন বিশেষ বিধিব্যবস্থা মারফৎ সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছে। ট্যাক্সের ব্যাপারে সুবিধে দিয়ে, পরোক্ষ অনুদানের বন্দোবস্ত করে, যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয় বাবদ মোটা খরচার অনুমতি দিয়ে, সরকারী উদ্বৃত্ত মালমশলা এইসব প্রতিষ্ঠানের কাছে সস্তাদরে বিক্রি করে, এবং এই জাতীয় আরো নানা প্রকাশ্য এবং গোপন উপায়ে সরকার এদের পোষণে এবং বর্ধনে সহযোগিতা করছে। অথচ পূর্বোক্ত দুই অধ্যাপকের বিশ্লেষণ-অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ মোটেই আবশ্যিক নয়।[২৬] একদিকে সরকারী সমর্থন এবং অন্যদিকে জনসাধারণের অজ্ঞ ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পূর্বে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রতি জনসাধারণের মনে সন্দেহ এবং বিরোধের ভাব সক্রিয় থাকায় গণসমর্থনের ওপরে নির্ভরশীল রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই কেন্দ্রাভিগ ধারাকে বিভিন্ন উপায়ে বাধা দেবার চেষ্টা হোত। কিন্তু সম্প্রতি কিছুটা মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাবে এবং অনেকটা এইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রচারক্রিয়ার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্যন্ত অতিকায় সংগঠনব্যবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী বলে ভাবতে শুরু করছেন।[২৭] উপরোক্ত দুই সমাজতাত্ত্বিকের মতে এই ভ্রান্ত ধারণা গণতন্ত্রকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলছে।

গণতন্ত্রে অতিকায় প্রতিষ্ঠানদের পিছনে সরকারী সমর্থনের কারণ অনুমান

করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল প্রয়োজন ; দল চালাতে হলে ভালো মাইনেয় পুরোসময় কাজ করার জন্য যোগ্য কর্মী চাই ; আর জনসমর্থন পেতে হলে দরকার নিয়মিত এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা। এসবই নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের আর্থিক সামর্থ্যের ওপরে। সুতরাং যদিও জনসাধারণের ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়, তবু সেই ভোট-লাভের জন্য বিত্তবান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণ অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও এই পৃষ্ঠপোষণের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে না ; কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো সরকারই চিরস্থায়ী নয়, কিছুকাল অন্তর অন্তর রাজনৈতিক দলদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের যারা মুখ্য-পরিচালক তাদের অনেকেই পারিবারিক অথবা ব্যবসায়িক সূত্রে দেশের অতিকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুত এই যোগ না থাকলে তাদের পক্ষে আপন আপন দলে প্রাধান্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হোত।

ফলে আধুনিককালের ফাসিস্ত্ অথবা কম্যুনিষ্ট সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রের মত গণতন্ত্রে ক্ষমতার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ না ঘটলেও সেখানেও এধারা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠেছে। ক্লাইভ জেন্‌কিন্স্ নামে একজন লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনেও মুষ্টিমেয় বিত্তবান ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রাইভেট এবং পাবলিক উভয় বিভাগের আর্থিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে থাকেন।[২৮] সমাজতন্ত্রীরা আশা করেছিলেন যে গুরুশিল্পের জাতীয়করণের ফলে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা খর্বিত হবে, বিত্তের বণ্টনে অসাম্য অনেকটা হ্রাস পাবে, এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রতিপত্তি অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের সে সব প্রত্যাশা কিছুটা পূর্ণ হয়ে থাকলেও তারি সঙ্গে আর একটি সমস্যাও দ্রুত প্রবল হয়ে ওঠে। সেটি হোল জাতীয়করণের ফলে সরকারী আমলাতন্ত্রের অভূতপূর্ব প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি। বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে যে সরকারী আমলাদের অপটুত্বের সুযোগে পুঁজিপতিরা ক্রমেই পাবলিক সেক্টর-এও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। সরকার স্পষ্টতই এধারার সমর্থক। ইতিপূর্বে ব্যক্তিস্বত্ব-ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় ছোটখাট ব্যবসায়ী এবং মিল মালিকদের হঠিয়ে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি সম্প্রদায় ঐ ব্যবস্থাকে নিজেদের কব্জায় এনেছিল ; জাতীয়করণের পর এখন তারা যেসব শিল্প জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত সেগুলিকেও নিজেদের পরিচালনাধীন করতে উদ্যোগী হয়েছে।[২৯] এই সমস্ত শিল্প পরিচালনার জন্য সরকার যেসব বোর্ড নিযুক্ত করেছেন, তাতে ডাইরেক্‌টর হিশেবে একদিকে

আছে মাইনেকরা কিছু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রধান প্রাইভেট কোম্পানীর কিছু কর্মকর্তা। জেন্‌কিন্স্‌ দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের প্রধান তেইশটি প্রাইভেট কোম্পানীর মধ্যে ন'টির কোনো-না-কোনো ডাইরেক্‌টর একই সঙ্গে কোনো-না-কোনো পাবলিক বোর্ডের সদস্য; তাছাড়া পাবলিক সেক্‌টরের বিভিন্ন বোর্ডের সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন প্রধান চারটি ব্যাঙ্কের এবং প্রধান আটত্রিশটি ইনসিওর্যান্স্‌ কোম্পানীর একজন না একজন ডাইরেক্‌টর। অবশ্য এই সব বোর্ডে শ্রমিক সদস্যও আছেন; কিন্তু বোর্ডের অন্য সদস্যদের তুলনায় নির্বাচিত শ্রমিকপ্রতিনিধিরা সংখ্যালঘিষ্ঠ; তার চাইতেও বড় কথা, এই শ্রমিক সদস্যদের বেশীর ভাগই ট্রেড-ইউনিয়নের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকায় বোর্ডে তাঁদের প্রভাব স্বভাবতই কম। উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করা যায় যে ছ'টি রেলওয়ে এরিয়া বোর্ডের প্রত্যেকটিতে আছেন ব্রিটিশ ট্র্যান্স্‌পোর্ট কমিশনের একজন সদস্য, একজন অবসরপ্রাপ্ত ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মচারী এবং পাঁচজন কোম্পানী ডাইরেক্‌টর। এইসব তথ্য থেকে জেনকিন্স্‌ সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিভিন্ন গুরুশিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস না পেয়ে বরং আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

অথচ একথা কেউই অস্বীকার করেন না যে মুষ্টিমেয়ের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের আর্থিক-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সমস্যাটা হোল, জনসাধারণের ক্রয়-সামর্থ্য যে হারে বাড়ছে তার চাইতে অনেক দ্রুতহারে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস বুরোর হিশেব থেকে জানা যায় যে সেদেশে যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে (অর্থাৎ ১৯২৯ খৃস্টাব্দে) প্রতি তিনটি পরিবার এবং ব্যক্তির মধ্যে দুজনের আয় ছিল তিন হাজার ডলারের নীচে, তার তিরিশ বছর পরে (অর্থাৎ ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে) সেই অনুপাত বদলে দাঁড়ায় প্রতি তিনজনে মাত্র একজন (এই তিরিশ বছরে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে এবং ডলারের ক্রয়ক্ষমতা যে হারে কমেছে তা এই হিশেবের মধ্যে ধরা হয়েছে)। ১৯২৯-এ ৩ কোটি ৬১ লক্ষ (পরিবার এবং অসম্পৃক্তব্যক্তির) মধ্যে ২ কোটি ৪৩ লক্ষের (অর্থাৎ শতকরা ৬৭) আয় ছিল তিন হাজার ডলারের নীচে; ১৯৫৮-য় ৫ কোটি ৪৩ লক্ষের মধ্যে ১ কোটি ৬৮ লক্ষের (অর্থাৎ শতকরা ৩১) আয় তিন হাজারের নীচে। সুতরাং এই তিন দশকের মধ্যে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক বিত্তবানের হাতে

প্রচুর ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মার্কিন সমাজে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ যে কত ব্যাপক এবং প্রবল, রাইট মিল্‌স্‌ নামে জনৈক সমাজতাত্ত্বিকের একটি বহু-আলোচিত গ্রন্থে তারি কিছুটা বিবরণ এবং বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।[৩০] মিল্‌স্‌-এর তথ্য অনুসারে মার্কিনে শুধু শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্য নয় সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা একটি মুষ্টিমেয় অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আছেন ইতিপূর্বে উল্লিখিত অতিকায় কর্পোরেশনগুলির পরিচালকবৃন্দ; দুই প্রধান রাজনৈতিকদলের মুখ্য নেতারা (এদের মধ্যে যখন যে দল রাজ্য পরিচালনার ভার পায় সেই দলের নেতারা সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তর অধিকার করে বসে); এবং সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ। এঁরা আসলে সমাজের একই স্তরের মানুষ; এঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান; এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং যোগ্যতা মোটামুটি একই ধরণের। ক্ষমতার চূড়ায় আসীন হয়ে এঁরা সুবিধেমত পরস্পরের সঙ্গে আসন অদলবদল করেন। সৈন্য-বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে সেনাপতি হন অতিকায় কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্‌টর; শিল্পপতি ছুটি নিয়ে কোনো সরকারী বিভাগ পরিচালনাব দায়িত্ব গ্রহণ করেন; রাজনৈতিক নেতার ছেলে অথবা ভাইয়ের জন্য কোনো--না-কোনো উঁচুদরের সরকারী চাকরি কিংবা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মচারীর কাজ তোলা থাকে। এই অভিজাত সমাজে বাইরের লোকের প্রবেশ কালেভদ্রে ঘটে; এর সদস্যপদ মুখ্যত উত্তরাধিকারসূত্রে মেলে। এঁদের এই বিরাট কেন্দ্রীভূত শক্তির সামনে জনসাধারণ অসহায়; শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের সদস্যদের এঁরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার যন্ত্র হিশেবে ব্যবহার করেন। নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ফ্লয়েড্‌ হাণ্টার-ও মার্কিন গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ করে মিল্‌স্‌-এর সঙ্গে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।[৩১] তবে অ্যাডাম্‌স্‌, গ্রে এবং জেন্‌কিন্স-এর মত তিনিও মনে করেন যে গণতন্ত্রে অতিকায় শিল্প কর্পোরেশনের কর্তারাই শক্তির যথার্থ মূলাধার; সরকার এবং রাজনৈতিক নেতারা আসলে তাঁদের হাতে যন্ত্রমাত্র।

প্রচুর বিত্তসম্পদ সত্ত্বেও এই অভিজাত গোষ্ঠী হয়ত সমাজে তাঁদের একচ্ছত্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারতেন না, যদি তাঁদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়ে উঠত। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মস্ত গুণ এটাই যে সেখানে স্রেফ গায়ের জোরে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা চলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের কাঠামোটা বজায় আছে, ততক্ষণ জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমবেত চেষ্টায় ক্ষমতারূঢ় গোষ্ঠীকে নির্বাচনকালে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। যে কোনো

সমাজের ইতিহাসে তাই গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এত মূল্যবান। কিন্তু গোড়ায় গলদ হোল, জনসাধারণ ব্যক্তিগত অধিকার এবং দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে আজো প্রায় কোথাও নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে শেখেননি। অপরপক্ষে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষমতার মূল উৎস হোল তাদের সংগঠন-ব্যবস্থা। সুনিপুণ সংগঠনের সামর্থ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কীভাবে সমস্ত সমাজের জীবনযাত্রা নির্ধারিত করতে পারে উইলিয়াম হোয়াইট-এর বহু-আলোচিত গ্রন্থ 'দি অর্গ্যানিজেশ্যন ম্যান'-এ তার বিস্তারিত বর্ণনা মিলবে।[৩২] হোয়াইট মার্কিনী শিল্পপতিদের মুখপত্র 'ফরচুন' পত্রিকায় একটি কাল্পনিক নক্সা লেখেন। এ নক্সায় তিনি রহস্যচ্ছলে প্রস্তাব করেন যে একটি সর্বজনীন কার্ড-সিষ্টেম তৈরী করা হোক যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ লেখা থাকবে, আর সেই কার্ড ব্যবহার করে সমাজ-সংগঠনের কর্তারা প্রতিব্যক্তির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করবেন। শিল্পপতিরা কিন্তু প্রস্তাবটিকে মোটেই রসিকতা বলে উড়িয়ে না দিয়ে এব সম্ভাবনা বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন; এবং হোয়াইটের গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, মার্কিনের সবচাইতে বড স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ ফার্ম এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবাদসংগ্রহপদ্ধতি এবং তার জন্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাদি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। হোয়াইট তখন নিজে মার্কিনে সংগঠনব্যবস্থা নিয়ে তথ্যসংগ্রহে উদ্যোগী হন; 'ফরচুন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকায় এদিক দিয়ে তাঁর বিশেষ সুবিধে হয়। অনুসন্ধানের ফলে তিনি সাতঙ্কে আবিষ্কার করেন যে যে ব্যবস্থাকে তিনি রহস্য করার উদ্দেশ্যে কল্পনা করেছিলেন, দেশের অধিকাংশ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কমবেশী নিপুণতার সঙ্গে তা আগে থেকেই প্রচলিত। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই লেখার ফলে উক্ত ব্যবস্থার বহুমুখী সম্ভাবনা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার উৎকর্ষবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রতিষ্ঠান-পরিচালকেরা আরো বেশী অবহিত হয়েছেন। হোয়াইট বিস্তর প্রমাণ-উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে আধুনিক মার্কিনী সমাজে সংগঠনের বিবর্ধমান শক্তি ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য লোপ করে সমস্ত নাগরিককে একই বিশ্বাস, একই রুচি, একই আচার-ব্যবহার, উচিত-অনুচিত-বোধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান প্রধান সংগঠনের পরিচাল-করা এই যান্ত্রিক ঐক্যের মূল আদলগুলি ঠিক করে দিচ্ছেন; সেই আদলে সকলের মন গড়ে তোলার জন্য তাঁদের প্রধান সহায় বিজ্ঞান, বিশেষ করে নব্য মনোবিজ্ঞান, এবং প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ।

গণচেতনা নিয়ন্ত্রণে মনোবিকলন-বিদ্যার ব্যাপক এবং নিপুণ ব্যবহার প্রথম ঘটে বোধ হয় হিটলারের জার্মাণীতে। তারপর কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এ ব্যাপারে অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষমতাবান্ গোষ্ঠীরাও এখন আর এক্ষেত্রে একেবারে খুব পিছিয়ে নেই। তফাৎ এই যে সর্বাত্মক রাষ্ট্রে মানসিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে অপ্রতিরোধ্য পাশবপদ্ধতির প্রয়োগ প্রচলিত; গণতন্ত্রে ক্ষমতাবান্দের হাতে সে-সুযোগ সীমাবদ্ধ। ফলে গণতন্ত্রে মানসিক নিয়ন্ত্রণের চাপেও যাঁরা শিক্ষা এবং সংগঠনের সামর্থ্যে অটল থাকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। তবে গণতন্ত্রেও এ চাপ যে নিতান্ত কম নয়, এবিষয়ে যাঁরা কিছুমাত্র খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা সেকথা স্বীকার করবেন। বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচারসংস্থা মারফৎ ক্ষমতাসীন সম্প্রদায় দিনের পর দিন জনসাধারণের ভাবনা-কামনা-রুচিকে আপনাদের প্রয়োজনমত ভেঙ্গে গড়ার চেষ্টা করছেন; মনোবিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদ্দের নিয়োগ করে মন-নিয়ন্ত্রণের নিত্যনূতন উপায়-পদ্ধতি উদ্ভাবন করাচ্ছেন এবং তাকে কাজে লাগাচ্ছেন। এবিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে; দু'একটি প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।

ল্যাজারস্ফেল্ড এবং কাট্জ নামে দুজন সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে আধুনিক মার্কিনী সমাজে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে বটে, কিন্তু ক্রেতাদের রুচি মুখ্যত সমাজের গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে।[৩৩] অধিকাংশ মানুষের না আছে বাছাই করার মত আত্মপ্রত্যয় এবং অনুশীলিত মন, না আছে যথার্থ সুযোগ। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অল্প কিছু লোক এঁদের বাছাইকে নিরূপিত করেছেন। জনমত বা জনরুচি গঠন এবং পরিবর্তনের মূলে এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয়। স্ট্যান্লি কেলি নামে আরেকজন লেখক আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অনেকগুলো উদাহরণ বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন কীভাবে বিভিন্ন ক্ষমতাবান গোষ্ঠী পরিকল্পিত প্রচারব্যবস্থার মারফৎ জনসাধারণের সহজ বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে জনমত নির্মাণ করে।[৩৪] প্যাকার্ড নামে আরেকজন মার্কিনী লেখক দেখিয়েছেন যে আগে যেখানে শুধু ব্যবসায়ীরাই নিজেদের উৎপন্ন জিনিস বাজারে চালাবার জন্য ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার ব্যবস্থা

করে সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ক্রেতাদের রুচি এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন; এখন সেক্ষেত্রে শিল্পপতিদের পদানুসরণ করে রাজনৈতিক নেতারাও মনোবিকলন শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞাপন এবং তথাকথিত গণসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের মনকে নিজেদের প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী।[৩৫] উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থেই একথা খুব স্পষ্ট যে ক্ষমতাবান্‌দের সংগঠনের মধ্যে বিবেকবোধের কোন চিহ্ন নেই; জনসাধারণ অসংগঠিত এবং তাঁদের বিচারবুদ্ধি অপরিণত বলেই পরিকল্পিত প্রচারের চাপের সামনে তাঁরা এতটা অসহায়; এবং দেশের উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায় ক্ষমতাশালীদের কাছে আত্মবিক্রয় করে বলেই গণমননিয়ন্ত্রণের এইসব মারাত্মক উপায়-পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সুনিপুণ প্রয়োগ সম্ভবপর হয়েছে।

॥ ছয় ॥

শেষের কথাটি আরেকটু বিশদ করা দরকার। সংস্কৃতির ভোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক যাঁরাই হোন না কেন, প্রতি সমাজেই সংস্কৃতির স্রষ্টা, প্রবর্ধক এবং প্রধান সংরক্ষক হচ্ছেন সেই সমাজের মনীষী ব্যক্তিরা। মনীষী তাঁরাই যাঁরা পূর্বসূরীদের দ্বারা অর্জিত সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, যাঁরা সেই উত্তরাধিকারের মূল্যায়নে সমর্থ, যাঁরা সেই সম্পদের সংরক্ষণে সচেষ্ট, এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা নব নব রূপের উদ্ভাবনে সক্ষম, যাঁরা নব নব জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত, যাঁরা স্বকীয় সৃষ্টির দ্বারা ঐতিহ্যকে সম্পন্নতর করতে উদ্যোগী। সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং নিপুণ প্রকাশ-সামর্থ্যের অনুশীলনে এঁরা নিরলস; নাচিকেত প্রশ্নশীলতা এবং অদম্য সৃজনপ্রেরণার অধিকারী হওয়ার ফলে অভ্যাসের জড়তা থেকে এঁরা অনেকটা মুক্ত। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক এবং শিল্পী—এঁরাই হোলেন যে কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান উৎস। সৃষ্টি, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের দ্বারা এঁরা সংস্কৃতির সম্পদ বৃদ্ধি করেন; অপর পক্ষে বৈদগ্ধ্য এবং নিষ্ঠার দ্বারা এঁরা অর্জিত সংস্কৃতিকে অবক্ষয় এবং নিম্নগামিতার হাত থেকে রক্ষা করেন।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া রহস্যময়; কিন্তু অনুশীলন, মূল্যবোধ, জিজ্ঞাসা এবং নিষ্ঠা ছাড়া সংস্কৃতিকে রক্ষা করা যে অসম্ভব, একথা সকলেই স্বীকার করেন। বলা বাহুল্য, লোকাচারের প্রতি আনুগত্যকে আমরা নিষ্ঠা বলছি না; নিজের বিচার, মূল্যবোধ এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে অটুট দৃঢ়তার নাম নিষ্ঠা। বিত্ত, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে, বিরোধ, ক্ষতি এবং শাস্তির ভয়কে

জয় করে যে মনীষীরা নিজেদের সাধনার ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে সমর্থ, তাঁরাই সংস্কৃতির যথার্থ রক্ষক। কোনো সমাজের মনীষীসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন এই নিষ্ঠার অভাব ঘটে, তখন সেখানে সংস্কৃতির নিম্নগামিতা প্রত্যাশিত।

এখন প্রশ্ন হোল আধুনিককালে মনীষীদের মধ্যে পূর্বোক্ত নিষ্ঠার উপস্থিতি কতটা চোখে পড়ে। সকলেই জানেন যে এযুগের সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রে চিন্তার সততা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখা অসম্ভব। ফাসিস্ত্ এবং নাট্সী রাষ্ট্রে শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের বিবেককে বলপ্রয়োগের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, কম্যুনিষ্ট্ রাষ্ট্রে নিষ্ঠাবান্ মনীষীদের হত্যা করে বাকি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে উঁচু মাইনের সরকারী চাকরে পর্যবসিত করার চেষ্টা চলেছে। ডিক্টেটরী ব্যবস্থায় জ্ঞানী-গুণীদের সামনে দাসত্বের বিকল্প হোল আত্মহত্যা, বন্দীত্ব অথবা মৃত্যু। অপরপক্ষে গণতন্ত্রের অন্য যে ত্রুটিই থাক্ সেখানে শিল্পী এবং মনীষীদের স্বাধীনতাকে শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা কোথাও লোপ করা হয়নি। রাষ্ট্রশক্তি অথবা আভিজাত এবং বিত্তবান সম্প্রদায়ের চাপ, এমনকি লোকাচার এবং জনমতের বিরুদ্ধেও নিজের রুচি ও মূল্যবোধেব প্রতি প্রকাশ্যভাবে অনুরক্ত থাকার অধিকার সে-সমাজে স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও আধুনিক গণতন্ত্রে মনীষীরা তাঁদের নিষ্ঠাকে কতখানি বজায় রাখতে পেরেছেন ?

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করেন শিল্পী-সাহিত্যিক ; কিন্তু সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এবং সাংস্কৃতিক মানকে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদের। বিশেষ করে যাঁরা কলেজ এবং বিশ্ববিত্থালয়ের অধ্যাপক তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় যে তাঁরা একদিকে সর্ববিধ মূঢ়তার আক্রমণ প্রতিরোধ করে মনস্বিতার ঐতিহ্যকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবেন, এবং অন্যদিকে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মনে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি অনুরাগ ও স্বাধীন চিন্তার সামর্থ্য সঞ্চার করে সমাজকে মানসিক জড়তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্রে অধ্যাপকসম্প্রদায় এই দায়িত্ব যে কীভাবে পালন করছেন, সে সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলাই ভাল। এই প্রবন্ধের যাঁরা সম্ভাব্য পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অনেকেই কলেজে এবং বিশ্ববিত্থালয়ে পাঠগ্রহণ করার কালে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে ; কিন্তু মোটামুটি বোধ হয় বলা যায় যে বর্তমানকালে এদেশের অধিকাংশ অধ্যাপক না বিদগ্ধ না নিষ্ঠাবান। তারা জ্ঞানচর্চা অথবা শিল্পসম্ভোগের চাইতে বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রতি অনেক বেশী অনুরক্ত ; তাঁরা স্বাধীন চিন্তায়

অনভ্যস্ত এবং সেকারণে প্রচলিত চিন্তার পুনরাবৃত্তি করেই তৃপ্ত। তাঁদের অনুভূতি স্থূল, জিজ্ঞাসাবোধ মোহগ্রস্ত ; তাঁদের না আছে আপন উপলব্ধির প্রতি নিষ্ঠা, না আছে নতুন করে মূল্যায়নের ক্ষমতা। এবং ফলে মনের সম্পদে দরিদ্র এই অধ্যাপকসম্প্রদায়ের প্রভাব যদি তাঁদের ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ না হয়ে থাকে, তাতে আমরা পীড়া বোধ হয়ত করতে পারি, কিন্তু বিস্মিত হতে পারি না।

আমাদের দেশে অধ্যাপকদের সুযোগসুবিধা কম এবং তাদের আর্থিক অবস্থা হীন, উপরোক্ত অভিযোগের জবাবে এই যুক্তি দেখান হয়। কিন্তু পৃথিবীর সব চাইতে বর্ধিষ্ণু গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বা গড়পড়তা অধ্যাপকের চরিত্রে এমন কি বেশী ইন্টেগ্রিটির লক্ষণ চোখে পড়ে? এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ভেব্‌লেন্‌ আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ীকূলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৩৬] বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের নিয়োগ বহু ক্ষেত্রেই পাণ্ডিত্য অথবা শিক্ষকতার কাজে যোগ্যতার দ্বারা স্থির হয় না ; বাজারে মানুষটির চাহিদা কী রকম তারি হিসেব করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নির্বাচন করেন। তৎকালে এ সমালোচনায় কতটা যাথার্থ্য ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে ; কিন্তু পঞ্চাশের দশকে দুজন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক একটি গ্রন্থে বিস্তারিত যুক্তিপ্রমাণাদি সহযোগে দেখান যে সমকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যাবত্তা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পণ্যদ্রব্যে পর্যবসিত।[৩৭] এঁরা আমেরিকার কয়েকটি প্রধান প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ব্যাপারটি আমাদের মনে সব চাইতে পীড়াদায়ক ঠেকে সেটি হোল, অধিকাংশ অধ্যাপক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের মিয়মিত করতে অনিচ্ছুক ত' ননই, বরং জ্ঞানার্জনের চাইতে প্রতিষ্ঠার্জনে এঁরা স্পষ্টত অনেক বেশী উদ্যোগী ; ছাত্রদের মানসিক বিকাশের চাইতে নিয়োগকর্তাদের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়ার ব্যাপারে এঁরা অধিকতর সচেষ্ট ও পরিশ্রমী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারে অধ্যাপকদের দর তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা, প্রত্যয়গত নিষ্ঠা অথবা অধ্যাপনার সামর্থ্য দিয়ে যাচাই হয় না ; তাঁরা ক'খানা বই লিখেছেন (সংখ্যাটাই মুখ্য গুণ গৌণ), ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানিয়ে চলতে তাঁরা কতটা প্রস্তুত, কোন্‌ অ্যাকাডেমিক

ক্লিকের সঙ্গে তাঁদের কেমন সম্পর্ক, পাঁচ জনে তাঁদের কতটা খাতির করে, তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসে এবং বিবাহিত জীবনে কোনো গলদ আছে কিনা' এইসব হোল প্রধান বিবেচ্য। অথচ এর বিরুদ্ধে অধ্যাপকদের তরফ থেকে বড় একটা আপত্তি দেখা যায় না। তাঁরা বরং এই বাজারে নিজেদের দর ওঠাবার জন্য নানারকম কলাকৌশল অর্জনে ব্যাপৃত।

ক্যাপ্‌লো এবং ম্যাক্‌গীর বিশ্লেষণ থেকে অবশ্য এটা প্রমাণ হয় না যে উক্ত অধ্যাপকবৃন্দের পাণ্ডিত্য কম। তাঁদের যেটা প্রকৃত অভাব সেটা চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠা বা ইণ্টেগ্রিটির অভাব। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির যদি চরিত্রবল না থাকে, তাহলে ভয় কিংবা লোভ দেখিয়ে প্রয়োজনমত তাঁদের নীরব করিয়ে রাখা যায়, এমনকি তাঁদেরকে দিয়ে নিজেদের প্রত্যয়বিরোধী কথা বলানো হয়ত অসম্ভব নয়। কম্যুনিস্ট্‌ এবং ফাসিস্ত্‌ রাষ্ট্রে চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে দেশের মধ্যে বাস করে নিজের বিবেক অনুযায়ী কিছু লেখা বা বলা প্রায় অসম্ভব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনীষীরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য অনেকটা নির্ভয়েই সংগ্রাম করতে পারেন (অবশ্য যদি তাঁদের বিবেকে ঘুণ না ধরে থাকে)। অথচ মার্কিন দেশে ম্যাকার্থির আমলে দেখা গেল, উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত এরকম বিনা প্রতিবাদে প্রবল অন্যায়ের দাপটকে নিজেদের ভাগ্য বলে মেনে নিলেন। কিন্তু ম্যাকার্থির বহু বিজ্ঞাপিত ক্ষমতার ভিতরটা যে আসলে ফাঁপা ছিল, প্রথম ধাক্‌কাতেই ত' সেটি প্রকাশ পেল। তাহলে মার্কিনের জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায় ম্যাকার্থির দাবড়ানিতে কয়েক বছর একেবারে তটস্থ হয়েছিলেন কেন?

ম্যাকার্থির পতনের পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্লানিকর অধ্যায়কে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডোয়ার্ড শিল্‌স্‌-এর মতে এর প্রধান কারণ মার্কিনী সমাজের "পপুলিস্ট" ঐতিহ্য।[৩৮] ওদেশে সমাজকে যে ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে তার মূল প্রেরণা হোল সব মানুষকে একই ছাঁচে ঢালাই করা। এই ছাঁচে-ঢালা গড়পড়তা মার্কিন নাগরিক উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কর্মপটু, চিন্তাবিমুখ, উগ্র রকমের জাতীয়তাবাদী, আগন্তুকের প্রতি সন্দেহ পরায়ণ, মনস্বিতার মূল্যে অবিশ্বাসী, বিকল্পের সম্মুখীন হতে অনিচ্ছুক, জটীল সমস্যার অতিসরলীকৃত সমাধানে অভ্যস্ত। অধিকাংশের সংস্কার, অভ্যাস, মত এবং রুচিকেই এরা শ্রেয় মনে করে; ব্যতিক্রমের প্রতি এরা অসহনশীল। মার্কিন দেশে কোনো

উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে এই গড়পড়তা মার্কিনবাসীর আস্থা অর্জন করতে হয়; তাদের খোসামোদ করা ছাড়া উপায় থাকে না। বলাবাহুল্য, এজাতীয় সমাজে বিদগ্ধজনের স্থান খুব অনিশ্চিত।

এখন যতদিন পর্যন্ত মার্কিনের জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায় ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে অধ্যাপনাজাতীয় নিরীহ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন ততদিন মার্কিনী জনসাধারণ এবং তাদের প্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতারা এঁদের ঔদাসীন্যভরে সহ্য করেছেন। কিন্তু রুজভেল্টের নিউ ডিলের আমলে দেশের পরিচালনার ব্যাপারে যখন বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিকদের ডাক পড়ল, তখন পেশাদার রাজনৈতিকরা তার মধ্যে নিজেদের সর্বনাশের সূচনা দেখলেন। রাজনীতিতে বিদগ্ধজনের প্রবেশের অর্থ অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত গণনেতাদের একচ্ছত্র ক্ষমতায় ভাঙন ধরা। সুতরাং এঁরা উঠেপড়ে লাগলেন যাতে জনসাধারণ প্রথমে বিদগ্ধ রাজনীতিনবিশদের বিরুদ্ধে এবং তারপর সাধারণভাবে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের প্রতি বিদিষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিনের "পপুলিস্ট" ঐতিহ্যের সুযোগ নিয়ে এই গণতোষক রাজনীতিকরা ক্রমে জনসাধারণের মনে স্বাধীনচিত্ত জ্ঞানীগুণীদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা এবং আক্রোশের মনোভাব প্রবল করে তোলে। এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেই ম্যাকার্থি এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আক্রোশের কারণ হোল, এঁরা গড়পড়তার ছাঁচে পড়েন না, এঁরা জনসমর্থনের মাপকাঠিতে কোনো কিছুর যাথার্থ্য বিচার করতে রাজী নয়, এঁরা এমন অনেক কিছু জানেন যা চৌমাথার মোড়ে বক্তৃতা দিয়ে কিংবা খবরের কাগজের মারফৎ সর্বসাধারণকে জানানো যায় না। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে দেশরক্ষার জন্য সামরিক বিভাগ থেকে নানা গোপন গবেষণা এবং পরীক্ষাদি করানো হয়েছিল যার সন্ধান শুধু বৈজ্ঞানিকরা জানতেন এবং মার্কিন সরকার যে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত সংবাদ কংগ্রেসের গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচার করতে উৎসাহী ছিলেন না। প্রতিনিধিরা শোধ নেবার চেষ্টা করলেন একদিকে গণতন্ত্রের নামে সব গোপন তথ্যকে সর্বসাধারণ্যে প্রচারের দাবি তুলে, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকদের দেশপ্রেম এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে জনসাধারণের মনে সন্দেহ প্রবলতর করে। রাজনৈতিক আক্রমণের সামনে পণ্ডিত সম্প্রদায় অনেকটাই অসহায়। কারণ মার্কিনী "গণতান্ত্রিক" ঐতিহ্যে মনস্বিতার আভিজাত্য অস্বীকৃত; এবং

অধিকাংশ মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে ডেমাগগ্‌দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ অসম্ভব।

শিল্‌স্‌ সাহেবের এই বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক খাঁটি কথা আছে; কিন্তু মার্কিণী গণতন্ত্রে মনস্বিতার কোনো কদর নেই, এ অভিযোগ বোধ হয় পুরোপুরি সত্য নয়। ১৯৫৭ সালে বিলেতের "এনকাউণ্টার" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিপসেট নামে জনৈক সমাজবিজ্ঞানী মার্কিন দেশের ন্যাশন্যাল ওপিনিয়ন রিসার্চ সেণ্টার-এর একটি সার্ভে থেকে তথ্যপ্রমাণাদি দিয়ে দাবি করেছিলেন যে সে দেশেও জনসাধারণ ব্যাঙ্কার, মিলমালিক বা ঐজাতীয় লোকের চাইতে ডাক্তার এবং কলেজের অধ্যাপককে বেশী সম্মান করে।[৩৯] লিপ্‌সেট্‌-এর দাবি যদি ঠিক নাও হয়, তাহলেও শিল্‌স্‌-এর আলোচনা থেকে একটি মূল প্রশ্নের জবাব মেলে না। মার্কিন দেশে শিক্ষার বিকিরণের ব্যাপক বন্দোবস্ত আছে; বিলেতের মত সেখানে "ইলেভ্‌ন্‌-প্লাস"-এর সমস্যা দেখা দেয়নি; বিস্তব ছেলেমেয়ে সেখানে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। বছব বছর সে দেশে সাধারণ ঘরের বহু ছেলেমেয়ে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাব সূত্রে দেশের জ্ঞানীগুণী-পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসে। তা সত্ত্বেও মার্কিনী অধ্যাপকবৃন্দ জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা, রুচি এবং সংস্কাবের ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেন না কেন? কোনো দেশের জাতীয় চরিত্র পূর্বনির্দিষ্টও নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়। ছাত্রদের মারফৎ জ্ঞানী-সম্প্রদায়েব প্রভাব প্রসারিত হয়ে মার্কিনের তথাকথিত "পপুলিস্ট" ঐতিহ্যে উদারতন্ত্রের বহুবাচনিক সহনশীলতা সঞ্চারিত করেনি কেন? শিল্‌স্‌-এর বিচার থেকে এ প্রশ্নেব সদুত্তর মেলে না।

অধ্যাপকদের এই ব্যর্থতাব আংশিক ব্যাখ্যা মেলে পূর্বোক্ত ক্যাপ্‌লো এবং ম্যাক্‌গী-র বইটিতে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় যাক্‌ বাজুঁ প্রশ্ন তুলেছেন: "মার্কিনের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মনস্বিতার যোগ এত কম কেন, আর খ্যাতি-প্রতিপত্তির যোগ এত বেশী কেন?"[৪০] লেখক দুজন এ প্রশ্ন নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা না করলেও তাঁদের তথ্যাদি থেকে এর উত্তর অনুমান করা যায়। সমাজব্যবস্থার ত্রুটি একটা কারণ বটে, কিন্তু আসলে শিক্ষকরা নিজেরাই যদি মনস্বিতার অনুশীলনে নিরুৎসুক হন, তাহলে সরষের ভূত কে ছাড়াবে? এবং যাঁরা জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানকে মূল্যবান না মনে করে

বিদ্যাকে সামাজিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত নন, তাঁদের পক্ষে ছাত্র সম্প্রদায় এবং তাদের অভিভাবকদের ওপরে আদর্শগত কোন প্রভাব ফেলা যে কঠিন হবে, এটা অপ্রত্যাশিত নয়। এই ব্যর্থতার আরেকটি সূত্রের নির্দেশ পাচ্ছি মার্কিনে সমাজ-বিজ্ঞান-চর্চার ওপরে ম্যাকার্থি যুগের প্রভাব বিশ্লেষণ করে লেখা একটি গ্রন্থে।[৪১] এই বইয়ের যুগ্ম-গ্রন্থকার ল্যাজারস্‌ফেল্‌ড্‌ এবং থীলেন্‌স্‌-এর প্রগতিপন্থী সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে খ্যাতি আছে। বিভিন্ন কলেজে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরসূত্রে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে তারি বিশ্লেষণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ম্যাকার্থির আমলে (এবং তার পতনের পরেও) মার্কিন দেশে সমাজবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত ভয়ের মধ্যে বাস করেছেন (এবং করছেন); এই আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তাবোধ তাঁদের মধ্যেই সবচাইতে প্রবল যাঁরা উক্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিকতর গবেষণা এবং গ্রন্থ বা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন; এবং এই অপেক্ষাকৃত অধিকতর "ত্রস্ত এবং সৃষ্টিশীল" (apprehensive and productive) পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিপ্লববাদী এবং বামপন্থী সমাজদর্শনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো উচিত মনে করলেও সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় পাঠ্যতালিকা, ক্লাসের আলোচনা এবং স্নাতকোত্তর গবেষণার বিষয় থেকে ঐ সব দর্শনকে হয় একেবারে বাদ দিয়েছেন, আর না হয় তাদের আলোচনাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করেছেন। বইটি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে গ্রন্থকারদ্বয় সম্পূর্ণভাবেই উক্ত অধ্যাপকসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল; তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-সঙ্কোচ এবং মানের অধোগতির জন্য মুখ্যত রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে কোথাও এমন কোন তথ্যের উল্লেখ নেই যা থেকে প্রমাণিত হয় যে অধ্যাপকদের এই ত্রাস এবং অনিশ্চয়তাবোধের যথেষ্ট ভিত্তি ছিল। ম্যাকার্থির "আন-অ্যামেরিকান কমিটি" অথবা এফ-বি-আই যে স্বাধীনচেতা অধ্যাপকদের বিশেষ ক্ষতি করতে পেরেছিল বা পারত, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় এসন্দেহ অযৌক্তিক ঠেকে না যে আসলে উক্ত অধ্যাপকদের মানসিক গঠনে আত্মপ্রত্যয়, সত্যনিষ্ঠা অথবা সাহসের সামর্থ্য বড় একটা ছিল না; তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতার চাইতে চাকরি বজায় রাখাকেই বেশী মূল্য দিয়েছিলেন; অন্যায়ের প্রতিরোধ না করে নিজেদের ভীরুতার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসে অত্যাচারীর শক্তিকে

অনেক বড় করে বাড়িয়ে দেখে তাঁরা শামুকের খোলের মধ্যে স্বস্তি খুঁজেছিলেন। ল্যাজার্‌স্‌ফেল্ড এবং থীলেন্‌স-এর অবশ্য এটা বক্তব্য নয়। তাঁরা শিক্ষকদের নিবীর্য ব্যবহারের কোন সমালোচনা না করে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য রাজনৈতিক চাপকেই শুধু দায়ী করেছেন। চাপ নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু তা যে এতটা প্রবল হয়ে উঠতে পেরেছিল তার একটা প্রধান কারণ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সে-চাপের প্রতিরোধ না করে নিজেদের অসহায়তাকে ফাঁপিয়ে-ফেনিয়ে সে চাপের কাছে মাথা নীচু করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এঁদের বইটি পড়ে গড়পড়তা মার্কিনী অধ্যাপকের যে-চেহারাটা তাই আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা হোল এই যে তাঁরা হয়ত পণ্ডিত, কিন্তু তাঁরা লোভী এবং কাপুরুষ। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এঁদের সংগৃহীত তথ্য যদি নির্ভর-যোগ্য হয়, তাহলে অন্তত মার্কিণের গণতান্ত্রিক সমাজে সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য গড়পড়তা বুদ্ধিজীবীর সমকালীন স্বার্থপর ভীরুতাও কম দায়ী নয়।

ল্যাজারস্‌ফেল্ড এবং থীলেন্‌স্‌ নিজেদের অজ্ঞাতসারে গড়পড়তা মার্কিনী অধ্যাপকের যে প্রতিকৃতি উপস্থিত করেছেন তা যে মোটেই অবাস্তব নয়, এ সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত উদার-নৈতিক অধ্যাপক রবার্ট ম্যাক্‌আইভার যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপকদের স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে অনেকগুলি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে সেদেশে চিন্তা, গবেষণা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান চেষ্টিত; কিন্তু তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে এ ভরসার কোনো সমর্থন মেলে না যে সেদেশের বুধমণ্ডলী নিজেদের স্বাধীনতা সংরক্ষণে বিশেষ আগ্রহশীল বা উদ্যোগী। বরং তাঁর আলোচনা থেকে এই সন্দেহ প্রবল হয়ে ওঠে যে নিজেদের মধ্যে নিষ্ঠা এবং প্রত্যয়ের অভাব গোপন করার জন্য শিক্ষক সম্প্রদায় বাইরের বাধাকে বড় করে দেখছেন এবং দেখাবার চেষ্টা করছেন। ম্যাকআইভার যাকে বলেছেন নিজেদের আদর্শ এবং মান-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সক্রিয় দায়িত্ববোধ মার্কিনী অধ্যাপকদের মধ্যে তারই অভাব সে দেশের সাংস্কৃতিক অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ।[৪২] তিনি নিজে সেকথা না বললেও তাঁর রিপোর্ট থেকে তাছাড়া অন্য সিদ্ধান্ত করা কঠিন। ল্যাজারস্‌ফেল্ড, থীলেন্‌স এবং ম্যাকআইভার প্রমুখ "প্রগতিশীল" মনীষীরা সমাজের চাপ এবং বুদ্ধিজীবিদের সন্ত্রস্ত জীবনযাত্রার ওপরে বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু যে কথাটা তাঁরা এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সমাজের অধিকাংশ

জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি স্মরণে রাখেননি রবার্ট ওপেনহাইমারের ভাষায় সে কথাটা এই যে বাইরের বাধা অপসৃত করে সব সময় ভয় দূর করা যায় না, ভয় দূর করার জন্য কখনো কখনো সাহসেরও প্রয়োজন ঘটে।

অধ্যাপকদের মধ্যে যে ভীরুতা এবং নিষ্ঠাহীনতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল সেটি শুধু অধ্যাপকাদর মধ্যে আবদ্ধ নয় অথবা বিশেষ কোন মার্কিন সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। জনসাধারণের মূঢ়তা এবং স্থূলরুচি নিয়ে সম্প্রতিকালে পণ্ডিত ব্যক্তিরা অনেক কথা লিখেছেন, এবং তাঁদের সে অভিযোগ মিথ্যা নয়। কিন্তু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও যে বিত্তপ্রতিপত্তির লোভে অথবা সংঘাত ও শাস্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে নিজেদের সামর্থ্যকে শক্তিমানের নির্দেশপালনে নিয়োজিত করেছেন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। ইতিপূর্বে সংবাদ, গণসংস্কৃতি এবং জনমতনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলি থেকে জনসাধারণের স্থূলরুচির যেমন খবর মেলে তেমনি এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকে না যে এই রুচির দাবী যাঁরা মেটাচ্ছেন তাঁরা নিজেরা বেশীর ভাগ ব্যক্তিই মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত, কুশলী এবং বিবেকহীন। বিদ্যাবুদ্ধি অথবা প্রকাশের দক্ষতা একেবারে না থাকলে তাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হতে পারতেন না; এবং সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল কিম্বা অন্যান্য ক্ষমতালিপ্সু সংগঠন তাঁদের চড়া হারে পারিশ্রমিক দিতে রাজী হোত না। অপরপক্ষে তাঁরা যদি বিবেকবান ব্যক্তি হতেন তাহলে আর্থিক সাফল্য কিম্বা জনপ্রিয়তার চাইতে জিজ্ঞাসা ও প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বক্তব্য ও ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধিসাধন তাঁদের কাছে অনেক বেশী কাম্য মনে হত। আর সেক্ষেত্রে সংস্কৃতির সমকালীন নিম্নগামিতার ধারা নিশ্চয়ই এতটা প্রবল হয়ে উঠতে পারত না। মনীষী যদি মনস্বিতার অনুশীলনে একাগ্র না হ'ন, ছাত্রের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলায় যদি শিক্ষকের আগ্রহ না থাকে, অভ্যস্ত ভাষা এবং ধারণার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে কল্পনার সমৃদ্ধিসাধন যদি সাহিত্যিকের কাছে অবান্তর ঠেকে, সাংবাদিক যদি ঘটনার সঠিক উপস্থাপন এবং সুচিন্তিত মূল্যায়নে পরাঙ্‌মুখ হন, এবং জনসাধারণের মানসিক অপরিণতির দোহাই দিয়ে এঁরা যদি প্রত্যেকেই ক্ষমতাসীন এবং বিত্তবান্ ব্যক্তিদের নির্দেশমত নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে সংস্কৃতির অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী, এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। পৃথিবীর দেশে দেশে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের

বিভিন্নক্ষেত্রে জ্ঞানীগুণীদের এই স্বধর্মচ্যুতি সংস্কৃতির সমকালীন অধোগমনের অন্যতম প্রধান কারণ।

সুতরাং যদিও একথা মোটামুটি স্বীকার্য যে অতীতের তুলনায় বর্তমান শতকে জনসাধারণের অবস্থায় অনেকটা উন্নতি হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং যদিও সাংস্কৃতিক মানের সমকালীন নিম্নগতি পীড়াদায়কভাবে প্রত্যক্ষ, তবু প্রথমোক্ত ঘটনাবলীকে শেষোক্ত প্রবণতার মুখ্য কারণরূপে দায়ী করা আমাদের কাছে সঙ্গত ঠেকে না।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া সত্ত্বেও আজো পৃথিবীর সর্বত্র সমাজের কার্যকয়ী ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীভূত, এবং ফলে উক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ব্যাপক এবং সুদক্ষ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের ভাবনা চিন্তা, রুচি এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই সক্ষম। এ ব্যাপারটা স্বৈরতন্ত্রে যতটা প্রকট, অন্য ব্যবস্থায় ততটা নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজেও ক্ষমতার কেন্দ্রাভিগ গতি অত্যন্ত প্রবল এবং সংগঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা বিক্ষিপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানসিক নিয়ন্ত্রণ নিতান্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ আগের তুলনায় বাড়লেও সমাজের সাংস্কৃতিক সম্ভোগের সুবিধা আজো সব দেশে অভিজাত এবং বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনো প্রায় নিরক্ষর, এবং যে অল্প কয়েকটি সমাজে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্যের অনুশীলনে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের সুবন্দোবস্ত করা এযাবৎ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ যদি জটিল চিন্তা এবং সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকেন, তবে সামান্য শিক্ষার যেটুকু সুযোগ তাঁরা অর্জন করেছেন তাকেই দোষী না করে প্রকৃষ্টতর শিক্ষার যে-সুযোগ থেকে তাঁরা এখনো বঞ্চিত তাকে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত। তৃতীয়ত, কোনো সমাজে সংস্কৃতির পোষণ এবং রক্ষণের ভার মুখ্যত যাঁদের ওপরে সেই জ্ঞানীগুণী-সম্প্রদায় যদি লোভে, মোহে অথবা ভয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হন, তা হলে ত্রুটি প্রধানত তাঁদেরই। তাঁরা যদি নিজেদের নিষ্ঠা-হীনতার জন্য জনসাধারণকে দায়ী করে খুশী হন, তাতে তাঁদের বিচারের মান ক্রমেই নেমে যাবে, এবং আধুনিক সভ্যতার গোড়ার গলদ দূর করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা গড়ে উঠবে না।

সেই গলদ কি? আমার ধারণা আধুনিক সভ্যতার সব চাইতে বড় গলদ তার প্রবল কেন্দ্রাভিগ গতি এবং এই গতিকে অপ্রতিরোধ্য বলে স্বীকার করে নেবার মনোভাব। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রবণতার পরিণতি সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে দৈত্যাকার করপোরেশনে এবং পরিশেষে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মনোপলির প্রতিষ্ঠায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনের সর্ববিধ প্রকাশকে একই ছাঁচে ঢালায় এবং মানসিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপে। ফলত এই ধারা একই সঙ্গে গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতি উভয়েরই শত্রু। এবং একটু চিন্তা করলেই বোঝা কঠিন নয় যে এই মারাত্মক প্রবণতার হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে তার সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার দাপট থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে গণতন্ত্রের বলসাধন আবশ্যিক।

অন্যান্য সমস্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রের অন্যতম পার্থক্য এখানে যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তির পরিচালনাধীন না রেখে এই ব্যবস্থা সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এবং সেই অধিকার যাতে শুধু কাগজপত্রে আবদ্ধ না থেকে কার্যকরী রূপ নিতে পারে, তার জন্য এ ব্যবস্থা উদ্যোগী। এই প্রচেষ্টার পথে দুটো বড় বাধা বর্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন ইচ্ছামত সমাজ পরিচালনা করতে তাদের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে একদিকে যেমন সামাজিক শান্তি এবং শৃঙ্খলা লোপ পাবার আশঙ্কা আছে, অন্যদিকে তেমনি শৃঙ্খলার নামে দুর্বলের ওপরে প্রবলের অত্যাচার প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা কম নয়। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হোল সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে যুক্তি, সহযোগিতা এবং সহনশীলতার আদর্শে শিক্ষিত করা, যাতে তাঁরা ইচ্ছাকে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করতে পারেন, নিজের বিকাশকে সর্বজনের বিকাশের সঙ্গে মেলাতে উদ্যোগী হন, যান্ত্রিক ঐক্যের পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিচিত্রধরণের সুষম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মানসিক বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং প্রবর্ধন অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, অনেক মানুষ যখন এক সমাজের অন্তর্গত হয়ে বাস করেন তখন তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষে প্রতিটি সামাজিক সিদ্ধান্ত নিরূপণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি-

নির্বাচনের প্রয়োজন ঘটে, বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে এ আশঙ্কা সব সময়েই থাকে যে উক্ত প্রতিনিধিবর্গ এবং কর্মচারীসম্প্রদায় সমাজের নির্দেশ পালন করার নামে নিজেদের হাতে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করবেন। এই বিপদ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মনে গড়ে তোলা চাই ব্যক্তিগত অধিকারবোধ, স্বাধীন চিন্তার শক্তি, সমাজের বিচিত্র এবং জটিল সমস্যাদি বিষয়ে জ্ঞান, প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের যোগ্যতা ও ক্রিয়াকলাপ বিচার করাব সামর্থ্য। আত্মপ্রত্যয়, স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞান এবং যুক্তিশীলতা অনুশীলনের ফলে মানুষ যাকিছু, তার একান্তভাবে ব্যক্তিগত তাকে সমাজের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে শেখে; সমাজসংগঠনকে কেন্দ্রাভিগ না করে সমাজেব মধ্যে বহু কেন্দ্র রচনায় ব্রতী হয়; দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটায় এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অতিস্ফীত হতে দেয় না; উত্তেজনা বা আক্রোশবশত কিংবা প্রতিশ্রুতির মোহে অযোগ্য লোকদের আইন সভায় না পাঠিয়ে জ্ঞানী এবং বিবেকবান সমাজকর্মীদের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করে; প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত এবং কর্মচারীদের ক্রিয়াকলাপের সুচিন্তিত সমালোচনার দ্বারা তাদেরকে সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের উভয় মুখ্য সমস্যারই সমাধানের নির্ভরযোগ্য পন্থা হোল জনসাধারণকে সুসংস্কৃত করে তোলা—তাদের মনে জ্ঞানী, স্বাধীনচিন্তা, বিচারশক্তি, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণকে বিকশিত করা।

এবং মনের এই বিকাশ হোল সংস্কৃতির উৎস, আর বিকশিত মনের বিচিত্র প্রকাশই সংস্কৃতির উপাদান। যে সমাজে যত বেশীসংখ্যক লোকের মনের বিকাশ ঘটবে সে সমাজে শুধু যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তত দৃঢ়মূল হয়ে উঠবে তা নয়, সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনও তত সমৃদ্ধতর হবে, এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য যে সমাজে মনস্বিতার চর্চা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানেও সংস্কৃতির উদ্ভব সম্ভবপর। বস্তুত অধিকাংশ প্রাগাধুনিক সভ্যতায় তাইতো ঘটেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে যেসব ত্রুটি এবং বিপদের সম্ভাবনা বর্তমান সেগুলিকে মোটেই অবহেলা করা যায় না। প্রথমত, সাংস্কৃতিক জীবনে মুষ্টিমেয়ের একাধিকার কায়েম হওয়ার ফলে উক্ত সমাজে ক্রমে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনে বিবেকবোধ এবং জিজ্ঞাসাবৃত্তি দুর্বলতর হয়ে আসে। তাঁরা জ্ঞানের চাইতে ক্ষমতাকে, সর্বসাধারণেব কল্যাণের চাইতে নিজেদের সুযোগসুবিধার সংরক্ষণকে,

নতুন নতুন সম্ভাবনার উদ্ভাবনের চাইতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণকে অধিকতর মূল্য দিতে থাকেন। ফলে সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়, সংস্কৃতিবানদের মন রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর জন্য একধরণের উচিত-অনুচিত এবং বাকি সমাজের জন্য জনসাধারণের বিধিনিষেধ প্রণয়ন করার ফলে ন্যায়-অন্যায়ের সার্বজনিক ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে এবং সমাজে শুভনাস্তিক্যের ভাব প্রসার লাভ করে। অপরপক্ষে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য তাঁরা অসংখ্য অনুশাসনের চাপে জনসাধারণের বোধবুদ্ধিকে পঙ্গু করতে প্রয়াসী হন। ফলে সমাজ জীবনে জড়তা আসে। ভারতবর্ষে বর্ণবিভাগের ফলে এইভাবেই উপনিষদের ঐশ্বর্য স্মৃতি-অনুশাসনের দৈন্যে পর্যবসিত হয়েছিল। তাছাড়া সমাজের অধিকাংশ মানুষকে মনের চর্চা থেকে বঞ্চিত রাখার ফলে বিচিত্র ব্যক্তিদের বহুবিধ দানে এ-জাতীয় সংস্কৃতি পুষ্ট হয়ে ওঠে না। কোনো দেশের বেশীর ভাগ জমি যদি অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে তবে সে দেশের জীবনযাত্রার মান যেমন উঁচু দিকে উঠতে পারে না, তেমনি কোনো সমাজে অধিকাংশ মানুষের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, জিজ্ঞাসা, কল্পনা যদি উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সার্থক প্রকাশ না পায় তাহলে সেখানকার সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ কিছুকালের মধ্যে অবসিত হয়ে পড়ে। সেসমাজে সৃষ্টির স্থান অধিকার করে পুনরাবৃত্তি, দর্শনবিজ্ঞান পর্যবসিত হয় টীকাভাষ্যে। আত্মবিকাশের পরিবর্তে আত্মবিলোপ সমাজের ধ্যেয় হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া আরো বিপদ আছে। যে-সংস্কৃতি শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ, তার প্রতি সমাজের সর্বসাধারণের আনুগত্য গড়ে ওঠা কঠিন। ফলে যখন সেই সংস্কৃতিকে কোনো বহিরাগত শত্রু আক্রমণ করে, সাধারণ মানুষ তাকে রক্ষা করার জন্য কোনো আগ্রহ বোধ করে না। সুতরাং তা সহজেই পর্যুদস্ত হয়। অতীতে বহু অভিজাত সংস্কৃতির এইভাবে বিলোপ ঘটেছিল। আবার অন্য দিকে সাংস্কৃতিক সম্পদে মুষ্টিমেয়ের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফলে জনসাধারণ এবং বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের মাঝখানে শুধু ব্যবধান বেড়ে চলে না, তাদের ভিতরে পারস্পরিক বিদ্বেষের মনোভাবও প্রবল হয়ে ওঠে। তারই সুযোগ নিয়ে সংস্কৃতিবিরোধী গণনেতারা আবির্ভূত হন, এবং জনসমর্থন সৃষ্টি করে সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। যেহেতু জনসাধারণ সংস্কৃতিকে মূল্য দিতে শেখেননি সেহেতু সংস্কৃতির বিলোপের দ্বারা তাঁরা যে নিজেদের বিকাশের সম্ভাবনাকেই

নষ্ট করছেন, একথা তাঁরা বুঝতে পারেন না। সাম্যের নামে বর্বরতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্রের দুটি দিক আছে। একদিকে এই ব্যবস্থার যেমন উদ্দেশ্য হোল সমাজ জীবনে সর্বসাধারণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, অন্যদিকে তেমনি এর সর্ত হোল প্রতিটি ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রতি সমাজকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। গণতন্ত্র একদিকে সমাজসংগঠনকে বিবিধ সর্বজনীন অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে উদ্যোগী; অপরদিকে এইসব অধিকারের মধ্যে গণতন্ত্র যাকে প্রথম এবং প্রধান স্থান দেয় সেটি হোল ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার— স্বাধীন চিন্তার, অনুসন্ধানের, প্রত্যয়ের, প্রকাশের। নানা ব্যক্তির বিচিত্র ধ্যানধারণার মধ্যে আদান-প্রদান না ঘটলে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, নীতি, নিয়মকানুন কিছুই বিকশিত, সমৃদ্ধ অথবা প্রকৃষ্টতর হয়ে উঠতে পারে না। ফলে সংস্কৃতির বিবর্ধনের জন্য গণতন্ত্রের চাইতে উপযোগী ব্যবস্থা অকল্পনীয়।

এই সহজ সত্যটি আধুনিক কালের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এ যুগে গণতন্ত্রের মুখ্য বিকল্প রূপে যে ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে তার সাধারণ নাম টোট্যালিটেরিয়্যান ডিক্টেটরশিপ অথবা সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্র। গত ষাট বছরে এরই বিভিন্ন রূপ দেখা গেছে ইতালিতে, জার্মানীতে, স্পেনে, পর্তুগালে, আর্জেন্টাইনে, রাশিয়ায়, মহাচীনে. হাইতিতে, কাম্বোডিয়ায়। এসব দেশের অভিজ্ঞতার ফলে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে কি ফাসিজ্‌ম্ আর কি কম্যুনিজ্‌ম্ গণতন্ত্রের উভয়বিধ বিকল্পই সাংস্কৃতিক বিকাশের ঘোর পরিপন্থী। নাট্‌সীদের অন্যতম প্রধান নেতা যখন বলেছিলেন যে সংস্কৃতির নাম শুনলেই তাঁর মাথায় খুন চাপে, অন্তত তখন তিনি মিথ্যা বলেন নি। হিটলারী শাসনের কয়েক বছরের মধ্যেই জার্মানী তাই নব্য বর্বরতার প্রধান প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে গত পঞ্চাশ বছর ধরে পার্টি এবং রাষ্ট্র মানসিক স্বাধীনতার সামান্যতম আভাসকেও সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলার জন্য একাগ্র সাধনা করে আসছে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও সে চেষ্টার ছেদ পড়েনি। কম্যুনিস্ট চীনে গত ত্রিরিশ বছর ধরে চেষ্টা চলেছে মানুষকে মৌমাছিতে পরিণত করার। একদিকে দেশশুদ্ধ মানুষকে দলীয় মন্ত্র মুখস্থ করিয়ে এবং অন্যদিকে মনীষীদের সবরকম স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে এই মহাদেশের নব্য নায়করা ক্ষমতা দখল করার মাত্র দশ বছরের মধ্যেই কী

প্রক্রিয়াতে সে দেশে এক ভয়াবহ দাসব্যবস্থার প্রবর্তন করে, তার বিস্তৃত বিবরণ বহু গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

ফলত গণতন্ত্রের বিকল্পরূপে গণতন্ত্রবিরোধী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করে নয়, আধুনিক গণতন্ত্রের ত্রুটি পরিমার্জনার দ্বারা তার গণতান্ত্রিক মূল প্রত্যয়-গুলিকে আরো দৃঢ়মূল করতে পারলে তবেই সংস্কৃতির সমকালীন অধোগতি রোধা সম্ভবপর। এর জন্য একদিকে প্রয়োজন ক্ষমতার কেন্দ্রাভিগ গতিকে দুর্বল করে বহু কেন্দ্রে শক্তি এবং দায়িত্বের বিকিরণ ঘটানো : অন্যদিকে দরকার সমাজে উদ্যোগী, আত্মনির্ভর, যুক্তিশীল এবং সহযোগিতাকামী ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়ানো। বস্তুত, সমাজে যত বেশীসংখ্যক মানুষ নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন এবং নিজেদের দায়িত্বপালনে সমর্থ হয়ে উঠবেন, ততই মুষ্টিমেয় সমাজ পরিচালকদের শক্তি হ্রাস পাবে, এবং শাস্তির ভয় অথবা প্রচারকৌশল কিংবা পরিকল্পিত উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা জনসাধারণের বোধ-বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করবার আশঙ্কা কমে আসবে। ফলে গণতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুত হবে; সাধারণ মানুষের মন এক ছাঁচে ঢালাই না হয়ে বিচিত্রভাবে স্ফুরিত হবার সুযোগ পাবে; এবং নানারকমের ভাবনা-চিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজের মানসজীবন সক্রিয় এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

বলা বাহুল্য এই বিকাশের ধারা অবশ্যম্ভাবী নয়, যদিও তা সম্ভবপর। একে বাস্তব করার প্রধান উপায় হোল সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। কিন্তু অক্ষর-পরিচয় অথবা নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষাপাশের সামর্থ্য অর্জনকে শিক্ষা বলে না। শিক্ষা হোল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা মন পুষ্ট এবং বিকশিত হয়; যার ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তুলনা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি করে সামান্য ধারণায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়, মানুষের বহুযুগসঞ্চিত মানসিক উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই উত্তরাধিকারকে নিজের বিকাশের উপাদান রূপে ব্যবহার করার শক্তি অর্জন করে; কোনো সিদ্ধান্তকে শেষ উত্তর ভেবে তৃপ্ত না হয়ে নাচিকেত জিজ্ঞাসার দ্বারা জ্ঞানকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য করে তোলে; যার ফলে অনুভূতি সূক্ষ্ম এবং মার্জিত হয়; সুবিন্যস্ত চিন্তা এবং বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে; ব্যক্তির প্রকাশপটুত্ব বর্দ্ধিত হয়; ব্যক্তি সুপ্রতিষ্ঠ থেকেও বর্তমান এবং অতীত নিকট ও দূরের অন্যান্য মানুষদের বিচিত্র সাধনার অংশভাক্‌ হতে পাবে। শিক্ষা সম্বন্ধে এই ধারণা মোটেই অভিনব অথবা অবাস্তব নয়। আজো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপরোক্ত ধারণা আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু এতাবৎকাল এ জাতীয় শিক্ষা শুধু মুষ্টিমেয় মানুষই পেয়ে এসেছে। সম্প্রতি শিক্ষায় সর্বসাধারণের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার পর সমস্যা দেখা দিয়েছে যে শিক্ষাকে সর্বজনীন করেও এই আদর্শ বজায় রাখা সম্ভব কি না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যে কিছুমাত্র লাঘব ঘটিয়ে এ সমস্যার সমাধান চেষ্টা নিতান্ত মূঢ়তা। একদিকে যেমন শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা দ্রুত বাড়াতে হবে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের নিরলসভাবে সজাগ থাকতে হবে যাতে শিক্ষার মান না নামতে পারে, যাতে ক্ষুধার্ত মন পুষ্টিকর খাদ্য পায়, যাতে মানুষের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে। শুধু, স্কুল, কলেজ, পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা, রেডিও অথবা টেলিভিশনের সেট বাড়লে কোনো লাভ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যাতে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়, রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রোগ্রামে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত, নাটক, আলোচনা প্রাধান্য পায়।

ক্ষমতাসীন এবং বিত্তবান সম্প্রদায় যে নিজে থেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন, এ প্রত্যাশা অবশ্যই অবাস্তব। কিন্তু আজকের দিনের সঙ্কটাক্রান্ত সমাজেও যাঁরা ভাবুক এবং বিবেকী, যাঁরা সুবেদী এবং কল্যাণকামী, তাঁদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। জনসাধারণের মন যদি তাঁরা সুসংস্কৃত না করতে পারেন, তাহলে একদিকে যেমন পরিকল্পিত প্রচার এবং অপরিণত মনের চাহিদার চাপে সংস্কৃতির মান ক্রমেই নিম্নগামী হবে, অন্যদিকে শিল্পী এবং মনীষীরা ক্রমেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে দেশত্যাগ, আত্মহত্যা অথবা মৌনের পথ অবলম্বন করবেন, আর নয়ত শক্তিমান এবং বিত্তবানের দাসে পর্যবসিত হবেন। সংস্কৃতিকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবং তার বিকাশের সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং ব্যবসায়ীদের হাতের যন্ত্র না হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা এবং বিশিষ্টতাকে রক্ষা করার জন্য, শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হতে হবে—যাতে জনসাধারণ সংস্কৃতিকে মূল্য দিতে শেখেন, তাঁদের বিচারশক্তি জাগ্রত এবং রুচি পরিশীলিত হয়, যার ফলে তাঁরা মানসিক পরিণতির সামর্থ্যে বিত্তবান হয়ে শক্তিমান্‌দের সংগঠিত প্রচার প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, যাতে তাঁরা প্রত্যেকে আপন আপন ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করতে

উদ্যোগী হন এবং অপরের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা অর্জন করেন। মানব-সমাজের ঐক্য এবং অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে বিকেন্দ্রিত সমাজ সংগঠনকে কীভাবে মেলানো যায় তার পথ তাঁদের উদ্ভাবন করতে হবে; তীক্ষ্ণ, সুসঙ্গত এবং নিরলস সমালোচনার দ্বারা এযুগের বিভিন্ন গণতন্ত্রবিরোধী মতবাদকে খণ্ডন করে তাদের মারাত্মক প্রভাব থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করতে হবে; শিক্ষার মানকে কোনক্রমেই নামতে না দিয়ে বর্ধমান ছাত্রছাত্রী সমাজের মনে জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা এবং বিবেকবোধের সমর্থক বৃত্তিগুলিকে পুষ্ট করে তুলতে হবে। গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবীদের উপরোক্ত প্রকারের নেতৃত্বের ওপরে আজ অনেকটাই নির্ভরশীল। কিন্তু সেই নেতৃত্বের প্রধান সর্ত হোল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং শিক্ষকদের আপন আপন সাধনার ক্ষেত্রে অটল নিষ্ঠা বা ইণ্টেগ্রিটি অর্জন। কারণ সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকে তাহলে ভূত তাড়ানোর আরতো কোনো উপায় নজরে আসে না।

———

॥ মৌমাছিতন্ত্র ॥

"লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে-চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁত-মতো তৈরি হচ্ছে. কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানাদিকে মেলে দিতে পারছে না……"

রবীন্দ্রনাথ : রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ. ৩২০ ॥

"……the determinists, whether they believe in divine, physical or social predestination, the authoritarians, and those 'insectolatrists' who profess the all-importance of the hive, whether the hive be called group, class, nation or race……."

Erwin Panofsky : *Meaning in the Visual Arts*, p. 3.

রমণীরমণরণে ক্লান্ত জঁ। জাক্ রুসো আটত্রিশ বছর বয়সে এক ভারি জোরালো প্রবন্ধ ফেঁদে বসলেন। একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। বিষয় ছিল : বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা মানুষের কোনো কল্যাণ সাধন করেছে কিনা? রুসো লিখলেন, মানুষের যত বিকৃতি, তার মূল কারণই হোল শিল্প, সাহিত্য আর বিজ্ঞান। জন্মসূত্রে মানুষ সরল, নিষ্পাপ; কিন্তু যতই তার জ্ঞান বাড়ে, ততই তার চরিত্র পেঁচালো হয়ে ওঠে। শিল্প তাকে করে বিলাসী, বিজ্ঞান তার সহজ বিবেকবোধকে দুর্বল করে দেয়, সাহিত্য তাকে শেখায় সিধে কথা ঘোরালো করে বলতে। শিক্ষার প্রথম বলি সারল্য; আর সভ্যতার কাজ হোল মানুষের প্রয়োজনবৈচিত্র্য বাড়িয়ে স্বল্পে তার যে তৃপ্তি তা নষ্ট করা। আদিম মানুষই স্বাধীন মানুষ; সংস্কৃতির মধ্যে সে স্বাধীনতার বিকাশ নয়, বিনাশ ঘটে।

প্রতিযোগিতায় রুসোর পুরস্কার মিলল। উৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে বাড়িয়ে গুছিয়ে দ্বিতীয় একটি নিবন্ধ লিখে ফেললেন। তিনি বোঝালেন যে প্রকৃতির ওপরে খোদকারি করতে গিয়েই মানুষ যত দ্বন্দ্ব আর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। গাছের ফল ফেলে মানুষ যেদিন জমিতে চাষ আরম্ভ

করল, সেদিন থেকেই তার ভাগ্যবিপর্যয় শুরু। তারপর ধাতুর আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগপদ্ধতির উদ্ভাবন সর্বনাশের বনিয়াদকে পাকাপোক্ত করে গাঁথল। গোষ্ঠীজীবনের ঐক্য ভেঙেচুরে দেখা দিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেতনা। রুসো তাই প্রস্তাব করলেন যে এই পতন থেকে যদি উদ্ধার পেতে হয়, তবে মানুষকে সভ্যতার আমূল উচ্ছেদ ঘটিয়ে আদিম দশায় আবার ফিরে যেতে হবে।[১]

কিন্তু হাজার সভ্যতাবিমুখ লেখকেরও শুধু লিখে তৃপ্তি নেই, জ্ঞানীগুণীদের কাছ থেকে তারিফ পাবার লোভ তাঁরও কম নয়। ফলে রুসো তাঁর 'অসাম্যবিষয়ক নিবন্ধে'র এককপি ভল্‌তেয়ারকে উপহার পাঠালেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রাপ্তিসংবাদ এল। ভল্‌তেয়ার লিখলেন, মানবজাতির বিরুদ্ধে রচিত আপনার গ্রন্থটি পেয়েছি। সেজন্য ধন্যবাদ। আমাদের বোকা বানাবার উদ্দেশ্যে এতখানি চাতুর্যের প্রয়োগ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। আপনার লেখা পড়ে চারপায়ে হামাগুড়ি দিতে সাধ যায়। কিন্তু ষাট বছরের ওপর হয়ে গেল হামাগুড়ির অভ্যাস ছেড়েছি; সুতরাং দুঃখের সঙ্গে মানতে হচ্ছে, সে অভ্যাসে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

এরপর রুসো ভল্‌তেয়ারকে জীবনে ক্ষমা করতে পারেন নি।

॥ দুই ॥

কিন্তু ভল্‌তেয়ার গররাজি হোলে কি হবে, দুনিয়ায় চিরদিনই এমন বিস্তর লোক ছিল, আজো আছে, যারা চার-পায়ে কেন, ছ-পায়ে ফিরে যেতে রাজি যদি তাতে টিঁকে থাকার কিছু সুবিধে হয়। ছ-পা? অর্থাৎ পতঙ্গের স্তরে। শারীর অর্থে নয়—তার উপায় নেই—তবে মানস অর্থে। আর সেই সূত্রেই মৌমাছিতন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা।

ছেলে বয়েসে শিখেছিলাম মানুষের দুই গুরু, পিঁপড়ে আর মৌমাছি। এদের নিরলস পরিশ্রমের তুলনা নেই। আমাদের মত ফাঁকি দেবার ফন্দীফিকির এরা জানে না। বড় হয়ে জেনেছি এদের এই কর্মনিষ্ঠার ভিত্তি কি। প্রথমত, এদের ভাবনার বালাই নেই; লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঠিক একই কাজ একই ভাবে এরা করে আসছে; এদের ব্যবহার পুরোপুরি অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজন যে নানা রকমের হতে পারে, প্রত্যেকটি প্রয়োজন যে নানাভাবে মিটতে পারে, ব্যবহারের মধ্যে বাছাইয়ের যে একটা সমস্যা আছে—এসব অলস কল্পনা এদের বিব্রত করে না। দ্বিতীয়ত, এরা দলবদ্ধ জীব, দলের অংশ হিশেবেই

এদের অস্তিত্ব, দলগত জীবনের অতিরিক্ত যে ব্যক্তিগত জীবন তার ঝামেলা এদের পোয়াতে হয় না। দলের জীবনে প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট। কেউ চাক বাঁধে, কেউ খাবার জোগাড় করে, কেউ ডিম পাড়ে, কেউ পাহারা দেয়। নিজের বলে কারো কিছু নেই, না সত্তা না সম্পত্তি।

বুদ্ধিবিচার ও ব্যক্তিত্বের বিলোপসাধনের ওপরে যে জীবনাদর্শ এবং সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, তারি নাম দেওয়া গেল মৌমাছিতন্ত্র। কথাটা শুনতে যদিবা নতুন শোনায়, ব্যাপারটা অতি প্রাচীন। মানুষের ইতিহাসে বিবর্তনের চাকা উল্‌টিয়ে পতঙ্গদশায় ফিরে যাবার প্রয়াস বারবার চোখে পড়ে। লাইকারগাসের স্পার্টা এ চেষ্টা করেছিল। দার্শনিক প্লেটো একেই মানুষের আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা এক আশ্চর্য মৌমাছিতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমেই মেয়েদের লাগিয়ে দেওয়া গেল পুত্র উৎপাদনের কাজে ; আর দু'বার গর্ভধারণের ভিতরে যে সময়টুকু সেটাকে ঠেসে দেওয়া গেল যৌথপরিবারকে সেবা করার রুটিন দিয়ে মেয়েদের নিজের বলে কিছু রইল না। ; পরিবারের কাছে নিজেদের বলি দিয়েই তাদের সার্থকতা। যদি কোনো নির্বোধ পুরুষ বেহিশেবী ভালবাসার টানে কোনো মেয়েকে ব্যক্তি ভেবে ভুল করে, তাই তাকে সযত্নে মুখস্থ করানো হোল যে পুত্র-প্রসবের দ্বারা স্বামীকে নরকগমনের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এ মন্ত্র জপেরও বিরাম নেই যে সংসারে সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার মূল কারণ রমণী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় 'দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্যো দহন্তি তৃণবন্নরম্', মেয়েরা নরকাগ্নির ইন্ধন, অথবা নরবিহঙ্গদের পাকড়াও করার জন্য 'বিকীর্ণ বাগুরা', কিংবা সংসার জলাশয়ে পুরুষ-মৎস্যদেব গাঁথবার জন্য 'বড়িশপিণ্ডিকা' অর্থাৎ বড়শির টোপ (যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ)। এদিকে আবার প্রতিটি মানুষকে পুরে দেওয়া হোল বর্ণ-উপবর্ণের কাঠামোর মধ্যে ; জন্মসূত্রেই আপনি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল। আর জন্মসূত্রেই নির্ধারিত হোল প্রত্যেকের কী করণীয়। বাছবার নেই, ভাববার নেই, নিজের জায়গাটিতে বসে নিজের নির্দিষ্ট কাজটি করে যাওয়া হোল ধর্ম। এ ব্যবস্থায় যদি কারো মনে প্রশ্ন জাগে, তাই জন্মজন্মান্তরের কর্মফলও কল্পনা করা হোল। নিষিদ্ধ হোল স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চলাফেরা, স্বেচ্ছাকৃত সম্পর্ক, নতুন রূপের উদ্ভাবন। বিজ্ঞান বিলুপ্ত হোল পুরাণপাঁচালীর মধ্যে, সাহিত্য পর্যবসিত হোল পুনরাবৃত্তিতে, শিক্ষার স্থান নিল মুখস্থবিদ্যা এবং গুরুকে ভজনা, শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে

চলার নাম হোল নৈতিকতা। ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তিকে গ্রাস করল সমাজ ; আর দর্শনপ্রস্থানের স্তরে প্রাতিস্বিক অস্তিত্বকে সমাধিস্থ করার নিশ্ছিদ্র বন্দোবস্ত রইল হয় মোক্ষে আর না হয় নির্বাণে।

এ হোল সাবেকী মৌমাছিতন্ত্রের কথা। আমাদের যুগে মৌমাছিতন্ত্র নতুন চেহারায় দেখা দিয়েছে। এর দুটো রূপের কথা বলি। ইতিহাসের হিশেবে দুটোরই সূচনা রুসো থেকে। একটির নাম ফাসিজম্। এর সার কথা, ব্যক্তি মায়া, সত্য হোল জাতি। জাতির সামষ্টিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি, সুখদুঃখ, প্রয়োজনবাসনা সব কিছু বলি দেওয়াই মানুষের সার ধর্ম। রুসো সমষ্টির ইচ্ছায় ব্রহ্মত্ব আরোপ করেছিলেন ; তাঁর মতে শুধু যে ব্যক্তিগত বলে কোনো কিছু থাকবে না তাই নয়, সমষ্টির ইচ্ছার অধীন নয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠানও অসহ্য। রুসোর ভাষায়, কোনো ব্যক্তি সমষ্টির নির্দেশ না মানতে চাইলে সমষ্টি তাকে জোর করে সে নির্দেশ মানাবে।[২] সমষ্টিকে বলশালী করার প্রয়োজনে ব্যক্তির স্বকীয়তাবোধের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তার চেতনায় এবং জীবনযাত্রায় গোষ্ঠীর ওপরে নির্ভরশীলতাকে প্রবলতর করতে হবে।[৩] ব্যক্তির জীবন আসলে গোষ্ঠীর দান, সুতরাং গোষ্ঠী নির্দেশ দিলে ব্যক্তি নির্বিচারে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য।[৪] সেটিই শ্রেষ্ঠ সমাজ যেখানে সমষ্টির প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। লুথার এবং কালভ্যাঁকে অনুসরণ করে রুসো তাই যুক্তিশীলতাকে 'শয়তানের অস্ত্র' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

ফাসিস্তদের কাছে রুসো-কল্পিত এই সমষ্টিসত্তা জাতিরূপে প্রতিভাত। জাতির নির্দেশ অলঙ্ঘ্য। কিন্তু কোন্‌টা যে জাতির নির্দেশ, তা ঠিক করবে কে ? ঠিক করবে জাতীয় রাষ্ট্র। কারণ ফাসিস্ত শাস্ত্রবিচার-অনুসারে জাতির আত্মা রাষ্ট্রের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই মারাত্মক তত্ত্বটির জন্য ফাসিজম্-এর প্রবক্তারা জার্মান দার্শনিক হেগেলের কাছে ঋণী। হেগেল তাঁর ইতিহাসের দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন যে প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট আত্মা আছে ; বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি জাতিকে একটি ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা চলে। জাতির মধ্যে যে দেহবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাস করে তাদের কর্তব্য হোল আপন আপন জাতির 'সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের' মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে দেওয়া। এই পথেই তাদের অস্তিত্বের চরিতার্থতা।[৫] হেগেলের মতে ইতিহাসে প্রতিটি জাতির আবির্ভাব এক-একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঘটে ; এই উদ্দেশ্য পূর্বনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় ;

এবং এই উদ্দেশ্যকে সার্থকায়িত করার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব। হেগেলের ভাষায়, রাষ্ট্র 'ঐশ্বরিক ধারণা'র পার্থিব রূপায়ণ ; রাষ্ট্র যাকে নীতিসঙ্গত এবং উচিত বলে নির্দেশ দেয় তা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই নির্দেশ ; সে নির্দেশ ব্যক্তিগত বিবেক এবং বিচারের ঊর্ধে ; তাকে অসংশয়ে মেনে নেওয়া নাগরিকমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য।[৬]

রুসো এবং হেগেল যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন বর্তমান শতাব্দীতে ফাসিস্তরা তাকে ব্যবহারিক রূপ দেবার চেষ্টা পেয়েছে। ফাসিস্ত রাষ্ট্র শুধু অত্যাচারী নয়, তা সর্বগ্রাসী। ফাসিস্ত পরিকল্পনা-অনুসারে জাতির প্রতিভূ রাষ্ট্রের নির্দেশে প্রতিটি মানুষের চলা-ফেরা, ভাবনা-চিন্তা, পোশাক-আশাক, মায় আবেগ-ইচ্ছা-স্বপ্ন, সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হবে। যা-কিছু এই সামষ্টিক আনুগত্যের পরিপন্থী তার আমূল উৎপাটন ফাসিস্ত রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য। বিজ্ঞান থাকবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নির্মম নিষ্ঠার সঙ্গে মুছে ফেলতে হবে। সাহিত্য থাকবে, কিন্তু সাহিত্যের কাজ হবে সৃষ্টি নয়, সাহিত্যিক হবেন রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নির্দেশের প্রচারক। দার্শনিক মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলবেন না ; বাগবিস্তার করে। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তব্যকেই অপ্রতর্ক্য সত্য হিসেবে তিনি উপস্থিত করবেন। অনুভূতির সূক্ষ্মতাসাধন, সত্যনিষ্ঠা, কিংবা চিন্তার বিকাশ ঘটানো তখন আর শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকবে না ; শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রকে রাষ্ট্রের যন্ত্রে পরিণত করা। যারা এতে রাজি থাকবে রাষ্ট্র তাদের পরিপোষণের ভার নেবে ; আর যাদের এ পন্থায় সামান্যতমও সংশয় আছে, সেই পাষণ্ডদের খুঁজে বার করে বিনাশসাধনের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

মৌমাছিতন্ত্রের এই চেহারাটি যে মাত্র পুঁথিগত পরিকল্পনা নয়, মুসোলিনী, হিটলার, পেরন কিম্বা সালাজারের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের এটি জানার কথা। এঁরা বিগত বটে, কিন্তু সার্বিক জুলুমতন্ত্রের রীতিনীতি পদ্ধতিপ্রকরণ তার ফলে তাদের প্রভাব হারায় নি। স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র যদিচ গণতান্ত্রিক তবু আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা এবং আন্দোলনে ফাসিজম্-এর প্রভাব দ্রুত বিবর্ধমান। ফাসিজম্-এর যেটি মূল প্রত্যয়—অর্থাৎ জাতির সমষ্টিগত সত্তার মধ্যে বিলোপেই ব্যক্তির মোক্ষ—প্রায় সূচনা থেকেই সেটি আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করে এসেছে। রুসোর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আমাদের এই মৌমাছিতন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ; তারপর বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নব্য-মহর্ষিদের দিব্যজ্ঞানের সমর্থনে সে মত ক্রমে ভারতীয়

শিক্ষিত-মনে তার প্রবল মোহপাশ বিস্তার করে। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল। তিনি বিচারবুদ্ধিকে নাকচ করে দৈব নির্দেশকেই সামষ্টিক ব্যবহারের নিয়ামক হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু দৈবের না আছে দেহ, না আছে ভাষা। তার নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছবে কি উপায়ে? পৌঁছবে মহাত্মাদের অপরোক্ষানুভূতি মারফত। তাঁরা যা বলবেন বিনাতর্কে তাকেই ঈশ্বরের আজ্ঞা বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি মোহগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত বিরিঞ্চি-বাবাদের আজগুবী দাবি কে মানবে? অজ্ঞ এবং নির্বোধ ছাড়া কে বিশ্বাস করবে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হোল বিধাতার রোষ, অথবা পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষ এ জন্মে কষ্ট পায়? অতএব মহাত্মা নীতিবোধের নামে একেবারে বিজ্ঞানবুদ্ধির গোড়াঘেঁষে কোপ লাগালেন। ফলত আধুনিককালে গান্ধী হলেন রুসোর সার্থকতম উত্তরসূরী। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে গান্ধীর প্রস্তাব তাঁর অধিকাংশ স্বঘোষিত অনুগামীর বিচারে অবাস্তব কল্পনাবিলাস মাত্র; নেহেরু এবং তাঁর কন্যার কার্যকলাপে এটি প্রত্যক্ষ; কিন্তু তাঁর বিচারবিমুখ, গোষ্ঠীবাদী, ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ এদেশে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সাধারণের ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

বঙ্কিম শিখিয়েছিলেন, সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণকারী এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।[৭] তাঁর মতে ব্যক্তির চাইতে সমাজ বড়; এবং 'ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই।' গুরুবাদ এবং সমষ্টিবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি এদেশে যে চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন তাই ক্রমে প্রবল হয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদরূপে অধিকাংশ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। তবে এ-ধারাকে প্রবল করার ব্যাপারে গান্ধীর দান সব চাইতে বেশী। বঙ্কিমের যুক্তিবিরোধী যুক্তির প্রভাব উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; গান্ধী রামধুনের মন্ত্রসহযোগে একদিকে চরকা কাটা এবং অন্যদিকে অসহযোগের সরল পথে সর্বসাধারণের নেতৃত্ব অর্জন করলেন। জনসমর্থনের দুর্বার স্রোতে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেকের ক্ষীণ প্রয়াস ক্রমে অধিকাংশ শিক্ষিতজনের মন থেকে বিলুপ্ত হোল।

এ ধারার বিকল্পরূপে রবীন্দ্রনাথ বারবার মানবতন্ত্রের সাধনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন: তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে, 'সবুজপত্র' যুগের নানা রচনায়, 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধাবলীতে। কিন্তু এদেশের লোক ভক্তির মেঘছোঁয়া বেদীর মাথায় কবিকে বসিয়েছে; তাঁর সতর্কবাণী তাদের

কানে ঢোকেনি, অথবা ঢুকলেও তারা তার মানে বোঝেনি। ফলত যদিচ দেশ আজ স্বাধীন, প্রাতিস্বিকতা এবং বিচারবুদ্ধি দুই-ই আজ এদেশে মুমূর্ষু। বিশ্বভারতীর স্বপ্ন আজ ধূসর স্মৃতিমাত্র। আর অক্ষম গণতন্ত্রের আশ্রয়ে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে গড়ে উঠেছে ভারতের স্বকীয় ফাসিস্ত সংগঠন: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত একটি হিশাব অনুসারে এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ, সমর্থক পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। সামষ্টিক সত্তার কাছে উৎসর্গীকৃত, গুরুর নির্দেশ নির্বিচারে পালনে অভ্যস্ত, কুচকাওয়াজ-পটু এই জঙ্গী সেবকদের সংগঠনের মধ্যে বঙ্কিম-তিলক-অরবিন্দের সাধনা আজ সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছে।

॥ তিন ॥

মৌমাছিতন্ত্রের অপর সমকালীন রূপটির নাম কম্যুনিজম্। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ফাসিজম্-এর চাইতে এটিরই প্রতিপত্তি বেশী। এর বোধ হয় একটা কারণ, গত যুদ্ধে ফাসিস্ত রাষ্ট্রেরা মার খেয়েছে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন সে যুদ্ধের শেষে পূর্ব ইয়োরোপে নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তাছাড়া চীনের মত বিরাট দেশে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় আসার ফলে ঐ মতবাদের কদর অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণত মানুষ সাফল্য দিয়েই ত' ভালমন্দ বিচার করে থাকে। কিন্তু তার চাইতেও যেটা বড় কারণ সেটা বোধ হয় এই যে ফাসিজ্‌ম্-এর মৌমাছিতন্ত্র একেবারে নির্ভেজাল; ফলে যে-মানুষের মধ্যে কিছু মাত্র বিচারবুদ্ধি বর্তমান, তার পক্ষে সে ব্যবস্থাকে পুরোপুরি স্বাগত করা বেশ শক্ত। কিন্তু কম্যুনিজ্‌মের যাঁরা প্রধান প্রবক্তা তাঁরা তাঁদের সমাজদর্শনে মৌমাছিতন্ত্রের সঙ্গে মানবতন্ত্রের কিছুটা খাদ মিশিয়েছিলেন। তাঁদের সাফাই হোল যে যদিও মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই কম্যুনিজ্‌মের উদ্দেশ্য, তবু উপায় হিশেবে মৌমাছিতন্ত্র অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী। উপায় যে কী ভাবে উদ্দেশ্যকে বিপর্যস্ত করে কম্যুনিষ্ট্‌দের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার প্রচুর উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও বিস্তর বুদ্ধিমান লোক আজো সে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করেননি। মানবতন্ত্রের পোশাক পরা এই চতুর মৌমাছিতন্ত্র তাঁদের সহজে ধোঁকা দিতে পেরেছে।

কম্যুনিজ্‌ম্ যে-সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিতে উদ্যোগী তার নাম জাতি নয়, তার নাম শ্রেণী। প্রতি ব্যক্তির ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি,

ক্রিয়া-কলাপ নাকি তার শ্রেণী-সত্তার দ্বারা নিরূপিত। কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা যতদিন না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত প্রতি সমাজে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী বিদ্যমান। এর একটি হোল সামষ্টিক উন্নয়নের পরিপন্থী ; এবং অন্যটি হোল সামষ্টিক স্বার্থের প্রতিভূ। সমাজের অবস্থাভেদে শ্রেণীদের উপাদান বদলায়, কিন্তু তাদের উপরোক্ত চারিত্রের পরিবর্তন ঘটে না। আধুনিককালে এই দুই শ্রেণীর নাম পুঁজিপতি এবং মজুর। সমাজের যে-সব ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আজো সুস্পষ্টভাবে এই দুই শ্রেণীর কোনটির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তারা হয় এই শ্রেণী-সংঘাতের চাপে লুপ্ত হবে, নয়ত টিঁকে থাকার প্রয়োজনেই তাদের এই দুই শ্রেণীর একটি-না-একটির আশ্রয় নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে যে-শ্রেণী সামষ্টিক স্বার্থের প্রতিভূ তার দেহে বিলীন হওয়াই বুদ্ধিমানী, কারণ কম্যুনিষ্ট্‌ জ্যোতিষীদের বিচারে উক্ত শ্রেণীর জয় অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুরা যেমন জন্মান্তর এবং কর্মফলের কল্পনা করে বর্ণব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কম্যুনিষ্ট্‌ দর্শনে তেমনি ঐতিহাসিক নিয়তিতে বিশ্বাস সমষ্টির কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণ সহজতর করেছে। কম্যুনিষ্ট্‌ মতে এই নিয়তিকে সচেতনভাবে মেনে নেওয়াই হোল স্বাধীনতা।

কম্যুনিষ্ট্‌ ব্যবহার-শাস্ত্র অনুসারে মানুষের মধ্যে শনি দুই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। প্রথমটি হোল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনা, আর দ্বিতীয়টি হোল প্রশ্নশীল বুদ্ধি। এই দুই ছিদ্রপথকে অন্ধবিশ্বাসের সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা হোল কম্যুনিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির মূল ব্রত। ফাসিস্ত্‌দের কাছে যেমন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র জাতীয় সত্তার প্রতিভূ, কম্যুনিষ্ট্‌দের কল্পনায় তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সত্তা কম্যুনিষ্ট্‌ পার্টির মধ্যে আত্মসচেনতার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। শ্রেণীর সামষ্টিক সত্তায় আত্ম-নিমজ্জনের নামে পার্টির নির্দেশকে নির্বিচারে মেনে চলা হোল কম্যুনিষ্টের ধর্ম। কম্যুনিষ্ট্‌-মাত্রেরই বিশ্বাস, ব্যক্তি ভুল করতে পারে, কিন্তু পার্টির ভুল অকল্পনীয়। কারণ যে-শ্রেণীর স্বপক্ষে ইতিহাস, পার্টি ত' তারই প্রতিভূ। এ শতকের সেরা কম্যুনিষ্ট্‌ নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌-এর ভাষায়, 'ব্যক্তির মোটে দুটো চোখ, পার্টি সহস্রাক্ষ ; ব্যক্তি শুধু একটা সহর দেখতে পায়, পার্টির নজর সাতরাজ্যে ছড়ানো। ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ সময়, পার্টি অফুরন্ত সময়ের মালিক। ব্যক্তির মৃত্যু আছে, পার্টিকে কেউ মারতে পারে না। কেননা পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের সম্মুখ-প্রহরী, সংগ্রামে তাদের নেতা।'[৮]

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার আগে পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রচার এবং সংগঠনের

মারফত প্রতি সদস্যের বিবেক এবং বিচারশক্তিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা পায়। ব্রেখ্‌ট্‌-এর ভাষায় পার্টির সদস্যরা জপ করতে শেখে ; 'তোমাদের এখন থেকে আর ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু রইলনা। তুমি এখন থেকে আর বার্লিনের কার্ল শ্মিট নও, তুমি নও কাজানের আনা কিয়েস্কঁ, তুমি নও মস্কোর পিটার সাভিচ্‌। এখন থেকে তোমাদের আর কোন্যে নাম বা মাতৃপরিচয় নেই ; তোমরা শুধু সাদা পাতা যার ওপরে বিপ্লব তার হুকুম লেখে···।'[৯]

কী প্রক্রিয়াতে ব্যক্তিমানুষ এভাবে মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয় তার বিশদ বিবরণ অনেক প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট্‌ লিখে গেছেন ; বস্তুত এঁদের প্রকাশিত স্মৃতিকথা দিয়ে একটি গ্রন্থাগারের অনেকগুলি তাকই ভরানো যায়। তারপর পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তখন শুধু তার সদস্যদের নয়, রাষ্ট্রশক্তির ওপরে একচেটিয়া দখলের জোরে সমস্ত সমাজকেই সে মৌমাছিতন্ত্রের অঙ্গীভূত করে। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে শুরু করে উৎপাদন, বণ্টন, নির্বাচন, পারিবারিক সম্পর্ক, শিক্ষা, সব কিছুই তখন নিয়ন্ত্রিত। সে রাষ্ট্র থেকে প্রেম এবং সৃষ্টি নির্বাসিত ; সেখানে স্বাধীন চিন্তা নিষিদ্ধ ; সেখানে বৈচিত্র্য অবলুপ্ত। সেখানে স্বাতন্ত্র্যের শাস্তি দাসত্ব অথবা মৃত্যু।

॥ চার ॥

অথচ মৌমাছির দশায় ফিরে যাওয়া নিশ্চয়ই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এ কথা ঠিক যে শুধু টিকে থাকা নয়, বিকাশের জন্যেও সমাজ-সংগঠনের প্রয়োজন আছে। এবং পরিশ্রমের অপব্যয় করাবার উদ্দেশ্যে অভ্যাসের সার্থকতা বর্তমান। কিন্তু তার জন্যে কি অন্য সব জীব থেকে মানুষের যা বৈশিষ্ট্য তাকে অস্বীকার করতে হবে?

কী সে বৈশিষ্ট্য? অন্য প্রাণীরা পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানুষ পরিবেশ বদলাতে পারে। তার কারণ মানুষের দেহের গঠন, বিশেষ করে তার মস্তিষ্কের গঠন এবং ক্রিয়াকর্ম। এই মস্তিষ্কের সামর্থ্যে মানুষ স্বাধীনতাকামী ও জ্ঞানান্বেষী জীব। মানুষের ব্যবহার তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে পূর্বনির্দিষ্ট নয়। মানুষ শুধু পরিবেশকে নয়, নিজেকেও বদলাতে পারে। সৃষ্টি-সামর্থ্যে মানুষ জীবজগতে অনন্য।

মানুষের এই বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলাই হোল মানুষের যথার্থ সাধনা। মানুষের ইতিহাসে এই সাধনা বারবার ব্যাহত হয়েছে ; তবু যাঁরা প্রকৃত

মানবতন্ত্রী তাঁরা এই সাধনাকে মানব-ইতিহাসের কেন্দ্রে ফিরে-ফিরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যক্তির বিলোপ করে সে সাধনা সম্ভব নয়, কারণ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং প্রয়োগকর্তা সমষ্টি নয়, ব্যক্তি। ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্য এবং মূল্যের স্বীকৃতির ওপরে যার প্রতিষ্ঠা, শুধু সেই সমাজসংগঠনকেই এই সাধনার উপযোগী বলা চলে। অপরপক্ষে জ্ঞানের বিকাশ ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব। জ্ঞানের উৎস জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা মানুষকে যেমন ঘটনাক্রমের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারে সহায়তা করেছে তেমনি দিয়েছে অস্তিত্বের মধ্যে অমিত সম্ভাবনার সন্ধান। আর তারি ফলে মানুষ পরিবেশের নির্দেশকেই চরম বলে না মেনে তার ওপরে নিজের স্বাধীন সৃষ্টিশীলতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যেখানে জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ, সেখানে বিকাশও স্তব্ধ, সেখানে সৃষ্টি-প্রেরণা অবসিত। লাইকারগাসের স্পার্টা নিয়মানুগত্য জানত। কিন্তু যে-সামর্থ্যে মানুষ ধ্বনির উপাদান থেকে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, বাক্যার্থের উপাদানকে কাব্যের ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তলপৃষ্ঠ' জগতে তৃপ্ত না হয়ে অস্তিত্বের মধ্যে 'বেধ'-এর সন্ধান করে, সে-সামর্থ্যে তার দৈন্য রয়ে গেল অপরিসীম।[১০] কারণ মানুষকে স্পার্টা চেয়েছিল মৌমাছির ছাঁচে ঢেলে গড়তে। অপরপক্ষে পেরিক্লেসের আথেন্স চেয়েছিল মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। আর তারি ফলে সেখানে মানুষের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' স্ফুরিত হয়েছিল বিচিত্র পথে—কাব্যে, নাটকে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, দর্শনে, জীবন-যাত্রায়।

আজ দেশে দেশে মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনা থেকে সরিয়ে এনে মৌমাছিব্রতে দীক্ষা দেবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন এ ব্রতে ব্রতী ছিল; তার কম মূল্য আমাদের দিতে হয়নি। অবশেষে রেনেসাঁস-উত্তর ইয়োরোপের জঙ্গম চিত্তবেগের ধাক্কায় এদশা থেকে আমাদের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিল। বহুযুগ পরে আমাদের ইন্দ্রলুপ্ত, অভ্যাসাশ্রয়ী, গড্ডল সমাজে এমন এক ধরণের মানুষের আবির্ভাব ঘটল যাঁদের চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বিশ্বনাগরিকতা, পৌরুষ এবং করুণা, সক্রিয় বিবেকবোধ এবং অনুশীলিত সম্ভোগের সামর্থ্য মিলিত হয়েছিল। শাস্ত্রাচার এবং যূথবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত এঁদের মন এদেশে মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছিল। সে-চেষ্টার ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই কমবেশী পরিচিত। কিন্তু সেই পথিকৃৎদের অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও সে-চেষ্টা বেশীদূর এগোতে পারেনি। প্রথমত, আধুনিক ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের

পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়। দেশের অধিকাংশ লোক যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, এদেশে আধুনিকতা এল বিদেশী শাসনের মাধ্যমে। একদিকে বিদেশীদের সঙ্গে পদে পদে সংঘাতের ফলে এবং অন্যদিকে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিযুক্ত হয়ে এদেশের আধুনিক শিক্ষিতজন নিজেদের আধুনিকতায় ক্রমে আস্থা হারালেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে স্বাজাত্যাভিমান প্রবল হয়ে উঠল; এবং যেহেতু দেশের অধিকাংশ লোকই স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যস্ত, সেই গণশক্তির সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রয়োজনে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ক্রমে নিজেদের স্বাধীনচিন্তার বিশিষ্ট সামর্থ্যকে বিসর্জন দিলেন। দেশপ্রেমের নামে একদিকে সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির আত্মবিলোপ শিক্ষিতদের আদর্শ হয়ে উঠল; অন্যদিকে সমষ্টির জড় অভ্যাসাশ্রয়িতার কাছে ব্যক্তির সৃষ্টিধর্মকে এবং সমষ্টির প্রতিনিধি দেশনেতার নির্দেশের কাছে ব্যক্তির যুক্তিশীলতাকে বলি দেবার ব্যাপক উদ্যোগ দেখা গেল। উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়াতে এই আত্মঘাতী আন্দোলন শুরু হয়। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এখন থেকে আটান্ন বছর আগে ভারতবর্ষে গান্ধী-নেতৃত্বের অভ্যুদয়কে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"মানুষ তো মৌমাছির মত কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না, তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে—সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি, চিন্তা কোরো না, কর্ম করো, তা হলে যে মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে মানবমনের সর্বোচ্চ অধিকার, অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি। ··· আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানাঘরে সে তৈরি; এইজন্যে এক চালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আরেক চালকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনার্শিয়া বলে, যে-মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা বলে অভিমান করে, তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন, উভয়েই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের

যে-জড়ত্ব সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মত বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।…

"আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখচাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলোনা। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে—সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন।… দেখতে পাচ্ছি এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আরেকপক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধ বিশ্বাসের কাছে।·

"…দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগাতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়।…বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেননা এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin।…চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমদের লড়্‌তে হবে—এক হুকুম থেকে আরেক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না …"।[১১]

কিন্তু অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই গোড়ার গলদ ঘোচাতে পারেননি। এই নিরক্ষর দেশে খুব অল্প লোকই তাঁর প্রবন্ধাবলী পড়েছে, এবং যেহেতু সত্যের আহ্বানের ভিত্তিতে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, দাঙ্গা কিম্বা ঐজাতীয় কোনো 'গণআন্দোলন' অকল্পনীয়, সেহেতু তাঁর বক্তব্য মুখে মুখে, কানে কানে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। যাঁরা বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মধ্যেও বেশীরভাগ স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধির ভাষায় আজীবন অনভ্যস্ত থাকার ফলে তাঁর কথার অর্থ না-বুঝে বলার ঢং নিয়েই মাতামাতি করেছেন।[১২] রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব" বানিয়ে এদেশী কর্তাভজার দল তাঁর সত্যের আহ্বানকে পর্যবসিত করেছে নিরর্থ মন্ত্রোচ্চারণে। গ্রামোফোন রেডিও এবং সিনেমার দৌলতে তাঁর গানের প্রচার অবশ্য বেড়েই চলেছে। বছর বছর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্য করে পাড়ায় পাড়ায় নাচ-গান-হল্লার আসরও মন্দ জমে না। কিন্তু যে জিজ্ঞাসাবৃত্তি, আত্মনির্ভরশীলতা এবং উদ্ভাবনার সামর্থ্য

দেশবাসীর অন্তঃকরণে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি জীবনের শেষ তিরিশ বছর অক্লান্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন, আজ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদেশে তার অস্তিত্ব খুঁজে বার করাও প্রায় অসম্ভব। "চার অধ্যায়"-এর সুগভীর জীবনবোধ এদেশের জড়বুদ্ধি তরুণতরুণীদের মনে কোনো দাগ রাখেনি ; অপর পক্ষে সুভাষচন্দ্রের যুক্তিবিমুখ, আবেগ-আবিল, চটকদার রাজনৈতিক কণ্ঠোচ্ছ্বাস তাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। অবশেষে ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা দেশ স্বাধীন হবার আগেই. দেশবাসীদের দুই পরস্পরবিরোধী জাতিতে বিভক্ত করেছি। নিজেদের ওপরে কিছুমাত্র আস্থা না থাকার ফলে "মহাত্মাজী", "নেতাজী" কিম্বা "গুরুজী"-রাই আমাদের প্রধান ভরসা।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়েও রবীন্দ্রনাথ মহাত্মার মৌমাছিব্রতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন। দেশের মানুষ, ভূপ্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণতা এবং অসহনশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছিল। "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" গ্রন্থে তিনি বিচার করে দেখান যে জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিসত্তা এবং শুভবুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে সামষ্টিক স্বার্থপরতার সাধনায় একদিকে মানুষের মনে বিদ্বেষবোধকে প্রবল করে তোলে, অন্যদিকে মানুষকে রাষ্ট্রের হাড়িকাঠে বলি দেয়। "জাতীয়তাবাদ এযুগের এক নিষ্ঠুর মহামারী ; তার আক্রমণে মানুষের নৈতিক প্রাণশক্তি আজ জীর্ণপ্রায়"।[১৩] যে ভূগোলের পুতুলপূজার (idolatry of geography) ওপরে দেশপ্রেমের ভিত্তি, তাকে তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্জন করেছিলেন। এন্‌ড্রুজ সাহেবকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন যে "জাতিপ্রেমের অহংকার তার বিপুলতাকে নিয়ে ; জাতিপ্রেম ঐক্যের কথা বলে বটে, কিন্তু মনে রাখেনা যে যথার্থ ঐক্যের ভিত্তি হোল ব্যক্তির স্বাধীনতা। সবাইকে এক ছাঁচে ঢেলে শুধু বন্ধনের ঐক্য রচনা করা যায়"।[১৪] তিনি চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, "যে মনুষ্যত্বের পথে জাতি আজ প্রধান অন্তরায়।"[১৫] আবার অন্যদিকে কম্যুনিস্ট্‌ রাশিয়ার প্রকৃত রূপটি সম্বন্ধে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না, তখন সে-দেশের প্রশংসা করতে গিয়েও তাঁর নজর এড়ায়নি যে "সমাজের খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায়না।···সোভিয়েট রাশিয়ায়···সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে একছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস

সুপ্রত্যক্ষ"।[১৬] ইতিপূর্বে ইতালিতে মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করে প্রথমে ফাসিস্ত্ রাষ্ট্রের সৌজন্যে মুগ্ধ হলেও পরে তার স্বরূপ আবিষ্কার করে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।[১৭] রাশিয়াতে আতিথ্য গ্রহণ করার সময়েও তাঁর "দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল (বিপ্লবের) আলোর দিক।" এখান থেকে লেখা চিঠিগুলিতে বল্‌শেভিক্‌দের ক্রিয়াকর্মের সমর্থনে অনেক উক্তি আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিজ্‌ম্-এর গোড়ার গলদের দিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মানুষের ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত সীমা এরা ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয়না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায়না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায়না। ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয়, তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারেনা। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।" "সোভিয়েট রাশিয়ায়···সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এ অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।"[১৮] কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে এর চাইতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচনা বাংলা ভাষায় আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু আগেই বলেছি জাতিবাদ, ফাসিজ্‌ম্ এবং কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী সতর্কবাণী এদেশের সাধারণ মানুষ দূরের কথা, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ওপরেও বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। এদেশের সঙ্কীর্ণবুদ্ধি শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁর বিশ্বমানবতার সাধনাকে অবাস্তব বলে অবহেলা করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর গত চারদশকের মধ্যে এদেশে শিক্ষিতসাধারণের ওপরে মৌমাছিতান্ত্রিক বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব আরো ব্যাপক, আরো দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। গান্ধীবাদের চাইতে অনেক উগ্রতর হিন্দু জাতিবাদের আদর্শে গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। আর এদেশে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালের উগ্রতম মৌমাছিতন্ত্রের প্রচারক হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি। কম্যুনিস্ট্‌দের মধ্যে রুশ-চীনের দ্বন্দ্বের ফলে দেশে কয়েকটি প্রতিযোগী কম্যুনিস্ট্ পার্টি দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে ধরলে অন্তত পশ্চিম বাংলায় এবং কেরলে কম্যুনিস্ট্‌দের প্রভাব তাতে কিছু কমেনি। এদের মারাত্মক স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার মত মনীষী

আজ এদেশে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। "সেবাব্রতী রাষ্ট্রের" নামে ভারতবর্ষের বিবর্ধমান শাসনযন্ত্র সমস্ত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব স্বীয় করতলগত করে জন-সাধারণকে ক্রমেই রাষ্ট্রের দাসত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই প্রবণতা অত্যয়ের নামে ভয়ঙ্কর রূপে প্রকট হয়ে ওঠে। সাময়িকভাবে সেই সঙ্কট কাটানো গেছে বটে, কিন্তু মৌমাছিতান্ত্রিক প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে মনে করার কারণ দেখিনা। অথচ এই ভয়াবহ প্রবণতা সম্বন্ধে এদেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল লোক আজো অচেতন অথবা উদাসীন।

সবচাইতে যেটা দুর্ভাবনার কথা, মনুষ্যত্বের এই বিকৃতি আজ কোনো একটা দেশের মধ্যে আবদ্ধ নেই, এটা আজ প্রায় সর্বব্যাপী। পশ্চিমেও আজ বহু চিন্তানায়ক ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং যুক্তিশীলতায় আস্থা হারিয়ে গোষ্ঠীবাদ এবং ধর্মে আশ্রয় খুঁজছেন। প্রায় সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপ আজও রুশ সাম্রাজ্য-তন্ত্রের কুক্ষিগত; চীন মহাদেশেও অল্পস্বল্প সংস্কার করে উগ্র মৌমাছিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে খাড়া রাখবার চেষ্টা চলেছে। লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে গণতন্ত্র একরকম অজ্ঞাত বললেই চলে। এদিকে পশ্চিম এশিয়াতে জাতিবাদ, ডিকটেটরশিপ এবং ধর্মের সংমিশ্রণ গণতান্ত্রিক বিবর্তনের নিতান্ত পরিপন্থী। পাকিস্তানের অবস্থাও তথৈবচ। আবার ইন্দোনেশিয়াতে এবং ফিলিপিনে প্রেসিডেন্টের হাতে দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। দুই মহাযুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও পৃথিবীর কোথাও জাতিবাদের মোহ আজো দুর্বল হয়নি। মার্কিনের মত সমৃদ্ধ দেশেও জাতীয় স্বার্থের অজুহাতে ব্যক্তির বিবেককে দমন করার প্রচেষ্টা কম প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আজ নিয়ন্ত্রিত যূথশক্তির দাপটে মনীষীরা কমবেশী অসহায়। তাদের ভাবনা-কল্পনায় সমাজবিমুখতা, শুভনাস্তিক্য এবং আত্মগ্লানির লক্ষণ আজ তাই অত্যন্ত প্রবল।

তবু শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। মৌমাছিতন্ত্রের প্রতি সে আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু তার মোহপাশ থেকে উদ্ধার পাবার সামর্থ্য তার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। এ সামর্থ্যের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলে তবেই তার মধ্যে মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ঘটে। এবং এ-চেতনা এক-আধজনের মধ্যে আবদ্ধ না-থেকে যখন কোনো সমাজে বেশ কিছুসংখ্যক নরনারীর মধ্যে জাগ্রত হয়, তখনই সে-সমাজে রেনেসাঁসের সূচনা ঘটে। একদা এমনি এক রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষ

মধ্যযুগীয় মৌমাছিতন্ত্রের কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করেছিল। আজ বিজ্ঞানের বিকাশ এবং ব্যাপক প্রয়োগের ফলে এক সমাজ এবং আরেক সমাজের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। এযুগের সম্ভাব্য রেনেসাঁস তাই আজ আর কোনো বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ না থেকে সর্বমানবীয় ব্যাপ্তি অর্জন করবে সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সেই রেনেসাঁস ঘটাতে গেলে একদিকে প্রয়োজন দেশে দেশে সাধারণ মানুষকে মৌমাছিতন্ত্রের আত্মঘাতী রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, অন্যদিকে তাদের মধ্যে মানুষের সৃষ্টিশীল সামর্থ্যে প্রত্যয় ফিরিয়ে আনা। যে অল্পসংখ্যক মনীষী আজকের দিনেও এই চেতনা এবং প্রত্যয়ের অধিকারী, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব তাঁদের। বিশেষ করে তাঁদের দায়িত্ব সেই তরুণতরুণীদের প্রতি যাঁরা একদিকে গুরুবাদ, মন্ত্রতন্ত্র এবং অসহায়তাবোধ ও অন্যদিকে উগ্র রাজনীতির বিকল্পের টানা পোড়েনে বিভ্রান্ত। মৌমাছিতন্ত্রের মোহ থেকে এ যুগের মানুষ কতদিনে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে, উক্ত বিশ্বনাগরিক মানবতন্ত্রী মনীষীদের উদ্যোগের ওপরে তা অনেকখানি নির্ভর করে।

জাতিবাদ, মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি

এখন থেকে বাহান্ন বছর আগে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ "ন্যাশন্যালিজ.ম্" প্রকাশিত হয়।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখে কবির মনে আর কোনো সংশয় রইল না যে ন্যাশন্যালিজ.ম্ বা জাতিবাদ মনুষ্যত্বের শত্রু। বইটিতে তিনটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধে কবি আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক পশ্চিমের সংস্কৃতি ব্যক্তির বিকাশ চায়, অন্ধ সংস্কারের জড়তা ঘুচিয়ে জ্ঞানার্জনে তার উদ্যম অপরিসীম, দূর দূর দেশেব মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে তার দান প্রচুর। অথচ তারই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতা জাতিবাদের নামে গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্তিকে বলি দিতে উদ্যোগী, ক্ষমতার লালসায় বিবেককে দমন করতে তার বাধে না, দুর্বলকে শোষণ করে সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সমৃদ্ধি অর্জনে সে গর্বিত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ছলে বলে কৌশলে পর্যুদস্ত করা প্রতিটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের সাধনা। কবির মতে আধুনিক ইতিহাসে জাতিবাদ এক ভয়াবহ মহামারী ; এরই প্রভাবে একটা দেশের সমস্ত অধিবাসীকে নির্বিবেক যূথশক্তিতে পর্যবসিত করে ধ্বংসের কাজে লাগানো হয়। জাতিবাদের উদ্ভব পশ্চিমে ; এবং এর হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার না করতে পারলে পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে জাপান পশ্চিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ক্রমেই জাতিবাদের দিকে ঝুঁকছে। যথার্থ আধুনিকতা তাকে বলা চলে যা মনের স্বাধীনতাকে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে ব্যক্তির বিকাশ-সাধনাকে সর্বাধিক মূল্য দিয়ে থাকে। ইয়োরোপ দীর্ঘদিন ধরে বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার এবং প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে ; এই কারণে ইয়োরোপ আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু ইয়োরোপ যেখানে রাষ্ট্রের কাছে সমাজকে বলি দিয়েছে, ক্ষমতার সাধনায় নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়েছে, ব্যক্তিকে

যন্ত্রে পর্যবসিত করেছে, সেখানে ইয়োরোপকে অনুসরণ করার অর্থ আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া। আধুনিক জাপানে তারই কিছু কিছু লক্ষণ দেখে কবি শঙ্কিত হয়েছেন, জাপানের চিন্তাশীল সমাজকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে চেয়েছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষে জাতিবাদ। পশ্চিম যেমন এক-দিকে ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের মানসিক জড়তা ঘুচিয়ে তার কল্যাণ সাধন করেছে, অন্যদিকে তেমনি পশ্চিম থেকেই প্রথম জাতিবাদের বিষ ভারতীয় মনে সঞ্চারিত হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ত্রুটি অনেক, কিন্তু জাতিপ্রেম তার অন্যতম নয়। এদেশে নানা স্থান থেকে নানারকম মানুষ দলে দলে এসে বসতি করেছে, কিন্তু তাদের চাপ দিয়ে একটি জাতির সামষ্টিক সত্তায় বিলুপ্ত করার চেষ্টা হয়নি। জাতিগত স্বার্থের নামে প্রতিবেশী দেশের মানুষদের প্রতি উগ্র বিদ্বেষ অথবা ঈর্ষার মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টাও এদেশের ইতিহাসে বিশেষ চোখে পড়ে না। কবির মতে ভারতের বৈশিষ্ট্য হোল, এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা দলের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।[২] কিন্তু আজ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষ তার সেই সহনশীলতার ঐতিহ্য ত্যাগ করে আত্মঘাতী জাতিবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।[৩] অথচ আজকের দিনে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ পরস্পরের এত শারীর নৈকট্যে এসেছে, তখন জাতিপ্রেমকে প্রবল করার অর্থ এসব সমাজের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী করে তোলা। এযুগের একান্ত প্রয়োজন এমন এক জীবন-আদর্শ যা একদিকে ব্যক্তির বিকাশ এবং অন্যদিকে সর্বমানবীয় ঐক্যের সাধনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যা জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে খেপিয়ে না তুলে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সহযো-গিতার বন্ধন গড়ে তুলতে উদ্যোগী। নবযুগের এই বিশ্বমানবীয় জীবনদর্শনের বিবর্তনে ভারতবর্ষ হয়ত একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, যদি না ভারতীয় মন তার পূর্বেই জাতিবাদের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী কি পশ্চিমে, কি পুবে শিক্ষিত-সাধারণের কাছে সম্বর্ধনা লাভ করে নি। ১৯১৬ সালে জাপানে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে কবি যে সব বক্তৃতা দেন তারই কয়েকটিকে মার্জিত এবং একত্রিত করে "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" বইটি প্রকাশ করা হয়। সাম্রাজ্যলিপ্সু জাপানে এবং যুদ্ধোন্মত্ত মার্কিনে এইসব ভাষণ ব্যাপক বিরূপতার উদ্রেক করে। অনেক

শিক্ষিত ভারতীয়ও তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি, এ ইঙ্গিত পর্যন্ত করা হয় যে নোবেল প্রাইজ এবং নাইট উপাধি লাভের ফলেই রবীন্দ্রনাথ জাতিবাদবিরোধী হয়ে উঠেছেন। কবি আশা করেছিলেন, মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মানুষকে নেশনতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করবে, বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের আঘাতে মানুষের চৈতন্যোদ্রেক ঘটবে। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় পাগল মানুষ কবির ডাকে সাড়া দেয় নি। দিলে হয়ত বিশের দশকে ইয়োরোপে ফাসিজ্‌ম্‌-এর উদ্ভব হোত না ; শক্তিশালী জাপান দুর্বল চীনকে আক্রমণ করত না ; প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ বছর কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত না। আর আজো তাই পশ্চিমী "নেশন-তন্ত্রের" প্রতিক্রিয়ায় এশিয়া এবং আফ্রিকার অত্যাচারিত জনসাধারণ উগ্রতর জাতিবাদের সর্বনাশা পথ অনুসরণ করে চলেছে।

কিন্তু শিক্ষিতসাধারণ কবির সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করলেও জাতিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর এই দ্বিধাহীন ঘোষণা পশ্চিমের কোনো কোনো মনীষীর মনে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। এঁদের মধ্যে একজনের নাম রুডল্‌ফ্‌ রকার। অবশ্য রকার রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে জাতিবাদের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেন নি ; রাসেল এবং রলাঁ-র মত তিনিও আগে থেকেই বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। তবে রবীন্দ্রনাথের "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌" বইটি তিনি যত্নসহকারে পড়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে উভয়ের মনে যে কত গভীর মিল ছিল রকারের মহাগ্রন্থ "জাতিবাদ ও সংস্কৃতি" পাঠ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৪]

॥ দুই ॥

রকারের নাম সম্ভবত বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত ঠেকবে না ; সুতরাং তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পরিচয় করানোর আগে মানুষটি সম্বন্ধে সামান্য দু' একটা কথা বলা দরকার। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে রুডল্‌ফ্‌ রকার এ-শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। ১৮৭৩ সালের ২৫শে মার্চ জার্মানীব মাইনৎজ শহরে এঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা গানের স্বরলিপি ছেপে রুজিরোজগার করতেন। রকার ছ' বছর বয়সে মা এবং বাবা দুজনকেই হারান ; তাঁর কৈশোর একটি ক্যাথলিক অরফ্যানেজে কাটে। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি একজন বড় দপ্তরীর কারখানায় শিক্ষানবিশ-কর্মী হিশেবে নিযুক্ত হন। প্রাচীন জার্মান প্রথা-অনুসারে তিনি শিক্ষা-নবিশীর সময়ে পায়ে হেঁটে জার্মানীর নানা অঞ্চল এবং ইয়োরোপের নানা দেশ

ঘুরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফলে তিনি শুধু অনেকগুলো ভাষাই শেখেন নি, তার দৃষ্টিভঙ্গীও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। তাঁর মামা রুডল্ফ্ নয়মান সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; জার্মান সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। এঁরই প্রভাবের ফলে রকার জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে যোগদান করেন। সেটা বিসমার্কের আমল; জার্মানীতে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন তখন বেআইনী এবং ফলে গুপ্তভাবে পরিচালিত। বৈপ্লবিক কাজকর্মের অভিযোগে ১৮৯৩ সালে রকারকে জার্মানী থেকে নির্বাসিত করা হয়। এর পরের দু'বছর তিনি পারী-তে রেফিউজি হিশেবে বাস করেন। তাঁর সঙ্গে পিটার ক্রোপট্‌কিন, এলিজে রেক্ল, এরিকো মালাতেস্তা প্রমুখ নৈরাজ্যবাদী মনীষীদের পরিচয় হয়।[৫] ক্রমে তিনি মার্ক্‌স্ এবং লাসালের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ত্যাগ করে রাষ্ট্রহীন শ্রমিক-সংগঠনতন্ত্রে (অর্থাৎ অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম্‌-এ) বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।[৬] এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন:

"সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বৈপ্লবিক গুপ্ত ক্রিয়া-কলাপ প্রথম যৌবনে আমার রোম্যাণ্টিক কল্পনায় গভীরভাবে আবেদন করেছিল। স্বাধীন চিন্তা এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয়কে শক্তির সাহায্যে দমন করার বিরুদ্ধে প্রবল বিতৃষ্ণার মনোভাবও তারি ফলে অতি অল্প বয়সে আমার মনে সঞ্চারিত হয়।...পরে আবার এই কারণেই আমি জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বেশীদিন থাকতে পারি নি। সমাজতন্ত্রীদের সঙ্কীর্ণ মতবাদগত গোঁড়ামি এবং কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যের প্রতিও উগ্র অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে আমি শীঘ্রই বুঝতে পারি যে এ আন্দোলনে আমার স্থান নেই।

"সমাজতন্ত্রের আদর্শ সম্বন্ধে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু জার্মান সমাজ-তন্ত্রীরা দাবী করত যে প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যার সমাধান তাদের জানা; এবং তাদের এই দাবী আমি মেনে নিতে পারি নি। জমি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং সামাজিক সম্পদে মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত ঠেকেছে কিন্তু একথাও আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধীন উদ্যোগ ছাড়া সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য; সে-সমাজতন্ত্রে কাল্পনিক গোষ্ঠীস্বার্থের কাছে সমস্ত ব্যক্তিমানুষের বলি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে আঠারো এবং উনিশ শতকের যে উদারতন্ত্রী চিন্তা-ধারা একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং অন্যদিকে সমাজজীবনের ওপরে রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতার বিলোপ সাধনে ব্রতী ছিল, তারি সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র নতুন এক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে স্বাধীন সহযোগিতাজাত ঐক্যের ওপরে এই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। আমি তাই শক্তিবাদী সমাজতন্ত্রের সন্ধানে গড্‌উইন, বাকুনিন, ক্রোপট্‌কিন প্রমুখ মনীষীর লেখা পড়তে শুরু করি।"[৭]

পারী থেকে রকার আসেন লণ্ডনে। এখানে দপ্তরীর কাজ করে জীবিকা-নির্বাহের সূত্রে ইস্ট এণ্ড-এর ইহুদী মজুরদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। নিজে ইহুদী না হয়েও তিনি তাদের ভাষা ভাল করে শিখে ফেলেন এবং ১৮৯৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ইহুদী শ্রমিকদের একটি সাপ্তাহিক এবং একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে কাজ করেন। ১৯১২ সালে লণ্ডনে ইহুদী দরজীদের দীর্ঘদিনব্যাপী ধর্মঘটের তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার তাঁকে অন্তরীণ করে; তাঁর এই সময়কার অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি "কাঁটাতার আর শিকের বেড়ার পিছনে" নামে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে লিখে গেছেন।[৮]

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রকার জার্মানীতে ফিরে যান এবং সেখানে সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উদ্যোগে "জার্মানীর স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে ইণ্টার-ন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেন্‌স অ্যাসোসিয়েশন-এর পুনর্গঠনেও তিনি একটা বড় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু হিটলার ক্ষমতায় আসার পর আরো অনেক মুক্তিতান্ত্রিক মনীষী এবং বিপ্লবী কর্মীর মত তাঁকেও জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, কাগজপত্র এবং যা-কিছু সঞ্চয় সবই নাট্‌শীরা পুড়িয়ে দেয়। তিনি সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলেন শুধু তাঁর "জাতিবাদ এবং সংস্কৃতি" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি। অতঃপর তিনি মার্কিন দেশে এসে আশ্রয় নেন এবং জীবনের শেষ কয়েক বছর মুখ্যত গ্রন্থরচনা নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান বই লিখেছেন এবং সেগুলি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ট্র্যাজিক মানস-ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর তিন খণ্ডে রচিত আত্মজীবনী একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

১৯৫৮ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর ছিয়াশী বছর বয়সে রুডল্‌ফ্‌ রকারের মৃত্যু হয়।

॥ তিন ॥

"জাতিবাদ এবং সংস্কৃতি" গ্রন্থে রকারের মূল প্রতিপাদ্য হোল যে এই দুই আদর্শ পরস্পরের আমূলবিরোধী। মানুষ পৃথিবীর জটিলতম জীব। একদিকে যেমন প্রতি মানুষই অনন্য, অন্যদিকে তেমনি প্রতি মানুষের মধ্যে বিচিত্র সম্ভাবনা বর্তমান। এই সম্ভাবনাসমৃদ্ধ অনন্যতা মানুষের সৃজনধর্মে প্রকাশ পায়। মানুষই প্রকৃতিতে একমাত্র প্রাণী যে অন্ধ বশ্যতায় প্রকৃতির নির্দেশ না মেনে নিয়ে নিজের ভাগ্য নিজের ইচ্ছামত গড়ে তুলতে উদ্যোগী। এটা যে সম্ভবপর তার কারণ বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনা-পরম্পরা নিয়মনিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবী বলে কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয় ; কিন্তু মানুষের নিয়মকানুন তার নিজেরি সৃষ্টি, ফলে তার পরিবর্তন সম্ভব। খিদে মানুষের পাবেই, কিন্তু মানুষ কী খাদ্য খাবে, অথবা সে খাদ্য সে কীভাবে খাবে, এটা মানুষের রুচি এবং সামর্থ্যের ওপরে নির্ভর করে। মানুষের ইতিহাসেও ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণ-সম্পর্ক বর্তমান, কিন্তু সেই কার্যকারণের মধ্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির একটা বড় অংশ আছে। মানুষ তাই অন্য জীবের মত যুগ যুগ ধরে একইভাবে পরিবেশের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজের প্রয়োজনমত পরিবেশের বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়ে ইতিহাসে নিজের সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে।

মানুষের এই সৃজনধর্মের ফল সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মূলে আছে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত নিজের জীবন নিজেরি উদ্ভাবিত আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এই চেষ্টার সার্থকায়নের জন্য একদিকে প্রয়োজন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অপরদিকে চাই স্বেচ্ছাকৃত সম্পর্কের ভিত্তিতে সমবায়ী সমাজ। স্বাধীনতা এবং সমবায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। চিন্তার, প্রত্যয়ের, প্রকাশের এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতার ফলে ব্যক্তি নিত্য নূতন রূপ আবিষ্কার করে এবং তার সেই উদ্ভাবন অন্য মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। আবার পরস্পরের সঙ্গে সহযোগের ফলে প্রতি মানুষ অপর মানুষদের মানসিক সম্পদের অংসভাক্ হয়ে নিজেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাছাড়া এরি ফলে মানুষের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবেশকে বদলানোর সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। মানুষের সহযোগ যতই স্থানীয় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বমানবিক সমবায়ের দিকে প্রসারিত হয় ততই মানুষের সংস্কৃতিপরায়ণ রূপটি বিকশিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বর্ধন তখনি সম্ভবপর যখন মানুষের জীবন বাইরের চাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে তার স্বাধীন ইচ্ছার তাগিদে বিকশিত হয়ে ওঠে। তার জন্য চাই এমন সমাজ যেখানে

কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, দল অথবা প্রতিষ্ঠান নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে অপরাপর মানুষদের ভাগ্য নিজের কব্জায় আনেনি। ফলত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সঙ্গে সর্বমানবীয় ঐক্যের মিলনসাধন সংস্কৃতির স্বধর্ম।

জাতিবাদের প্রয়াস ঠিক এরি বিপরীত। জাতিবাদ ব্যক্তির স্বকীয়তাকে বিলুপ্ত করে কাল্পনিক যূথসত্তাকেই মনুষ্যত্বের প্রধান নির্ভররূপে উপস্থিত করে। কিন্তু জাতিবাদীর কল্পনায় ছাড়া যূথসত্তার অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, ফলে তার না আছে চেতনা, না সৃজন-সামর্থ্য। জাতিবাদ ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর কাছে বলি দিয়ে এক গোষ্ঠীকে আরেক গোষ্ঠীর শত্রু হিশেবে কল্পনা করে।[১] প্রত্যেক স্বজাতিপ্রেমিকের বিশ্বাস যে তার নিজের জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং অন্য সব নিকৃষ্ট জাতিকে তার নিজের জাতির ক্ষমতাধীন করাই ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। এদিক থেকে ওল্ড টেস্টামেণ্টের ইহুদী আর হিটলারী জার্মানীর নাট্‌শীর মধ্যে প্রত্যয়গত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ জাতিবাদ একদিকে ব্যক্তির বিনাশ ঘটিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীলতার মূলে আঘাত করে, অন্যদিকে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সংঘাত সৃষ্টি করে সর্বমানবীয় ঐক্য অসম্ভব করে তোলে। জাতিবাদ তাই সংস্কৃতির শত্রু, জাতিবাদী সংস্কৃতি স্ববিরোধী কল্পনা।

জাতিবাদের এই দুই বৈশিষ্ট্য থেকে তার তৃতীয় এবং সম্ভবত সবচাইতে মারাত্মক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। জাতিবাদী যে ধরনের সর্বগ্রাসী যূথবৃত্তিক-ঐক্যের সাধক, কোনো সমাজেই তা থাকা সম্ভব নয়। ব্যক্তির অনন্যতার কথা বাদ দিলেও প্রতি সমাজেই নানারকম পার্থক্য বর্তমান। জাতিবাদ-এইসব পার্থক্য জবরদস্তি করে মুছে দিতে চায়। কিন্তু তা করতে গেলে চাই শক্তির কেন্দ্রীকরণ। ফলে জাতিবাদ একান্তভাবেই ক্ষমতানির্ভর। রকার প্রাচীন এবং আধুনিক নানা সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে বিস্তর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে জাতিবাদ আসলে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভীর কল্পিত আদর্শ। জাতীয় স্বার্থের নামে মুষ্টিমেয় লোক সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের দখলে এনে সেই শক্তির প্রয়োগের দ্বারা একদিকে সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্য ধ্বংস করে, অন্যদিকে প্রতিবেশী সমাজকে জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। জাতিবাদী সাধনার প্রধান যন্ত্র রাষ্ট্র। জাতিবাদ একই সঙ্গে রাষ্ট্রবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী।

জাতিবাদের প্রথম কাজ হোল সমাজে যে সব ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত তাদের বিলোপ সাধন করা। তারপর সমাজে যে সব আত্মনির্ভর সমবায়ী

প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলির উচ্ছেদ ঘটানো। এই দুই বাধা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জাতিবাদ সাধারণ মানুষের মনে প্রাক্-সাংস্কৃতিক কালের পাশব বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অভ্যাসাশ্রয়িতা, ক্ষমতাবানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ভয়, বিদ্বেষ, হিংস্রতা—এসবের পোষণ এবং বর্ধন ছাড়া জাতিবাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সাধারণ মানুষদের মনে এইসব বৃত্তির প্রাবল্য ঘটিয়ে জাতিবাদ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এবং রাষ্ট্রের নির্দেশের ওপরে নির্ভরশীল করে তোলে। তখন জাতিবাদের দ্বারা অভিভূত এই ব্যক্তিরা স্বাধীন চিন্তা এবং সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; বিদেশীকে সন্দেহের চোখে দেখতে শেখে, এবং জাতীয় স্বার্থের নামে পরদেশ-লুণ্ঠনের মধ্যে কোনো অন্যায় দেখতে পায় না। জাতিবাদের অন্যতম আদি প্রবক্তা মেকিয়াভেলীর ভাষায়, "পিতৃভূমির কল্যাণ যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ন্যায়-অন্যায়, করুণা-নিষ্ঠুরতা, প্রশংসা-সমালোচনা এসবই আমাদের অগ্রাহ্য করতে হবে। জাতির স্বার্থরক্ষায় এমন কোনো কাজ নেই যা করতে আমরা সঙ্কুচিত হব।"[১০]

জাতিবাদের প্রতিষ্ঠার অর্থ যে সংস্কৃতির উচ্ছেদ, বিবিধ উদাহরণ দিয়ে রকার তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এবং বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে এ সত্যের সবচাইতে প্রামাণ্য উদাহরণ তাঁর নিজের দেশ জার্মানীতে নাট্‌শী একনায়কত্বের ক্রিয়াকলাপ। জাতিবাদের আওতায় হিট্‌লারী জার্মানী মানুষের ভাবনা-চিন্তা, আচার-ব্যবহারকে রাষ্ট্রনির্দিষ্ট একটিমাত্র ছকের মধ্যে পুরতে চেয়েছিল। তার ফলে সেখানে শিল্পসাহিত্যের বিনাশ ঘটে, সমাজজীবন থেকে নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়, দেশের অধিকাংশ সম্পদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়, যুবসম্প্রদায়ের মন বিদ্বেষ এবং উগ্র অসহিষ্ণুতার বিষে বিষিয়ে ওঠে; এবং পরিশেষে সমগ্র মানব-সমাজকে বিশ্বব্যাপী হত্যার মধ্য দিয়ে এই নির্বুদ্ধিতার দাম দিতে হয়। কিন্তু হিট্‌লারী জার্মানী কেন, সমকালীন এবং অতীত ইতিহাসেও এর বিস্তর উদাহরণ চোখে পড়ে। যেকালে প্রাচীন গ্রীসে কোনো রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তখনি কিন্তু সেদেশে এক অসামান্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল। রোম রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ করে ঐক্য রচনা করতে গিয়েছিল, রোমক সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক দৈন্য ভুবনবিদিত। রেনেসাঁসের চমকপ্রদ স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল চৌদ্দ এবং পনের শতকের বহুবিভক্ত ইতালিতে,

মুসোলিনীর জাতীয় রাষ্ট্রের আমলে নয়। জার্মান সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম যুগ কি "রাইখ" প্রতিষ্ঠার আগে, না পরে? ক্লপস্টক্ থেকে গোয়েটের সাহিত্য, কাণ্ট থেকে ফয়েরবাখের দর্শন, বাখ্, মোৎসার্ট, বেঠোফেন, হ্বাগ্‌নারের সঙ্গীত— এসবই আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা।

॥ চার ॥

প্রশ্ন ওঠে, জাতিবাদ যদি এমনই আত্মঘাতী আদর্শ হয়, তবে তার উদ্ভব কি করে ঘটল, কীভাবেই বা তা এত ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? রকারের মতে মানুষের ইতিহাসে আগাগোড়াই দুটো বিরোধী প্রবণতার সংগ্রাম দেখা যায়: সম্পদের উৎপাদন বনাম ক্ষমতার পূজা, মুক্তির স্পৃহা বনাম শক্তির লালসা, সমবায়ী চেতনা বনাম যূথবৃত্তি, সংস্কৃতি বনাম রাজনীতি ও ধর্ম। উভয়েরই উৎস মানুষের চরিত্রে, অথবা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষের টিকে থাকার চেষ্টার মধ্যে। আদিম যুগের যাযাবর মানুষ অজ্ঞতা এবং অসহায়তার ফলে প্রকৃতির মধ্যে ভূত-প্রেত, দেব-দেবী কল্পনা করেছিল। তাদের তারা ভয় করত, মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বশে আনারও কম চেষ্টা করেনি। নিজের্ চাইতে শক্তিমান কোনো অস্তিত্বের কল্পনা করে তার সাহায্যে নিজেকে ক্ষমতাবান করার মনোবৃত্তি এইভাবেই গড়ে ওঠে। এই মনোভাব থেকেই পরবর্তীকালে ধর্মের উদ্ভব। কিছু লোক এ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ঐ রহস্যময় শক্তির প্রতিনিধি হিশেবে উপস্থিত করে, এবং নানা বুজরুকির সাহায্যে জনসাধারণকে সে কথা বিশ্বাস করায়। এরাই হোল প্রাচীন যুগের পুরোহিত-সম্প্রদায়। এই একই মনোভাব থেকে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব। এক সময়ে ধর্ম ছিল রাষ্ট্রশক্তির প্রধান সমর্থক: সব রাজাই নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন। পরে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ধর্মের প্রভাব যখন কমে আসে তখন তারি সুযোগে রাষ্ট্রশক্তি নিজেকে একচ্ছত্র করে তোলে। সার্বভৌম হওয়ার প্রবণতা ক্ষমতার স্বধর্ম। সমাজের যে মুষ্টিমেয় অংশ এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়, তারা তখন তাদের প্রয়োজনের উপযোগী নতুন ধর্ম গড়ে তোলে। জাতিবাদ হোল এই নতুন রাজনৈতিক ধর্ম। যে কারণে অতীতে মানুষ ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই একই কারণে আধুনিক কালের মানুষ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতিবাদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সে কারণ হোল তাদের অজ্ঞতা এবং অসহায়তাবোধ। অতীতে

পুরোহিতগোষ্ঠী যেভাবে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং অসহায়তার সুযোগে শক্তিমান হয়ে উঠেছিল, এযুগে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ও তেমনি সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং অসহায়তার সুযোগে নেশনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে রকার যেহেতু ইতিহাসের কোনো অবশ্যম্ভাবী ধারাকে স্বীকার করেন নি, সেহেতু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মানুষ যদি স্বাধীন সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে তাদের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টার ফলে জাতিবাদের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসবে। এবং সেক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিচিত্র সমবায়ী সমাজ-সংগঠনের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি বিশ্বনাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব তাঁর কাছে মোটেই অসম্ভব বলে ঠেকেনি।

॥ পাঁচ ॥

আগেই বলেছি রকার এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আপন আপন দেশবাসীর ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেন নি। রকারকে তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে। যে-জার্মানীতে বিশ্বনাগরিকতার বাণী আধুনিক ইতিহাসে মহাকবি গোয়েটের কণ্ঠে প্রথম সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, সেদেশে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বনাগরিক মনীষী জন্মগ্রহণ করেও বাস করার অধিকার পান নি। জার্মানী জাতিবাদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নাৎশী নেতৃত্বে সামষ্টিক অপঘাতের পথ বেছে নিয়েছিল। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করেছিলেন একথা স্বীকার্য। কিন্তু মৃত্যুর আগেকার প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি আমাদের যে বিশ্বমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে? "গোরা", "ঘরে বাইরে", অথবা "চার অধ্যায়"-এর উপলব্ধিতে যদি আমরা অংশভাক্ হতে পারতাম তাহলে এদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় কি কখনো সুভাষচন্দ্রের মত উগ্র স্বজাত্যবাদীকে "নেতাজী" বলে সমস্বরে নামসঙ্কীর্তন করত? "কালান্তর" প্রবন্ধাবলীর সতর্কবাণী যদি আমাদের স্মরণে থাকতো তাহলে কি আমরা দেশ স্বাধীন হবার পর ইংরেজি শিক্ষার উচ্ছেদে এত উদ্যোগী হতে পারতাম, অথবা হিন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্য রচনার নির্বোধ কল্পনা করতাম? সঙ্কীর্ণ, অসহিষ্ণু গোষ্ঠীবাদ আজও আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনকে প্রায়

সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ব্যক্তিগত বিবেক এবং সর্বমানবীয় কল্যাণকে জাতিগত স্বার্থের চাইতে ওপরে স্থান দেবার মত মনস্বিতা এদেশে কোথায়-বা আজ চোখে পড়ে ? ভারতবর্ষ একদিন বৌদ্ধ চিন্তার লোপসাধন করে নাস্তিক নির্বাণপন্থী বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর চিন্তাকে নির্বাসনে পাঠানোর মধ্যে কি সেই অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখছি না ?

প্রাচীনযুগে সর্বমানবীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা ছিল বহিঃপ্রকৃতি এবং মানুষের প্রায়োগিক অক্ষমতা। তখন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকচলাচলের সুবিধা ছিল না ; মানুষ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যূথবদ্ধভাবে সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে বাস করত; প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতার ফলে প্রতি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে শত্রু ভাবত। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত সুগম হয়েছে ; বিশেষ করে যন্ত্র-বিপ্লবের পর গত দেড়শ' বছরে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান আজ প্রায় অনেকটাই অপসৃত। তাছাড়া বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতির বিচিত্র গুপ্ত সম্পদ আবিষ্কার করেনি, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিত্য নূতন সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতাও এনে দিয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে মুক্ত এবং সার্বলৌকিক সমাজের আদর্শ অতীতে অল্প কয়েকজন অসামান্য মনীষীর কল্পনায় আভাসিত হয়েছিল, আজ তার বাস্তবীকরণের পথে বাহ্য বাধা দুস্তর নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের অন্তঃকরণে শুভনাস্তিক্য এবং সঙ্কোচের দৃঢ়মূল প্রাকারশ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এই দেওয়ালের সারি না ভাঙতে পারলে যাতায়াতের ক্রমবর্ধমান সুযোগসুবিধা মানুষের মনে বসুধার সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ না জাগিয়ে বরং জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের ভাবকেই প্রবল করে তুলবে, ব্যক্তিকে সর্বমানবীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ না করে তাকে আরো গোষ্ঠীনির্ভর করবে। যন্ত্র শুধু বহিঃপ্রকৃতির বাধা দূর করতে পারে, অন্তরের বাধা দূর করতে পাবে শিক্ষা। এবং সেই প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা যার দ্বারা ব্যক্তি একই সঙ্গে স্বপ্রতিষ্ঠ হয় এবং সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপনের সামর্থ্য অর্জন করে। মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় তাই শিক্ষা, এবং এই বিকাশের অমূল্য ফল সংস্কৃতি।

তোতা কাহিনী

"তোতা কাহিনী"র বেয়াদব পাখিটা শেষ পর্যন্ত মরে পণ্ডিতদের হাত থেকে বেঁচেছিল। সোনার খাঁচা, মৃদঙ্গ-জগঝম্প সহযোগে প্রচণ্ড মন্ত্রপাঠ, দানাপানি বন্ধ করে রাশি রাশি পুঁথি থেকে পাতার গাদা কলমের ডগা দিয়ে গেলানো—এত সব রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা সত্ত্বেও পাখিটা শেষ পর্যন্ত মানুষ হোল না। সারা পাখিজাতটার গায়ে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক দিয়ে একদিন বিনা নোটিশে মরে গেল।

এখন থেকে ষাট বছরেরও আগে রবীন্দ্রনাথ "সবুজপত্রে" এই আশ্চর্য গল্পটি লিখেছিলেন। তারপর গঙ্গায় অনেক জল বয়েছে; কিন্তু পাখিদের নসিব বদলায় নি। বরং আদমশুমারের হিশেব নিলে দেখা যায় পণ্ডিতদেব দৌরাত্ম্যে পক্ষিমৃত্যুর হার এই ষাট বছরে কমা দূরে থাক, হুহু করে বেড়ে চলেছে।

কেননা শিক্ষার যা প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং মূল অনুপ্রেরণা তার সঙ্গে এদেশে সাধারণ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার যোগ আগেও খুব সবল ছিল না এবং সম্প্রতি ক্রমেই সে-যোগ ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আমাদের বিদ্যাভ্যাসের শুরু মুখস্থে এবং তার সমাপ্তি ডিগ্রী-লাভে। জন্মসূত্রে যেটুকু প্রশ্নশীলতা এবং আত্মপ্রকাশের আকুতি নিয়ে শিশু পৃথিবীতে আসে তার পোষণ এবং বর্ধন শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আগাগোড়া চেষ্টা চলেছে যাতে ছাত্রের মনে কোনো জিজ্ঞাসা রূপ পাবার আগেই উত্তর-মুখস্থের প্রচণ্ড চাপে তা নিরাপদ পূর্ণচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। এদেশের সাধারণ শিক্ষকসম্প্রদায় ছাত্রের স্বকীয়তাকে ঘোরতর সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। তার ব্যক্তিসত্তাকে ঠেসেঠুসে গড়পড়তার ছাঁচে ফেলে দিতে পারলে তখনই তাঁরা

নিশ্চিন্ত। এ অবস্থায় যা হতে পারে তাই হোচ্ছে। নিজের পাড়ার মানচিত্র সম্বন্ধে যে ছেলের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, পরীক্ষা পাশের গুঁতোয় সে মুখস্থ করে চলেছে দেশবিদেশের রাজধানী-বন্দরের নাম। নিজের তিনপুরুষের হিশেব পর্যন্ত যে জানে না, তাকে গেলান হচ্ছে মুঘল-সম্রাটদের বংশতালিকা। প্রথম দক্ষিণের হাওয়ায় মাদারের আগুনরঙা ফুল যার কখনও চোখে পড়েনি, অচেনা গাছের অবোধ্য লাতিন নাম কণ্ঠস্থ করে সে বনছে বোটানিস্ট। যার নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন প্রকাশসামর্থ্যের অভাবে নিজেরি অজ্ঞাতে শুকিয়ে গেল, সে রাত জেগে পড়ে চলেছে শেক্‌সপীয়র-রবীন্দ্রনাথের ওপরে গাদাগাদা নিরুদ্দেশ্য টীকাভাষ্য। এবং জীবনের কোনো একটা সামান্যতম সমস্যা নিয়ে স্বাধীন, সংলগ্ন এবং পরিচ্ছন্নভাবে ভাবার অভ্যাসটুকু পর্যন্ত যার হয় নি, দর্শনের পরীক্ষা পাশের প্রয়োজনে সে-বেচারী অতি-সরল সংক্ষিপ্তসারের খোঁজে গলদ্‌ঘর্ম। কাগজ খুললেই দেখা যায় যে বছর বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে; কিন্তু শিক্ষার প্রসারের ফলে দেশে জ্ঞানপিপাসু, প্রকাশক্ষম, আত্মপ্রত্যয়ী, বিবেকবান অথবা রুচিশীল তরুণতরুণীর সংখ্যা বাড়ছে, এমন দাবি বোধ হয় অতিবড় আশাবাদীও করবেন না।

॥ দুই ॥

দেশ যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন শিক্ষার এই ব্যর্থতার জন্য বিদেশী শাসনকে দায়ী করা চলত। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এদেশের ভালমন্দের দায়িত্ব পুরোপুরি এদেশের মানুষদের। সে দায়িত্ব কি করে পালিত হবে, যদি তাঁরা স্বাধীনভাবে ভাবতে না শেখেন, যদি না নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার আত্মপ্রত্যয় তাঁদের মনে সঞ্চারিত হয়। যেদেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, এবং যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের শিক্ষাও প্রায়ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যায় পর্যবসিত, সেখানে শুধু কি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের জোরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব? নাকি অন্য অনেক সদ্য-স্বাধীন দেশের ব্যাপার-স্যাপার দেখে এ আশঙ্কাই মনে জাগা স্বাভাবিক যে আমাদের দেশেও গণতন্ত্রের নামে নেতা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী?

আশঙ্কা হয়ত স্বাভাবিক, এবং বর্তমান দশকে এই আশঙ্কা যে সাময়িকভাবে হলেও অত্যন্ত ভয়াবহ বাস্তব রূপ নিয়েছিল তা আমরা জানি। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যম্ভাবী বলে নিশ্চয়ই

আমরা মেনে নিতে পারি না। আর তা যদি না পারি তা হলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে স্বাধীন ভারতবর্ষে অন্য যে-কাজই অপেক্ষা করতে পারুক শিক্ষা-সংস্কার অপেক্ষা করতে পারে না। কোনো দেশ কী ভাবে গড়ে উঠবে সেটা প্রধানত নির্ভর করে সে দেশের সাধারণ মানুষের মন কী ভাবে গড়ে উঠছে তার ওপরে। যে-উপায়ে মানুষের মত গড়ে ওঠে তারই নাম শিক্ষা। মানসিক পুষ্টির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোনো সুস্থ, স্বাধীন, বিকাশশীল সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব।

এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক এবং গভীর পরিবর্তন-সাধন অত্যন্ত জরুরী, এ কথাটা বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অনেকেই অনুভব করছেন। এই প্রয়োজনবোধ সম্প্রতি আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। তার কারণ, এই গণতন্ত্রের যুগে শিক্ষা যে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের লোক অথবা বিত্তবানেব মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, এটা কেউই চান না। যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব শিক্ষার সুযোগ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু যে-শিক্ষা শিক্ষিতকে পঙ্গু করে রাখে, তাকেই সম্প্রসারিত করলে সর্বসাধারণের কোন্ কল্যাণ সাধিত হবে? শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে গিয়ে তাই প্রথমেই প্রশ্ন উঠেছে মানুষের বহুমুখী বিকাশের পক্ষে কোন্ ধরনের শিক্ষাবাবস্থা সব চাইতে উপযোগী? বর্তমানে প্রচলিত ব্যর্থ শিক্ষার বৃহত্তর অনুকরণ যদি আমাদের কাম্য না হয়, তা হলে শিক্ষার সংস্কার কোন্ পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা নির্ধারিত হবে?

কিন্তু এপ্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অথবা এ-বিষয়ে ছোট ছোট পরিধির মধ্যে পরীক্ষামূলক চেষ্টা হবার আগেই আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতারা এ বিষয়ে একটির পর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে এসব সিদ্ধান্ত সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ইংরেজি প্রবাদটাও বোধ হয় স্মরণে রাখা ভাল যে নরকের পথ অনেক সময় সদিচ্ছার মালমসলা দিয়েই তৈরী করা হয়ে থাকে। এঁদের শিক্ষা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষাসংস্কারের যে পরিপ্রেক্ষিত ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার চেহারাটা মোটেই ভরসাদায়ক নয়।

॥ তিন ॥

প্রথমেই যেটি চোখে পড়ছে সেটি হোল, শিক্ষার ক্ষেত্রে যেটুকু-বা বৈচিত্র্য অথবা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা এদেশে আজও বর্তমান, এঁরা তার বিলোপসাধন করে দেশব্যাপী একই ব্যবস্থা চালু করতে চান। এঁদের যুক্তি, দেশের সর্বত্র একই মান এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যবহারিক অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু যে-কথা এঁরা বেমালুম ভুলতে বসেছেন সেটা হোল এই যে শিক্ষা কোন একধরণের যন্ত্রশিল্প নয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য বিলোপের ফলে মানুষের মনকে ছাঁচে ঢালা সহজতর হবে ঠিকই; কিন্তু সে-মনের সৃজনধর্মী বিকাশের সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসবে। নানা রকমের পরীক্ষার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সম্ভাবনা উদ্ভাবন করবেন, এটাই হোল স্বাধীন সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার ন্যূনতম সর্ত। ছাত্রছাত্রীদের দেহমনের বিকাশ যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার জন্য শিক্ষককে ছাত্রের সামর্থ্য এবং প্রয়োজন, অবস্থা এবং পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হয়ে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে ঐক্য থাকলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা বিচিত্র উপায়-পদ্ধতির উদ্ভাবন স্বাভাবিক। এক ছাঁচের মধ্যে সব মানুষের মন ঢালতে যাওয়ার মানে শিক্ষাকে স্বধর্মচ্যুত করা।

সাম্প্রতিক শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার দ্বিতীয় প্রবণতাটি প্রথমটির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ঐক্য কে আনবে? না, রাষ্ট্র। কারণ রাষ্ট্রের যেমন একদিকে আছে আইন করার ক্ষমতা, অন্যদিকে তেমনি আছে অর্থব্যয়ের সামর্থ্য। বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক আদর্শের বিচারে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করার চাইতে মারাত্মক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এদেশে যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগ-উদ্যমের ঐতিহ্য অত্যন্ত দুর্বল. সে কারণে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ক্রমে ক্রমেই পরিকল্পিত প্রয়াসের নামে সমস্ত রকম সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। রাষ্ট্র যদি শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারের নামে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার আত্মসাৎ করে, তাহলে স্বাধীন চিন্তা এবং ব্যক্তিগত বিবেকের সম্ভাবনাও দেশ থেকে লোপ পাবে। অথচ ইতিমধ্যেই শিক্ষা-

সংস্কারের নামে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার এই মারাত্মক পথে আমাদের দেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রথম চালু হয়েছিল স্কুল-ব্যবস্থায়; ক্রমে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও রাষ্ট্রের আওতায় অনেকটা আনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা কি পড়বেন, কীভাবে এবং কতদিন পড়বেন, কারা তাঁদের পড়াবেন, এ সবই ধীরে ধীরে সরকারী দপ্তরের মর্জিমাফিক ঠিক হতে চলেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্যের বিলোপসাধন করে সারাদেশে একই ব্যবস্থা চালু করার অপচেষ্টা, এবং সংস্কার ও সাহায্যদানের অজুহাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন করার প্রয়াস—এ দুটি ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি বিপজ্জনক প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করি।

ইংরেজরা এদেশে লিবর্যাল শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। সেই শিক্ষার ফলে এদেশে নতুন করে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা সুরু হয়, সমাজসংস্কারের আন্দোলন গড়ে ওঠে, নানা ভারতীয় ভাষায় গদ্যসাহিত্য জন্মগ্রহণ করে, ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে চেতনার উদ্বোধন ঘটে। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার প্রধান ত্রুটি ছিল, সে শিক্ষার সুযোগ দেশের অধিকাংশ লোক পায়নি। ফলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানসিক ব্যবধান দেখা দেয়। কিন্তু এই ব্যবধান যে গর্বের নয়, বেদনা এবং লজ্জার বিষয়, একে দূর করা যে শিক্ষিতদের অবশ্যকর্তব্য, এ বোধও ঐ লিবর্যাল শিক্ষা থেকেই পাওয়া।[১] এই শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে উনিশ শতকের ভারতীয় লিবর্যাল বুদ্ধিজীবীরা একদিকে যেমন আত্মপ্রকাশে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নানা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এই শিক্ষা তাঁদের বুদ্ধিকে শাণিত, জিজ্ঞাসাবোধকে সক্রিয়, কল্পনাকে প্রসারিত এবং বিবেককে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল। যে-শিক্ষার ফলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল, বঙ্কিম, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটেছিল, তাকে নিষ্ফল বলা শুধু অন্ধ বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচায়ক। আশা করা গিয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর সারা দেশবাসীই ক্রমে লিবর্যাল শিক্ষার সুযোগ পাবে।

কিন্তু ধুয়ো উঠেছে লিবর্যাল শিক্ষায় নাকি শুধু কেরাণী ছাড়া আর কিছু

তৈরী হয় না। একথাটা আজ অনেকেই ভুলতে বসেছেন যে গত দেড়শ' বছরের ভারতীয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এমন ব্যক্তি খুবই দুর্লভ যিনি লিবর‍্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হন নি। এমন কি বঙ্গভঙ্গের যুগে যাঁরা পশ্চিমী শিক্ষার বিকল্পরূপে তথাকথিত "জাতীয় শিক্ষা"-র পরিকল্পনা করেন, তাঁরাও প্রায় প্রত্যেকে ছিলেন লিবর‍্যাল শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত। বিলেতফেরত বিপ্লবী ভাবুক অরবিন্দ ঘোষ এদিক থেকে মোটেই ব্যতিক্রম ছিলেন না।[২] অথচ সম্প্রতি দলনির্বিশেষে প্রায় সকলেই দাবি করছেন যে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, চারুকলা ইত্যাদির চর্চা কমিয়ে ঝোঁকটা কারিগরি বিদ্যার ওপরে দেওয়া হোক। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কারিগরি বিদ্যার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল স্কুল কলেজ নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে দরকার। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে চাষীদের উন্নত কৃষি-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সেই অজুহাতে লিবর‍্যাল শিক্ষাকে যদি অবহেলা করা হয়, তার চাইতে মারাত্মক ভুল আর কিছু হতে পারে না। কেননা, লিবর‍্যাল শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ অকল্পনীয়। শুধু কারিগরি শিক্ষার ওপরে ঝোঁক দিলে মানুষকে মৌমাছিতে পরিণত করা হবে। রাসেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা বহুপূর্বেই এবিষয়ে আমাদের বারবার সতর্ক করে গেছেন। মানুষের মন যদি না অনুশীলিত হয় তবে শুধু হাতের পটুতায় কোন্ সভ্যতা গড়ে উঠবে? যে-মন লিবর‍্যাল শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়নি, সে কারিগরিই শিখুক অথবা বিশেষজ্ঞই হোক, মনুষ্যত্বের সাধনা থেকে সে নির্বাসিত। সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে যে জন বঞ্চিত, কল-কব্জার ওপরে তার যত দখলই আসুক, হিশাব-নিকাশে সে যতই কেরামতি দেখাক, আসলে তাকে বর্বর ছাড়া আর কি বলা চলে?

মজা হোল, বিভিন্ন কারিগরিবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যার যথার্থ প্রতিষ্ঠান দেশে বিশেষ বাড়েনি। লিবর‍্যাল শিক্ষার ব্যর্থতার অজুহাতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে প্রচুর তথাকথিত "কমার্স" কলেজ; এখানকার শিক্ষার ফলে সত্যিই কেরাণী ছাড়া আর কিছু তৈরী হবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। অপর পক্ষে সারা দেশ জুড়ে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই দ্রুত অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি আজ প্রকট। বিদ্যালয়গুলি থেকে বিদ্যাচর্চার প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রমণ ঘটেছে; ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান এখন প্রায় অতীতস্মৃতি মাত্র। আমাদের তরুণতরুণীরা

যে মানস আবহাওয়ায় বাস করছেন তা আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিপন্থী; সেখানে নির্বেদ, অসূয়া, পারক্য এবং আপজাত্য মোটেই আপতিক নয়।

॥ চার ॥

তাহলে আমরা কী করব? এতবড় একটি জটিল এবং বহুবিস্তৃত সমস্যার কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে, তা আমি মনে করি না। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। ব্যাপারটা সরকারী শিক্ষাদপ্তর অথবা রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ছেড়ে দিলে কোনো সুরাহা হবে না। শিক্ষিত-সাধারণকে এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সেই বিশদতর আলোচনার অবতরণিকা হিশেবে দু' একটি কথা সংক্ষেপে নিবেদন করতে পারি।[৩]

প্রথমত, যথার্থ শিক্ষাসংস্কার শুধু তখনি সম্ভব, যখন শিক্ষক এবং অভিভাবকরা একত্রিতভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন। এ ভার রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিলে সংস্কারের উদ্দেশ্য অবশ্যই বিকৃত হবে। রাষ্ট্র এই উদ্যোগে অর্থ দিয়ে এবং প্রয়োজনমত বিধান করে কিছুটা সাহায্য করতে পারে; কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁরা উদ্যোগী না হলে শিক্ষার পরিচালনা আমলাদের হাতে আসতে বাধ্য। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এবং উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিতে হবে; কী শেখানো হবে, কীভাবে শেখানো হবে, কত ছাত্র নেওয়া হবে, শিক্ষকতার জন্য কী কী যোগ্যতা দরকার, তা সম্মিলিতভাবে শিক্ষকরাই ঠিক করবেন। তবে এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, যদিচ আমরা সকলেই চাই যে দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার সুযোগ লাভ করুক, তাহলেও প্রথমে আমাদের দেখতে হবে বর্তমানে শিক্ষার যেটুকু বন্দোবস্ত আছে তার যাতে উন্নয়ন ঘটে। দেশে উপযুক্ত-সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নেই, যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, অথচ রাতারাতি কতগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খাড়া করলে কারো কোনো উপকার হবে না। বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রথমেই দরকার ছাত্র এবং শিক্ষকের অনুপাতে পরিবর্তন আনা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি প্রতি কুড়িটি ছাত্রের জন্য অন্তত একজন উপযুক্ত শিক্ষক থাকেন, তবে সম্ভবত সেখানে শিক্ষাদান সম্ভব। এ হোল স্কুলের কথা; কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা আরো বেশী হওয়া

প্রয়োজন। অন্যদিকে দেখতে হবে যাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিজেদের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা থাকে। আজকাল বহু শিক্ষক টিউশনী করে এবং নোটবই লিখে সংসার চালান। যদিবা তাঁদের কারোকারোর মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা জীবিত থাকে, তাঁদের না আছে বই কেনার সামর্থ্য, না আছে বই পড়ার অবসর। অতএব স্কুল-কলেজে শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, শিক্ষকদের জন্যও উপযুক্ত গ্রন্থাগার চাই, তাঁদের পড়াশুনো করার ঘর চাই এবং সেজন্য যথেষ্ট অবসর চাই, এবং তাঁদের বেতন অন্তত এমন হারে নির্দিষ্ট হওয়া দরকার যাতে তাঁরা দিবারাত্র জীবিকার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য না হন। পরিবর্তে সমাজ এবং বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গত প্রত্যাশা থাকবে যে শিক্ষকরা তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য এবং সময় পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানবিস্তারের সাধনায় নিয়োজিত করবেন। বর্তমানে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু আছে তাঁদেরই যদি এটুকু সংস্কার করা সম্ভব না হয়, তাহলে নামকাবাস্তে নতুন কতগুলি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা কি নিজেদের চোখঠারা নয়? তারপর দেখতে হবে, অন্তত স্কুলের স্তরে যে ছেলেমেয়েরা পড়ছেন তাঁদের শিক্ষা যাতে অবৈতনিক হয়, এবং কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়তে যাবেন, তাঁদের জন্য যেন যথেষ্টসংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকে। বৃত্তির ব্যবস্থা থাকার ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতার ছাঁকুনিতে কিছুটা বাছাই করা সম্ভব হবে। যেহেতু যেকোনো সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় হোল জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রবর্ধনের প্রধান কেন্দ্র, সেকারণে বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথার্থ মনীষীদের আগমন ঘটে এবং শুধু যোগ্যতম ছাত্রছাত্রীরাই স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ এবং গবেষণার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা অধ্যাপক তাঁরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে আপন আপন বিভাগে ছাত্র গ্রহণ করবেন।

এই ন্যূনতম সংস্কারগুলি সাধিত হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বনিয়াদ কিছুটা মজবুত হয়ে উঠবে। তার ফলে শিক্ষার মান উঁচু হবে; যোগ্য ব্যক্তিরা শিক্ষকতার মধ্যে সার্থকতার সম্ভাবনা খুঁজে পাবেন; তাঁদের চেষ্টার ফলে দেশে প্রকৃত শিক্ষিত তরুণদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তখন দেশের অবহেলিত অঞ্চলগুলিতেও যথার্থ শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্ভবপর হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে আশা করা যেতে পারে যে উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশের সম্পদ অনেকটা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলে দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য

অবৈতনিক সাধারণ শিক্ষার বন্দোবস্ত ক্রমে সমাজের সাধ্যায়ত্ত হয়ে উঠবে। উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা এবং সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাড়ার ফলে ক্রমে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মান না নামিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তবে দুটি ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন আকারে অতিস্ফীত না হয়ে ওঠে। এবং উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেন নতুন প্রতিষ্ঠান চালু না হয়।

সন্দেহ নেই উপরোক্ত সংস্কারসাধন ব্যয়সাপেক্ষ। আপাতত এই ব্যয়ের একটা বড় অংশ অবশ্য রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। পররাষ্ট্রবিভাগ, সৈন্য-বিভাগ এবং পুলিশবিভাগের জন্য বর্তমানে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার কিছুটা শিক্ষার খাতে চালিত করলে এই ব্যয়ভার রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্র অর্থসাহায্য করবে বলে শিক্ষার পরিচালনা মোটেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে যেতে দেওয়া চলবে না। শিক্ষার পরিচালনাভার সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকদের ওপরেই ন্যস্ত থাকবে। ইতিমধ্যে নাগরিকদের সচেষ্ট হতে হবে যাতে সমাজসংগঠনে ক্ষমতার কেন্দ্রাভিগ ধারা আরো প্রবল না হয়ে ওঠে, যাতে ধীরে ধীরে বিকেন্দ্রিত সমাজসংগঠনের উদ্ভব ঘটে। কেননা বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হোল, রাষ্ট্রের হাতে সর্ববিধ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে একদিকে বিভিন্ন সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপনির্বাহের জন্য বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় উপস্থিতি, এবং অপরদিকে অসংখ্য ছোটছোট স্থানীয় জনসংগঠনের দ্বারা সমাজ শিক্ষার পরিচালনার ব্যবস্থা। এবং এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না, শিক্ষার ব্যয়ভারও ক্রমে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কাঁধ থেকে সরে স্থানীয় সংগঠনের দায়িত্ব হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, এবং এটিই বড় কথা, শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। শিক্ষার উদ্দেশ্য ডিগ্রীলাভ নয়, রোজগারের যোগ্যতা অর্জন করা নয়, সমাজের প্রতিটি নির্দেশে সায় দিতে শেখা নয়। শিক্ষা ব্যক্তিকে কৌতূহলী, যুক্তিপরায়ণ, অনুভূতিশীল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং প্রকাশক্ষম করে তোলে। এই উদ্দেশ্যের সার্থকীকরণ নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতা এবং শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্কের ওপরে, শিক্ষণ-পদ্ধতির ওপরে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর ওপরে। অন্বিষ্ট, বিদগ্ধ এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষকই

ছাত্রের নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে পারেন। শিক্ষক শুধু বক্তৃতা দেবেন আর ছাত্ররা নীরবে শুনে যাবে, এ ব্যবস্থায় ছাত্রের মনের স্ফুরণ সম্ভব নয়। ক্লাসে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা হওয়া দরকার, যে আলোচনার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা ভাবতে শিখবে, বিক্ষিপ্ত তথ্যের মধ্যে সূত্র আবিষ্কার করতে শিখবে, শিক্ষককেও নতুন করে পড়তে এবং ভাবতে বাধ্য করবে। ছাত্ররা যাতে নিজেদের পরিবেশ-বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, সেই পরিবেশ-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয়, সংগৃহীত তথ্যরাজিকে বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য অর্জন করে, শিক্ষককে তার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। ছাত্রদের পরিচিত করাতে হবে তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে। প্রথমে স্থানীয় সংস্কৃতি, তারপর দেশের সংস্কৃতি পরিশেষে বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের চিত্তের যোগসাধন ঘটাতে হবে। দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা. ইতিহাস, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান— সাধারণ শিক্ষার এই হোল মোটামুটি প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু এসব বিদ্যার চর্চাকে মুখস্থ করার চেষ্টায় পর্যবসিত করলে চলবে না। ছাত্রদের মনে এদের সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে তবেই এরা মানসিক পুষ্টির উপাদান হিশেবে সার্থক হয়ে উঠবে। তাছাড়া শিক্ষককে বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীদের অনুভূতি সূক্ষ্মতা অর্জন করে, তাদের কল্পনা স্ফুরণের সুযোগ পায়, তারা একদিকে নিজেদের স্বকীয়তাকে মূল্য দিতে এবং অন্যদিকে অপর সতীর্থদের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, যাতে তাদের চরিত্রে সাহস এবং সততা, উদ্ভাবনা এবং উদ্যোগশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবীয় সদ্‌বৃত্তি বিকশিত হয়ে ওঠে।

॥ পাঁচ ॥

কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদিচ এক, সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছবার পদ্ধতি বহু হতে পারে। শিক্ষাসংস্কার ব্যাপারে এটিই হোল আমার চতুর্থ বক্তব্য। শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষকদের পরীক্ষানিরীক্ষার স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। সমস্ত দেশ জুড়ে একই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে একটি সাধারণ পরীক্ষার মারফৎ ছাত্রদের গুণাগুণ নির্ণয় করাব মত নিরর্থ প্রচেষ্টা আর কিছু হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার ভিত্তিতে বৎসরান্তে লিখিত প্রশ্নোত্তর দেখে কোনো ছাত্রের আপেক্ষিক যোগ্যতা যাচাই করা একরকম অসম্ভব। মাঝখান থেকে এই ব্যবস্থার ফলে অধিকাংশ

ছাত্রছাত্রী বাঁধা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাত-সাফাইয়ে পটুতা অর্জন করে স্রেফ টুকেই ভালো নম্বর পেয়ে থাকেন। প্রথম ধরণের ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আশায় নিজের সহজ বুদ্ধিকে বলি দেন; দ্বিতীয় দলের ছেলেমেয়েরা বলি দেন নিজেদের সহজাত সততাকে। এ যুক্তি মেনে নেওয়ার পর অবশ্য দুটি প্রশ্ন ওঠে। প্রতিযোগিতামূলক বাৎসরিক সাধারণ পরীক্ষা ছাড়া ছাত্রদের যোগ্যতা কীভাবে স্থির করা হবে? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোনো তুলনামূলক মান কি তাহলে থাকবে না? প্রথমটি সম্পর্কে আমার ধারণা, শিক্ষক যদি ক্লাসে ছাত্রের শারীর উপস্থিতিকেই প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর দায়িত্বাধীন প্রতিটি ছাত্রের মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে একটি রোজনামচা রাখেন, তাহলে সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াই তিনি বৎসরের শেষে ছাত্রের যোগ্যতা বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট তৈরী করতে পারবেন। দ্বিতীয়টির উত্তর হোল শিক্ষকদের পারস্পরিক সহযোগিতা। প্রথমে স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রতি মাসে অথবা প্রতি তিন মাস অন্তর একত্র হয়ে তাঁদের আপন আপন শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি মান তৈরী করবেন। তারপর আরো বিস্তৃত অঞ্চলের শিক্ষক-প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে আঞ্চলিক মান নির্ণয় করবেন। এইভাবে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার নির্ভরযোগ্য মান গড়ে উঠবে। শিক্ষাব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যও শিক্ষকদের এই সংগঠন অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, শিক্ষার মান বিষয়ে প্রতিটি সিদ্ধান্তই পরীক্ষামূলক এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ। সাধারণ মান মেনে নিলেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সে মান নিয়ে পরীক্ষা এবং তা প্রয়োজনমত রদবদল করার অধিকার থাকবে। তার ফলে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এমন আশঙ্কার কোনো সঙ্গত কারণ দেখিনা। বরং কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি অন্যদের তুলনায় প্রকৃষ্টতর মান গড়ে তুলতে পারে, তাহলে সমাজ সেখানকার শিক্ষাকেই বেশী মূল্য দেবে এবং ফলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তার দ্বারা প্রভাবিত হবে।

শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে আরো কিছু কথা বলা যেত, কিন্তু আপাতত এই প্রস্তাব কটি দেশের শিক্ষিত-সমাজের নিকটে আলোচনার জন্য পেশ করা গেল। স্বাধীনতার পর তিন দশক ধরে এদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দুর্নীতি

এবং ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে এদেশের শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন। কিন্তু এই দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা কি আসলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের অসহায়তা এবং ছাত্রদের ব্যর্থতাবোধের প্রকাশ নয়? ছাত্র যদি শিক্ষা থেকে কিছু লাভ না করে, তবে সে শিক্ষায় তার আগ্রহই বা আসবে কোথা থেকে এবং শিক্ষকদের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হবেই বা কি করে? শিক্ষা যদি ছাত্রের মনে আনন্দের সঞ্চার করে, শিক্ষকরা যদি বৈদগ্ধ্য এবং চরিত্রবলের সামর্থ্যে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে আজ যে বিভ্রান্ত প্রাণশক্তি আত্মঘাতী উচ্ছৃঙ্খলতার আকার নিয়েছে ক্রমে তাই আবার সৃষ্টিশীলতার উৎস হয়ে উঠবে। শিক্ষক এবং অভিভাবকরা যদি তাঁদের দায়িত্ব পালন না করে শুধু ছাত্রদের ওপরে নারাজ হয়ে ওঠেন, তাহলে এই কঠিন সমস্যার কোনো সুরাহা হবে না। ক্লাসগুলিতে ছাত্রদের ভীড় কমিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো হোক; অধ্যাপকদের বক্তৃতার পর গুরুশিষ্যের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক; নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করানোর পরিবর্তে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল এবং গ্রন্থাগারে জ্ঞানান্বেষণের বৃত্তিকে মূল্য দেওয়া হোক; বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের চাইতে বৎসরব্যাপী মানসিক-বিকাশের রিপোর্টের ওপরে বেশী জোর দেওয়া হোক। তবেই না ছেলেমেয়েরা যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। অপরপক্ষে, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক যদি শুধু বেতনভোগী কর্মচারীতে পর্যবসিত হন, পাঠ্যতালিকা, শিক্ষনপদ্ধতি অথবা ছাত্রনির্বাচন—সমস্ত ব্যাপারেই যদি তাঁকে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কিংবা শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশ মেনে চলতে হয়, তাঁকে যদি উদয়াস্ত প্রাণধারণের সমস্যা নিয়ে বিপর্যস্ত থাকতে হয় এবং সেকারণে কি নিজের জ্ঞানচর্চা কি ছাত্র-ছাত্রীদের বিকাশের জন্য যত্নশীল হওয়ার কোনো সুবিধা না থাকে, তাহলে তিনিই-বা শিক্ষক হিশেবে তাঁর দায়িত্বপালনের অথবা যোগ্যতা-প্রমাণের কতটুকু সুযোগ পাবেন, এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাই-বা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট বোধ করবেন কি করে?

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শিল্পীর স্বাধীনতা

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মৃত্যুতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কতটা ক্ষতি হয়েছিল ঠিক জানিনা ; কিন্তু তার ফলে এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সূক্ষ্ম অনুভূতি, চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা, এবং দক্ষ রূপায়ণের সাধনা যে অকম্প্য আত্মপ্রত্যয় এবং আদর্শনিষ্ঠার পরিপন্থী নয়, একথাটা যখন এদেশের গুণী ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই ভুলতে বসেছেন, তখন সেই মারাত্মক চিত্তভ্রংশের বিরুদ্ধে প্রায় একক প্রতিবাদ হিশেবে শিশিরকুমার আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর অত্যাশ্চর্য অভিনয়প্রতিভার কথা কে না জানে? কিন্তু যে অসামান্য চরিত্রবলের সমর্থনে এই প্রতিভা শিল্পোত্তর অর্থসমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তার তুলনা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশে আমার অন্তত চোখে পড়ে নি।

শিশিরকুমারপ্রসঙ্গে চরিত্রবলের উল্লেখ অপ্রত্যাশিত ঠেকতে পারে। প্লেটোর কাল থেকে অভিনেতাদের সম্বন্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ সুবিদিত।[১] এবং উক্ত গ্রীক দার্শনিক যেসব যুক্তির দ্বারা এই অভিযোগ প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় না থাকলেও এই অভিযোগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনেও বিশেষ সন্দেহ দেখা যায় না। শিশিরকুমার অধ্যাপনার নির্ঝঞ্ঝাট বৃত্তি ত্যাগ করে নটের প্রলোভনসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর সুরাসক্তি এবং অমিতব্যয়ের কথা কারো অজানা ছিল না; তিনিও তা গোপন করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন না। তাঁর অতি বড় অনুরাগীরাও সম্ভবত তাঁর পারিবারিক জীবনকে আদর্শস্থানীয় বলে দাবি করবেন না। তবে শিশিকুমারের চরিত্রবল কোন্‌খানে?

এই প্রশ্নের আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস বুলিপোষ্য বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য এ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

॥ দুই ॥

খ্যাতিমান পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক ডেভিড রীজ্‌ম্যান আধুনিক সমাজকে "নিঃসঙ্গ জনতা"-র সমাজ বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানবচরিত্রকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন।[২] এর মধ্যে যে শ্রেণীটি সংখ্যার দিক থেকে সব চাইতে বড় তার সদস্যরা নিজেদের চরিত্রের কাঠামো গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক এবং সে কারণে অক্ষম; এঁরা সবসময়ে অন্যদের নির্দেশ-অনুসারে নিজেদের পরিচালিত করতে অভ্যস্ত। উক্ত সমাজতাত্ত্বিক এই জাতীয় চরিত্রের নামকরণ করেছেন "অপর-নিয়ন্ত্রিত" বা "আদার-ডাইরেক্‌টেড্"। আর পাঁচজনের পছন্দের ছাঁচে নিজেদের ঢালতে পারলে এঁরা সুখী। দেশে যখন "পরমপুরুষ"-কে নিয়ে খুব মাতামাতি, তখন এঁরা উক্ত বই সংগ্রহের জন্য বইয়ের দোকানে "কিউ" দিয়ে থাকেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো নিকৃষ্ট ঔপন্যাসিক বাজারে আবির্ভূত হলে তাঁর বই পড়ার জন্য গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে এঁদেরই ভীড় দেখা যায়। এঁদের নিজেদের কোনো ভাললাগা বা মন্দলাগার বালাই নেই; নিজেদের বুদ্ধিবিবেক খাটিয়ে এঁরা সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিত নির্ণয়ে অশক্ত। এঁদের জন্যই "ফ্যাশন" এর সৃষ্টি। ব্যবসায়ীরা চটকদার মালের ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিয়ে, আর রাজনৈতিক দলগুলি গরম গরম শ্লোগান তুলে এঁদেরি প্রধানত জালে ধরে থাকেন। নিজের চেতনার আরশীতে নিজের মুখ দেখায় এঁদের ভারি ভয়। ভীড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে তারি ঘর্মাক্ত সামষ্টিকতায় আত্মবিলুপ্ত হওয়াতে এঁদের পরম সুখ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র "ঐতিহ্য-নিয়ন্ত্রিত" বা "ট্র্যাডিশন-ডাইরেক্‌টেড্"। এঁরা সংখ্যার চাইতে ইতিহাসকে বেশী মূল্য দেন, সিনেমার নায়কের চাইতে শাস্ত্রীয় নির্দেশকে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজ যেসব প্রত্যয় এবং আচার-অনুষ্ঠান মেনে এসেছে, তারই আদলে এঁদের চরিত্র গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রে নির্ভরযোগ্যতা বেশী। এঁরা নিজেদেব ওপরে নির্ভর করতে না শিখলেও এঁদের মূল্যমান সময়ের দ্বারা অনেকটা পরীক্ষিত। তাছাড়া এঁদের অনুভূতি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং পরিশীলিত। এবং যে অথরিটিকে এঁরা মানেন তাঁর প্রতি এঁরা মোটামুটি নিষ্ঠাবান। কিন্তু নানাকারণে কোনো সমাজের ঐতিহ্যে যখন ভাঙন ধরে তখন এঁদের অবস্থা বড় অসহায়। কারণ এঁরাও ত আসলে পরতান্ত্রিক। নিজের যুক্তি, বিবেক এবং রুচির

ওপরে নির্ভর করতে না শেখার ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় এরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। শুধু তৃতীয় শ্রেণীর মানুষই "অন্তর্নিয়ন্ত্রিত" (ইনার-ডাইরেক্টেড্) বা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন। এঁরা ঐতিহ্যের নির্দেশ মেনে বা জনযূথের অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করেন না ; আপন বুদ্ধি, কল্পনা এবং প্রয়াসের দ্বারা এঁরা নিজেদের নির্বাচিত আপন আপন জীবন গড়ে তোলেন। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে মানবতন্ত্রীরা এঁদের কথা ভেবেই ঘোষণা করেছিলেন, মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা, পরতন্ত্র মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়।

এখন আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে "ঐতিহ্য-নিয়ন্ত্রিত" মানুষকেই চরিত্রবান বলে কল্পনা করা হয়েছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত মনে এই ধারণা সম্বন্ধে সংশয় জাগে ; এবং এদেশের কিছু মানুষ নিজের নিজের বিবেক-অনুযায়ী আপনাকে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও বাংলা দেশে এই অভিনব নীতিচিন্তার প্রবক্তা। প্রচলিত আদর্শের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্বকীয় বুদ্ধিবিবেক-অনুযায়ী এঁরা আপন আপন ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করে তোলেন। যে স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা প্রৌঢ় রামমোহন এবং তরুণ ডিরোজিওর চরিত্রে ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধ বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল, আমার বিশ্বাস গত দেড়শ' বছরের মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যা কিছু স্মরণীয় সৃষ্টি তা মুখ্যত এই প্রেরণারই ফল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ যাঁর মধ্যে জাগ্রত তাঁকে কোনো ভয় অথবা প্রলোভন স্বধর্মচ্যুত করতে পারে না। তিনি হয়ত মদ্যপ, বেশ্যাশক্ত, অথবা অমিতব্যয়ী হতে পারেন ; কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে অথবা সামাজিক শাস্তির আশঙ্কায় নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে তিনি গররাজি। শাস্ত্র অথবা বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনুশাসিত গড্ডল সমাজ তাঁকে দুশ্চরিত্র আখ্যা দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার যাঁরা আদি প্রবক্তা পশ্চিমী রেনেসাঁসের সেই মানবতন্ত্রী মনীষীরা এই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার মধ্যে যথার্থ চরিত্রবলের সন্ধান পেয়েছিলেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী উপরোক্ত অর্থে আমাদের যুগের অন্যতম চরিত্রবান মহৎ শিল্পী। যৌবনকালে যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাঁকে অধ্যাপনার সমাজ-সম্মানিত বৃত্তি ত্যাগ করে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সমাজ-ধিক্কৃত পথ বরণ করার সাহস জুগিয়েছিল, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাতে কোনো শিথিলতা দেখা দেয় নি। তাঁর স্বনির্বাচিত শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি কোন রকমের পরতন্ত্রতার সঙ্গে রফা

করেন নি। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এজাতীয় চরিত্রবল হয়ত একেবারে দুর্লভ ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে এ ধরণের চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যে কত কঠিন আমাদের সমকালীন বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার বিচার করলেই তা বোঝা যায়। যেদেশে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরাও বিত্ত এবং বিজ্ঞাপনের লোভে নিকৃষ্টতম সিনেমাপত্রিকায় চড়াদামে নিজেদের রচনা প্রকাশে উদ্যোগী, ক্ষমতাবান্ গল্পলেখক প্রকাশকের চাপে ছোট গল্পকে ফেনিয়ে উপন্যাস বানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, দেশ-বিশ্রুত অধ্যাপক অপরের লেখা ছাত্রপাঠ্য নোটবইতে মোটা সেলামীর বিনিময়ে নিজের নাম লেখক হিশেবে ছাপতে দিতে প্রস্তুত, প্রখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক জনপ্রিয়তার আকাঙ্খায় অথবা মালিকের হুকুমে নিজের প্রত্যয়বিরোধী প্রস্তাব ফলাও করে উপস্থিত করতে সুপটু, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের জন্য যেখানে শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষীরাও ঘোর প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত···সে দেশে শিশিরকুমারের মত স্বাধীনচেতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পীর উপস্থিতি বিস্ময়কর না ঠেকে উপায় কি।

॥ তিন ॥

আমাদের দেশে (এবং পৃথিবীর অন্য সবদেশেও) শিল্পী এবং মনীষীদের স্বাধীনতা আজ নানাদিক থেকে আক্রান্ত। রুশ, চীন, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মত সুস্পষ্টভাবে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আক্রমণের ভয়াবহ রূপ আজ আর গোপন নেই। কিন্তু আধুনিককালের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক সমাজেও এই আক্রমণ ততটা বীভৎস আকার না নিলেও মোটেই অনুপস্থিত নয়। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, কিন্তু আমাদের দেশেও এই আক্রমণ ক্রমেই যেসব পথে প্রবল হয়ে উঠছে, তার একটা খুব সংক্ষিপ্ত আভাস এই প্রসঙ্গে দেওয়া দরকার মনে করি।[৩] প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে সেটি হোল ব্যবসায়ীদের আক্রমণ। শিল্পী নিজের প্রেরণার তাগিদে রূপ সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকেও ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হতে হয়। ব্যবসায়ী শিল্পকর্মের গুণাগুণ ঠিক করেন বাজারের চাহিদার মাপকাঠি দিয়ে। যে শিল্পীর যথেষ্ট পৈত্রিক বিত্তপশার অথবা অন্য কোনো সূত্রে জীবিকা-নির্বাহের বন্দোবস্ত আছে, তিনি হয়ত ব্যবসায়ীর ফরমাসকে অগ্রাহ্য করে নিজের খুশীমত সৃষ্টি করে যেতে পারেন। কিন্তু এদেশে অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক দরিদ্র; প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে তাঁদের মধ্যে অনেকে

জীবিকানির্বাহের জন্য ক্রমেই আপন আপন শিল্পকর্মের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করেছেন। তাঁদের পক্ষে ব্যবসায়ীদের মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য করার অর্থ অনেকক্ষেত্রে হয়ত সপরিবারে উপবাস। বিশেষ করে যদি তাঁরা এক্ষেত্রে নবাগত হন। আবার ব্যবসায়ীদের ফরমাস-মাফিক তাঁদের প্রতিভাকে নিয়মিত করে যখন তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ হন, তখন সুযোগ থাকলেও স্বাতন্ত্র্যের সাধনায় ফিরে যাবার সামর্থ্য আর তাঁদের থাকে না। বাংলাদেশে বৈষয়িক নির্দেশের চাপে শিল্পবিবেকের এই অবক্ষয় আমাদের চোখের সামনে দিনে দিনে মর্মান্তিক ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

একটি দুটি উদাহরণ দিলে কথাটা হয়ত স্পষ্টতর হবে। সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে বাংলা সাহিত্যের যে শাখাটি গত সত্তর আশী বছরে সবচাইতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হোল ছোট গল্প। আমার নিজের ত ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছের" সঙ্গে তুলনীয় রচনা যে কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ। কিন্তু পুস্তক-প্রকাশকদের মতে গল্পের বইয়ের চাহিদা এদেশে খুব কম ; তার চাইতে উপন্যাসের কাটতি অনেক বেশী। ফলে গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে অনেক লেখক—যাঁরা ছোটগল্প লেখায় আশ্চর্য নিপুণতা দেখিয়েছিলেন তাঁরা—ছোট গল্পকে টেনে বড় করে উপন্যাসের আকার দেবার চেষ্টা করেছেন। তাতে তাঁরা ভালো ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন নি, বরং ছোটগল্পের হাতও তাঁরা হারিয়েছেন। এঁদের মধ্যে যদি শক্তির স্বাক্ষর না থাকত, তাহলে চিন্তা করার কিছু ছিলনা। কিন্তু এঁদের গোড়ার দিকের ছোট গল্প পড়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই যে উপন্যাস লেখার ব্যর্থ চেষ্টায় এঁদের দুকূলই গেছে বা যেতে বসেছে। তেমনি গ্রন্থ-ব্যবসায়ীরা নাটক ছাপতে গররাজি বলে বাংলা দেশের অধিকাংশ শক্তিমান্ লেখক নাটক লেখার চেষ্টাই করেন না। যাঁদের কল্পনায় কাহিনী নাটকীয় রূপে দেখা দেয়, তাঁরাও সে কাহিনীকে উপন্যাসের আকারে উপস্থিত করে থাকেন। আবার এমন কিছু ঘটনাও জানি যেখানে প্রকাশক লেখককে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোন্ বিষয়ে কী ভাবে লিখলে সে লেখা বাজারে চলবে, এবং ক্ষমতাবান্ লেখক সে উপদেশ মেনে নিয়ে নিজের কল্পনার নির্দেশকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রাহ্য করেছেন।

ব্যবসায়ীরা বাজারের চাহিদা দেখে শিল্পের মূল্য নির্ণয় করেন ; আর বাজারের চাহিদা ঠিক করেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। শিল্পী হয়ত কোন রকমে একজন ব্যবসায়ীকে প্রভাবান্বিত করে তাঁর শিল্পকর্ম প্রকাশ করার

ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেটি যদি সাধারণ ক্রেতাকে আকৃষ্ট না করে তাহলে কোন্ ব্যবসায়ী দ্বিতীয়বার আর সে শিল্পীকে সুযোগ দিতে রাজি হবেন? এখন জনসাধারণের রুচি যদি সুশিক্ষিত হত, তাহলে শিল্পী কিংবা বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত আজো পৃথিবীর কোন দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের শিল্পরুচি খুব একটা সূক্ষ্ম নয়। উপযুক্ত শিক্ষা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে অনুশীলনের অভাব জনরুচির এই স্থূলতার প্রধান কারণ। তবু পশ্চিমের অনেক দেশে দীর্ঘদিন ধরে যথার্থ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং থিয়েটার, মিউজিয়াম, গ্যালারী, অর্কেষ্ট্রা হল, গ্রন্থাগার ইত্যাদি সূত্রে উৎকৃষ্ট শিল্পসম্ভোগের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা থাকার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অপকৃষ্ট রুচির প্রতাপ থেকে প্রতিভাবান্ এবং পরীক্ষাশীল শিল্পী-প্রতিভাকে রক্ষা করার মত কিছু বিদগ্ধ পৃষ্ঠপোষক আজও বর্তমান; তাঁরা সংখ্যায় একেবারে নগণ্য নন। কিন্তু আমাদের দেশে সম্প্রতিকালে অক্ষর-পরিচয় যেমন বাড়ছে, উচ্চশিক্ষার মান তেমনি দ্রুত নামছে। এদেশে শিল্প সাহিত্যের বিবর্ধমান পৃষ্ঠপোষক সম্প্রদায় কোন জটিল চিন্তা, সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম অথবা ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ কল্পনার আবেদনে সাড়া দিতে প্রায় অক্ষম। যাঁদের হয়তো সে বৈদগ্ধ্য আছে তাঁরা সংখ্যায় এতই অল্প যে তাঁদের পৃষ্ঠপোষণার ওপরে নির্ভর করে কোন দরিদ্র শিল্পী অথবা মনীষীর পক্ষে জীবিকা উপার্জনের আশা নিতান্ত অসম্ভব কল্পনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনরুচি সেই ধরণের কাহিনীকেই তারিফ করে যাতে হয় আছে সস্তা ভাঁড়ামি আর না হয় নির্বোধ ন্যাকামি, যাতে ধর্মের সন্ত্রস্ত অসহায়-বোধের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ক্লীবের যৌনলালসা, কিংবা রাজনৈতিক মাতলামির সঙ্গে ক্রাইমের রোমাঞ্চ। বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "সত্যাসত্য"-র তিন সংস্করণ প্রকাশিত হতে দু'দশক লেগে যায়। কমল মজুমদারের মত অসামান্য লেখকের পাঠকসংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে শতকের গণ্ডির মধ্যে। কিন্তু নীহার গুপ্ত, বিমল মিত্র এবং শঙ্করের রচনাবলীর দ্রুত এবং নিয়মিত পুনর্মুদ্রণ ঘটে। সৌখীন অভিনেতারা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটক কেউ অভিনয় করতে চান না; অথচ পেশাদারী মঞ্চে নিতান্ত নিকৃষ্ট নাটক দেখার জন্য মাসের পর মাস ভীড় বেড়ে চলে। সত্যজিৎ রায়কে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যেতে হয় বিদেশে; এদিকে বিস্তর ফিল্মের প্রযোজক বক্স অফিসের দৌলতে লাল হয়ে ওঠেন। যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ী শিল্পী তা সত্ত্বেও হয়ত নিজের সাধনায় স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারেন। কিন্তু গণ-সমর্থনের লোভ এবং গণ-ঔদাসীন্যের ভয় যে সকলকে না হোক

অনেক ক্ষমতাবান শিল্পী এবং মনীষীর মনে সচেতন অথবা অবচেতনভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং করেছে, একথা অন্তত বাংলাদেশের অধিবাসীর পক্ষে আজ অস্বীকার করা অসম্ভব।

তৃতীয় আক্রমণের উৎস হোল রাজনৈতিক দল এবং মতবাদ। ব্যবসায়ীরা যেমন জনসাধারণের চাহিদার হিশেব করে শিল্পী এবং মনীষীদের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে, রাজনৈতিক দলগুলিও তেমনি গণশক্তির প্রতিভূ হিশেবে বুদ্ধিজীবীদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত। বাংলাদেশে এদিক থেকে কম্যুনিস্ট্ পার্টিদের ক্রিয়াকলাপ বেশী প্রকট; কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কংগ্রেস এবং বিভিন্ন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও এ ব্যাপারে একেবারে পিছিয়ে নেই। শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং বৈষয়িক সাফল্য আজকের দিনে মুখ্যত নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের ওপরে; এবং বিজ্ঞাপনের টেকনিকে বড় রাজনৈতিক দলগুলির নিপুণতা অসামান্য। একথা অবশ্য সত্য যে শুধু বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়, তার স্থায়িত্ব নিতান্ত সাময়িক। কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যিককে যখন জীবনধারণের জন্য জনসমর্থনের ওপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হয় তখন তাঁর পক্ষে ভবভূতির মত নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর ওপরে ভরসা রেখে অপেক্ষা করা অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়ে। দলীয় মতবাদ এবং নির্দেশ অভ্রান্ত বলে মেনে নিলে তবেই দলের সমর্থনলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু যেমন ব্যবসায়ীর ফরমাস অথবা গণরুচির দাবি, তেমনি দল এবং মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ শিল্পীর আত্মহত্যা। সমকালীন বাংলাদেশে শেষোক্ত প্রকৃতির মানসিক আত্মহত্যার উদাহরণ আজ মোটেই দুর্লভ নয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর গত তিরিশ বছরের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার ওপরে নতুন এক আক্রমণ চোখে পড়ছে। এটি হোল রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ। স্বৈরতন্ত্রে রাষ্ট্র গায়ের জোরে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা হরণ করে। আমাদের এই "জনসেবী" গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের আক্রমণের চেহারাটা অন্যরকম। আমাদের শিল্পীমনীষীরা দরিদ্র; কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে বিত্ত এবং ক্ষমতা প্রায় অপরিসীম। উপাধি এবং পুরস্কার দিয়ে, নির্দায়িত্ব অথচ উঁচু মাইনের চাকরিতে নিয়োগ করে, পৃষ্ঠপোষিত লেখকের রচনা প্রচুর সংখ্যায় কিনে, দেশ-বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিশেবে পাঠিয়ে—অর্থাৎ নানাভাবে ঘুষ দেবার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র আজ শিল্পী-সাহিত্যিককে তার অনুগতজনে পর্যবসিত করতে

উদ্যোগী। হয়ত এর পেছনে কোনো সচেতন অসদিচ্ছা কখনো সক্রিয় নয়; কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর বিষময় প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। পৃষ্ঠপোষণের সূত্রে নানা রকমের ঘুষ এদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের যে কতখানি নীতিভ্রষ্ট করেছে তার ভয়াবহ পরিচয় পাওয়া গেল সাময়িকভাবে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের আমলে। সেই বিনিশ্চায়ক মাসগুলিতে জুলুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরিবর্তে অধিকাংশ ভাবুক এবং শিল্পী হয় ইন্দিরা গান্ধীর স্তব করেছিলেন, নয় আশ্রয় খুঁজেছিলেন উৎত্রাসিত মৌনে। শিল্পীর স্বাধীনতা এদেশে যে কতদূর অনবস্থ, শক্তিমানের তাঁবেদারি এদেশে মনীষীদের মধ্যে যে কতখানি ব্যাপক সেই নির্বিণ্ণ সময়ে তা উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

॥ চার ॥

সমকালীন বাঙালী শিল্পী এবং মনীষীদের তুলনায় শিশিরকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে তিনি আজীবন এই চতুর্বিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর শিল্পবিবেককে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রফা করেননি; তাই ভারতবর্ষের সব চাইতে প্রতিভাবান নটকে শেষজীবনে রঙ্গমঞ্চের অভাবে মাসের পর মাস নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে হয়েছে। রফা করার বদলে কলেজ স্ট্রিটের ছোট ঘরে স্বল্পসংখ্যক শ্রোতার সামনে এই দীপ্ত পুরুষ শেক্‌স্‌পীয়র থেকে বিভিন্ন অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন — হাতে চায়ের ফাটা পেয়ালা, সামনে ছাই ফেলার ভাঁড়। সেই কণ্ঠে. আসনে এবং মুদ্রায় মূর্ত হয়েছিল যাকে বলি শিল্পবিবেক। যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে কী ভাবে তিনি বারবার দর্শকদের মূঢ়, অসহিষ্ণু দাবিকে প্রকাশ্যভাবে ধমক দিয়ে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন। কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন পাবার জন্য তিনি জীবনে চেষ্টা করেন নি; অথচ সামান্য ইঙ্গিত দিলেই অন্তত রুশ অথবা চীনগামী যে-কোনো সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের নেতৃত্ব পাওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল। আর মৃত্যুর পূর্বে এই নিঃস্ব শিল্পী অ্যাকাডেমির চাকরি এবং সরকারী খেতাব যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এই হতভাগ্য দেশের মানস-ইতিহাস যদি কোনোদিন লিখিত হয় তাতে সে-কাহিনী একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে। অথচ কে না জানে, একজন অভিনেতার পক্ষে এই সব প্রলোভন জয় করা কত কঠিন। চিত্রকর নিজের মনে আঁকতে পারেন,

মনীষী নিজের ভাবনা লিপিবদ্ধ করে সুখী হতে পারেন। কিন্তু অভিনেতার রঙ্গমঞ্চ চাই, দর্শক চাই, বিজ্ঞাপন চাই। তাছাড়া যেহেতু সমাজ অভিনেতাকে শ্রদ্ধার আসন দিতে অপ্রস্তুত, সেহেতু রাষ্ট্রীয় সম্মানের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। শিশিরকুমার শুধু যে এসব আক্রমণকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিহত করেছিলেন তাই নয়। যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন তাঁরা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে এইসব প্রলোভন তাঁর মনে কখনো কিছুমাত্র প্রচ্ছন্ন প্রভাবও ফেলতে পারে নি।

বহুদিন আগে দার্শনিক এপিকুরস বলেছিলেন, দেবতাদের খুশী করার জন্য নয়, সমাজের শাস্তির ভয়ে নয়, সৎ হয়ে আনন্দ পাই বলেই আমি সৎ। এটি যথার্থ মানবতন্ত্রীর কথা, আর এই প্রত্যয় ছাড়া শিল্পীর স্বাধীনতা নিরর্থ। জীবিকার জন্য নয়, প্রতিষ্ঠার লোভে নয়, অভিনয়ের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত প্রকাশ, এসত্য উপলব্ধি করে শিশিরকুমার অভিনয়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে ক'জন শিল্পী-সাহিত্যিক-মনীষীর জীবন এমন উপলব্ধির দ্বারা পরিচালিত, জানতে ইচ্ছে করে।

গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার ও "মূঢ়তার বিশ্বকোষ"

J'ai pris plaisir a combattre mes sens et a me torturer le coeur. J'ai refusé les ivresses humaines qui s'offraient. Acharné contre moi-meme, je déracine l'homme a deux mains, deux mains pleines de force et dorgueil. De cet arbre au feuillage verdoyant, je voulais faire une colonne toute nue pour y poser tout en haut, comme sur un autel, je ne sais quelle flamme céleste…আমি নিজের অনুভূতির সঙ্গে লড়াই করে আর নিজের হৃদয়ের ওপর অত্যাচার করে আনন্দ পেয়েছি। মানবীয় উদ্দীপনার উপহার আমি গ্রহণ করি নি। নিজের প্রতি আক্রোশে আমি দুই বলিষ্ঠ অহঙ্কৃত হাতে মানুষকে উৎপাটিত করেছি। পল্লবপ্রসন্ন সেই বৃক্ষ থেকে আমি সম্পূর্ণ নগ্ন একটি স্তম্ভ নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম যাতে যজ্ঞবেদীর মত তার উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত করতে পারি জানিনা কোন্ স্বর্গীয় অগ্নিশিখা।

ফ্রঁাসোয়া মোরিয়াক্-এর Trois grands hommes devant Dieu গ্রন্থে উদ্ধৃত ফ্লোবেয়ার-এর চিঠির অংশ। পৃঃ ১৫৯॥

সমকালীন শিল্পী এবং মনীষীদের জীবনে, চিন্তায় এবং ব্যবহারে যে বৈনাশিকতা সুস্পষ্ট, তার পূর্বাভাস উনিশ শতকের কোনো কোনো ফরাসী সাহিত্যিকের রচনায় চোখে পড়ে। এঁদের মধ্যে কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন বোদ্‌লেয়ার, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমনি ফ্লোবেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্তিত্বের অর্থহীনতার জ্বালাকে বোদ্‌লেয়ার কাব্যবস্তুতে রূপান্তরিত করেন।[১] এবং গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার-এর ঔপন্যাসিক কল্পনায় মানুষ সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র আশাভরসার চিহ্নও নজরে আসে না। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক এডমণ্ড উইলসন একদা

ফ্লোবেয়ার-এর রচনায় সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী আবিষ্কারের দাবি করেছিলেন।[৫] কিন্তু উক্ত ঔপন্যাসিকের গ্রন্থাবলী বার বার সযত্নে পাঠ করার পর আমার অন্তত সন্দেহ নেই যে এজাতীয় ব্যাখ্যা নিতান্তই কষ্টকল্পনাপ্রসূত। ফ্লোবেয়ার বুর্জোয়াদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন; তাঁর L'Education Sentimentale উপন্যাসে মঁসিয়ে দাঁব্রোস্ এবং তাঁর সহকর্মীদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

এই লোকগুলি তাদের বিত্তপশার রক্ষার জন্য, মুহূর্তের অস্বস্তি কিংবা অস্বাচ্ছন্দ্য এড়াবার উদ্দেশ্যে, অথবা স্রেফ দাসবুদ্ধি বা শক্তিমানের প্রতি স্বভাবজ আনুগত্যবশত নিজের দেশ কিম্বা মানবজাতিকে বিকিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করত না।

(··· ils auraient vendu la France ou le genre humain, pour garantir leur fortune, s'épargner un malaise, un embarras, ou même par simple bassesse, adoration instinctive de la force...)।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই উপন্যাসে তিনি সমান নির্মমতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে জনসাধারণ কোনো হিশেবেই বুর্জোয়াদের চাইতে উৎকৃষ্ট জীব নয়; লালসা, নীচতা, মূঢ়তা, এবং বিবেকহীনতায় তারা বুর্জোয়াদেরই রকমফের মাত্র। জঁা-পল সার্ত্র্ ফ্লোবেয়ারকে বলেছেন বুর্জোয়া।[৬] কিন্তু তিনি যে প্রত্যয়ের দিক থেকে সমাজতন্ত্রীও নন, বুর্জোয়াও নন, আসলে একজন অতিমাত্রায় অনুভূতিশীল মানববিদ্বেষী শিল্পী, একথা জর্জ সাঁ-কে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। "আমি যে কী ক্লান্ত", ফ্লোবেয়ার জর্জ সাঁকে লিখেছেন, "স্থূলরুচি শ্রমিক, অপটু বুর্জোয়া, নির্বোধ চাষী আর পাষণ্ড পুরোহিতদের সংসর্গে আমি যে কী ক্লান্ত!"

দুই

১৮২১ খৃস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর রুয়েঁ শহরে ফ্লোবেয়ার-এর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন স্থানীয় হাসপাতালের নামজাদা সার্জন। কিশোর ফ্লোবেয়ার নিজেদের বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে হাসপাতালের থিয়েটারে মড়াকাটা দেখতেন। জীবনীকারদের মতে শৈশবের এই অভিজ্ঞতা তাঁর

পরবর্তীকালের বিকৃত জীবনবোধের অন্যতম মূল কারণ। কারণ যাই হোক, ফ্লোবেয়ার পরবর্তীকালে লিখেছেন যে দশ বছর বয়সের মধ্যেই নাকি তাঁর মনে মানবজাতির প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার ভাব দৃঢ়মূল হয়ে যায়। অথচ বাপ-মায়ের সংসারে তাঁকে স্নেহ অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব বোধ করতে হয় নি। তাঁর জীবনে নানা প্রকৃতির স্ত্রীলোকেরও আনাগোনা ঘটেছিল। কিন্তু সমস্ত সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও ফ্লোবেয়ার জীবনে কোনো রস বা আনন্দের সন্ধান পান নি। বন্ধু মাক্সিম দু কাঁপ্‌কে তিনি লিখেছিলেন: "আমি প্রেমের সামর্থ্যে বঞ্চিত এবং সুখের সম্ভাবনায় অবিশ্বাসী।...প্রথম যৌবনেই আমি জীবনের আভাস পেয়েছিলাম। তার সঙ্গে বদ্ধ রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা পচা গন্ধের তুলনা করা চলে। না চেখেই নিশ্চিত হওয়া যায়, সে-রান্না মুখে তুললে বমি ছাড়া গত্যন্তর নেই।"[৪] মানুষের প্রতি এই বিশুদ্ধ বিতৃষ্ণা তাঁর প্রধান তিনটি উপন্যাসের মূল উপজীব্য। একঘেয়ে, নিরানন্দ জীবন থেকে পালাতে চেয়েছিল এমা বোভারি। কিন্তু মিথ্যাচরণের মূল্যে রোম্যান্স খরিদ করার পর সে বুঝতে পারল, এ-বস্তুটি আরো বিস্বাদ, আরো নিরর্থ এবং নিরানন্দ। এমার অসতীত্ব, উদ্বেগ এবং আত্মহত্যা কিছুই আমাদের বিচলিত করে না। L'Education sentimentale-এর ফ্রেদেরিক মরো সারা জীবন নিত্য নূতন সুখের পিছনে ছুটে বেড়িয়ে অবশেষে ফিরে এসেছিল নিজেরই অলঙ্ঘ্য শূন্যতায়। "কামনার প্রচণ্ডতা, অনুভূতির ফুল শুকিয়ে গেছে।...বছরের পর বছর বয়ে গেল; আর সে টিঁকে রইল শুধু তার নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি এবং স্থবির হৃদয়ের বোঝা বহন করে।" (..la véhemence du désir, la fleur meme de la sensation était perdue....Des années passerent ; et il supportait le désoeuvrement de son intelligence et l'inertie de son coeur...)।[৫] এমা এবং ফ্রেদেরিকের কাহিনীতে তবু যদি বা কিছু রঙ-রসের আভাস আছে, তাঁর শেষ উপন্যাস "বুভার এ পেকুশে"র থেকে ফ্লোবেয়ার নির্মম নিষ্ঠায় সে আভাসটুকুও একেবারে মুছে দিয়েছেন। এই দুই অবসরগ্রস্ত কেরানীর কাহিনী মানুষের সর্বগ্রাসী মূঢ়তার ওপরে এক আশ্চর্য স্যাটায়ার।

মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং দোষত্রুটি নিয়ে ফ্লোবেয়ারের আগেও অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। ফ্লোবেয়ার যাঁকে নিজের গুরু বলে স্বীকার পেতেন, রেনেসাঁসের সেই বিখ্যাত প্রাবন্ধিক মঁতেইয় মানুষের ন্যাকামি-বোকামি নিয়ে কম ঠাট্টা করেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন মানুষের সৃষ্টিশীলতায়

বিশ্বাসী ; সেকারণে তাঁর ব্যঙ্গে বিতৃষ্ণার ভাব নেই, তা কৌতুকসরস। আঠারো শতকের ফরাসী এনসাইক্লোপেডিস্টরা মানুষের অজ্ঞতা, সঙ্কীর্ণতা এবং নীচতাকে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু সে আক্রমণের উৎস মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, মানুষের কাছ থেকে মানুষের যোগ্য ব্যবহারের প্রত্যাশা। ফ্লোবেয়ারের বৈশিষ্ট্য হোল, মানুষের কাছে তাঁর কোনো সচেতন প্রত্যাশা ছিল না। তাঁর কল্পনায় মানুষের অস্তিত্ব অবিমিশ্র রকমের নিরর্থ ঠেকেছিল। এদিক থেকে তিনি প্রথম-মহাযুদ্ধোত্তর আধুনিকদের পূর্বসূরী। সকলের না হোক, অনেকের।

সাধারণভাবে মনুষ্যজাতিকে নির্বোধ ঠাওরালেও, বিশেষ করে যে মানুষদের দেখে ফ্লোবেয়ারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, তাঁরা মুখ্যত তাঁর সমকালীন ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজের সদস্য। তিনি নিজেও এই সমাজের মানুষ ; আজীবন তিনি এই সমাজেই বাস করেছেন ; "মাদাম বোভারি", "লে'দুকেশিয়ঁ সঁতিমঁতাল" এবং "বুভার এ পেকুশে"-র পাত্রপাত্রী এবং ঘটনাবলী এই সমাজ থেকেই সংগৃহীত। এই সমাজের প্রতি তাঁর ঘৃণার অন্ত ছিল না। সেই ঘৃণা ক্রমে সাধারণভাবে মানবজাতির প্রতি বিতৃষ্ণায় পর্যবসিত হয়। সে-বিতৃষ্ণা তাঁর ভাবনা-চিন্তায় কত গভীর প্রভাব ফেলেছিল, তার স্বাক্ষর এই তিনটি উপন্যাসের সর্বত্র চোখে পড়ে। কিন্তু তার তীব্রতা এবং ব্যাপকতার সবচাইতে প্রামাণিক উদাহরণ হোল তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত "দিক্‌শনেয়ার দেজিদে রেস্যু" (Dictionnaire des Ide´es Recues) বা প্রচলিত ধারণার অভিধান।

তিন

ফ্লোবেয়ার মারা যান ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ; তার এক বছর পরে "বুভার এ পেকুশে" (Bouvard et Pe´cuchet) প্রকাশিত হয়। তিনি যে বহুদিন ধরে চলতি ধারণার একটি প্রামাণিক কোষগ্রন্থ লেখার উপাদান সংগ্রহ করেছেন একথা তাঁর বান্ধব-বান্ধবী, শিষ্য-অনুচরদের মধ্যে অনেকেই জানতেন। ফ্লোবেয়ার নিজেই তাঁর সংগৃহীত উপাদানের কিছু কিছু নমুনা নির্বাচিত ভক্ত এবং সহকর্মীদের কাছে মতামতের জন্য পাঠান। বন্ধু জুলে দুপ্লাঁকে দিয়ে সমকালীন লেখকদের রচনা থেকে বাছাই করা নির্বোধ উক্তির একটি সঙ্কলনও তিনি তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনুরাগীরা তাঁর সম্বন্ধে যে সব আলোচনা

করেন তার কোনো কোনটিতে এই পরিকল্পনার উল্লেখ দেখা যায়। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত জর্জ সাঁ-কে লেখা ফ্লোবেয়ার-এর চিঠিপত্রের এক সঙ্কলনগ্রন্থে মোপাসাঁ যে মুখবন্ধ লেখেন তাতে এই অভিধানের উল্লেখ ত' আছেই, তাছাড়া প্রচুর নমুনার উদ্ধৃতিও আছে (আমার এই লেখাটি "দেশ" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব একটি চিঠিতে মোপাসাঁর এই প্রবন্ধের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)। তা সত্ত্বেও ফ্লোবেয়ার-এর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তাঁর এই অভিধানের পাণ্ডুলিপিটি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে থাকে। ১৯১০ সালে ই. এল. ফেরায়ার নামে জনৈক পণ্ডিত ফ্লোবেয়ার-এর সাহিত্যাদর্শ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ফ্লোবেয়ারের ভাগ্নী কারোলিনের কাগজপত্রের মধ্যে "দিক্শ্যনেয়ার"-এর খসড়া পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। পরের বছর "বুভার এ পেকুশে"-র পরিশিষ্ট হিশেবে এটি প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯১৩ সালে ফেরায়ার এটি সম্পাদনা করে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বার করেন। ফেরায়ারের ভূমিকা থেকে জানা যায়, পাণ্ডুলিপিটি চল্লিশটি ফোলিওতে বিভক্ত ছিল। ফ্লোবেয়ার এটিকে একটি পরিকল্পিত গ্রন্থের খসড়া আকারে রেখে গিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেন নি। পাণ্ডুলিপির সব অংশ তাঁর নিজের হাতে লেখা নয়। কোনো কোনো অংশের হস্তলিপি তাঁর ভাগ্নীর, কোনো কোন অংশ তাঁর সেক্রেটারী লাপোর্তের। সব মিলিয়ে ফেরায়ার তাঁর সংস্করণে ৬৭৪টি শব্দের ব্যাখ্যা (অর্থাৎ ঐসব বিষয়ে ফ্লোবেয়ার কর্তৃক সংগৃহীত 'চলতি ধারণা') প্রকাশ করেন।

ফেরায়ার-এর সংস্করণে অনেক ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা ছিল। ১৯৫১ সালে জাঁ ওবিএ-র সম্পাদনায় অভিধানটির একটি সম্মার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফ্লোবেয়ারের জন্মস্থান রুয়ঁে-র গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করার ফলে ওবিএ সাহেব আরো দুটি নতুন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এ দুটি উপরোক্ত "দিক্শ্যনেয়ার"-এর অংশবিশেষ। প্রথমটি হোল এক-খণ্ডে বাঁধানো পঁচিশটি ফোলিওতে সাঁটা কয়েকশ, শব্দের তালিকা ; দ্বিতীয়টি হোল উনিশটি ফোলিও-সম্বলিত একটি কপিবুকে কিছু শব্দ। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে, তাদের মধ্যেকার পুনরুক্তিগুলিকে বাদ দিয়ে, প্রথম অক্ষর অনুসারে শব্দমালা সাজিয়ে ওবিএ তাঁর সংস্করণ প্রস্তুত করেন। এটির মোট শব্দ ৯৬১। ফেরায়ার এবং ওবিএ-র সংস্করণের ওপরে নির্ভর করে এডওয়ার্ড ক্লুক ১৯৫৪ সালে এই অভিধানটির একটি প্রামাণিক ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করেন।

১৯৫৭ সালে পারী-র রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সেন নদীর বাঁ-ধারের সড়কে এক বুড়ো বুকিনিস্ত্-এর কালো কাঠের সিন্দুকের মধ্যে ওবিএ এবং ফেয়ার‍্যার সম্পাদিত সংস্করণ দুটির কপি দেখে সেগুলি আমি খরিদ করি। তার পূর্বে এই আশ্চর্য গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিল না। তারপরে মুকের সংস্করণটিরও একটি কপি সংগ্রহ করেছি।

চার

ফ্লোবেয়ার-এর মনে এই বইটি রচনার পরিকল্পনা কিভাবে গড়ে ওঠে ফেয়্যার সাহেব তার বিবরণ দিয়েছেন। ফ্লোবেয়ারের বাবা ছিলেন নামজাদা ডাক্তার। তাঁদের বাড়িতে যেসব বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত ছিল, তাঁরা সকলেই মোটামুটি বর্ধিষ্ণু সমাজের মানুষ। তাছাড়া ডাক্তার ফ্লোবেয়ারের অধিকাংশ রোগীই ছিলেন মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া। ফ্লোবেয়ার শৈশব থেকে অস্বাভাবিক রকমের অনুভূতিশীল; তাঁর পিতা-মাতার পরিচিত স্ত্রী-পুরুষদের কথোপকথন থেকেই তিনি প্রথম বুঝতে পারেন এঁদের জীবন এবং মনের জগৎ কত সঙ্কীর্ণ, অভ্যাসাশ্রয়ী, বোধহীন এবং স্বার্থপর। এঁরা স্বাধীনভাবে ভাবতে অনভ্যস্ত; অন্য পাঁচজন যা ভাবেন, যা বলেন, যা মানেন, তারি অনুসরণ করা এঁদের জীবনের আদর্শ। এঁদের গড্ডল চিন্তা, ব্যবহার, জীবনযাত্রা কিশোর ফ্লোবেয়ারকে মানুষ-সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ন'বছর বয়স থেকেই ফ্লোবেয়ার এঁদের নির্বোধ আলোচনার কিছু কিছু নমুনা একটা খাতায় টুকে রাখা শুরু করেন। যে-সব নিরর্থ প্রত্যয়কে এঁরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতেন পনের বছর বয়সেই তাদের তিনি নামকরণ করেন "ইদে রেস্যু"। তারপর তিনি নিয়মিতভাবে তাঁদের কথাবার্তা থেকে সেই সব চলতি ধারণার একটি তালিকা বানানো শুরু করেন। তারি সঙ্গে "গার্সঁ" বা "ছোকরা" নামে এক কাল্পনিক চরিত্র খাড়া করে তাকে যাবতীয় মূঢ়তার প্রতীক হিশেবে গড়ে তুলতে থাকেন। এই "গার্সঁ"-ই তাঁর শেষ উপন্যাসে "বুভার" এবং "পেকুশে"-র যুগ্ম চরিত্রে পরিণতি লাভ করেছিল।

তালিকা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। এই তালিকা থেকে ফরাসী জনসাধারণের সর্বব্যাপী নির্বুদ্ধিতা-বিষয়ে একটি প্রামাণ্য অভিধান সঙ্কলনের পরিকল্পনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দামাস্কাস থেকে বন্ধু লুই বুইয়েকে ১৮৫০

শালে লেখা ফ্লোবেয়ারের একটি পত্রে। "ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা, প্রচলিত নীতিনির্দেশ —এসব মেনে চলাতেই যে জনসাধারণের পরমার্থ, এই তত্ত্বটি একটি মুখবন্ধে ভাল করে ব্যাখ্যা করে যদি প্রচলিত ধারণার একটি বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ অভিধান তৈরি করা যায়, তাহলে সম্ভবত গ্রাহকের অভাব হবে না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে জনসাধারণ যেন ধরতে না পারে এই সঙ্কলনের ভিতর দিয়ে তাদের ব্যঙ্গ করা হচ্ছে কি না।"[৭] দু'বছর পরে তাঁর প্রণয়িণী লুইজ কোলে-কে একটি চিঠিতে লিখেছেন: "মানুষ জাতটাকে বেইজ্জত করবার একটা তীব্র বাসনা আমার মনে মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে। সম্ভবত বছর দশেক পরে একটা বড় উপন্যাসে আমি সেই বাসনা চরিতার্থ করব। ইতিমধ্যে একটি পুরোনো পরিকল্পনার কথা আবার মনে পড়েছে: সেটি হোল প্রচলিত ধারণার একটি অভিধান সঙ্কলনের পরিকল্পনা।…জনসাধরণ যা কিছু সমর্থন করে, এটি হবে তারই ঐতিহাসিক গুণকীর্তন। এই গ্রন্থে আমি প্রমাণ করে দেখাব যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সব সময়েই উচিত সিদ্ধান্ত করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠরা সব সময়েই ভ্রান্ত। আমি গাড়লদের কাছে প্রতিভাবান্‌দের বলি দেব, খুনেদের কাছে বলি দেব শহীদদের।…যেমন ধর, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা আমার পক্ষে প্রমাণ করা খুবই সহজ যে বৈশিষ্ট্যহীন মোটা লেখাই সেরা সাহিত্য, কারণ সকলেই তা বুঝতে পারে। অপরপক্ষে যে-লেখাতে কোনো রকম স্বকীয়তা অথবা উদ্ভাবনার আভাসমাত্র বর্তমান, তাকে বিপজ্জনক, নির্বোধ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বর্জন করা উচিত।…ভব্য এবং জনপ্রিয় বলে স্বীকৃতি পাবার জন্য যে সব কথা সমাজে বারবার বলা জরুরী, অক্ষরের ক্রম-অনুসারে সম্ভাব্য বিষয়ের ওপরে তেমনি প্রতিটি কথা এই অভিধানে স্থান পাবে।"[৮]

এই অভিধানের জন্য ফ্লোবেয়ার শুধু তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের কথোপকথন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন নি; নানা পত্রপত্রিকা, বই, বক্তৃতার রিপোর্ট ইত্যাদি ঘেঁটে তিনি অনেক মালমশলা যোগাড় করেছিলেন। লোয়ার বন্যায় ভেসে গেলে মেত্‌জ-এর বিশপ রায় দিলেন, লোকেরা রবিবারে গির্জায় যায় না আর খবরের কাগজগুলোর বড্ড বাড় বেড়েছে বলেই এই দুর্বিপাক (বিহারের ভূমিকম্পের পরে গান্ধীজীও এমনিতর এক 'দার্শনিক' ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন)। কথাটা তখনি ফ্লোবেয়ারের ফোলিওতে জায়গা পেল। সাঁ-পিএর তাঁর "প্রকৃতিবিদ্যা" গ্রন্থে লিখলেন: "প্রকৃতি তরমুজকে খোপে খোপে ভাগ করেছে যাতে পরিবারের সকলে মিলে তা ভাগ করে খেতে পারে; আর

চালকুমড়োর সৃষ্টি পাড়াপড়শীর সঙ্গে একত্রে আস্বাদ করার জন্য। তবেই বুঝুন, প্রকৃতির কী সুবিবেচনা।" ফ্লোবেয়ারের অভিধানে সুতরাং আর একটি শব্দ বাড়ল। মোপাসাঁ লিখেছেন, এইধরনের নির্বোধ উক্তি আবিষ্কারে ফ্লোবেয়ারের বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল। এজরা পাউণ্ড একটি প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, এই দক্ষতার ব্যাপারে জেমস জয়েস ফ্লোবেয়ারের একজন উপযুক্ত উত্তরসাধক।[৯]

ন'বছর বয়স থেকে ফ্লোবেয়ার এই সংগ্রহ শুরু করেছিলেন; উনষাট বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তখনো এই সংগ্রহ সমাপ্ত হয়নি। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে রাউল দুভালকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন: "বন্ধু, তুমি বলেছ, মূঢ়তা সর্বজনীন। সে কথা আমার চাইতে কে ভাল জানে। সেই সর্বব্যাপী নির্বুদ্ধিতাই আমাদের একমাত্র শত্রু। আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে আমি এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চাই। আমি যে বইটি লিখছি সেটির অপর নামকরণ করা যেতে পারে: মানবীয় মূঢ়তার বিশ্বকোষ।"[১০]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্লোবেয়ার তাঁর এই পরিকল্পনাকে একটি গ্রন্থের আকারে রূপ দিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে তাঁর সংগৃহীত মালমশলার কিছুটা "বুভার এ পেকুশে" উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রহ করা এই মালমশলাকে একত্র করে টীকাটিপ্পনী সমেত গ্রন্থাকারে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা ফেরায়ার, ওবিএ এবং ফ্লক সাহেবদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। যদিচ এ সঙ্কলনে মূঢ়তার উদাহরণগুলি উনিশ শতকের ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই সংগৃহীত, তবু বইটি পড়ার পর সন্দেহ থাকে না যে এজাতীয় মূঢ়তা কোনো দেশ কাল অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। "আবেলার: তাঁর দর্শন অথবা কোনো গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় থাকার প্রয়োজন নেই। শুধু তাঁর অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ে সপ্রতিভ ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট।" "আর্কিমেডিস: নাম শোনামাত্র বলবে, ইউরেকা।" "ভিত্তির সমাজের ভিত্তি হোল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, আইন মেনে চলা। এর কোনোটি সম্বন্ধে কেউ কোনো প্রশ্ন তুললেই উত্তেজিত হয়ে তাকে আক্রমণ করবে।" "বেঠোফেন: এঁর কোনো সঙ্গীত বাজানো মাত্র ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।" "ক্লাসিক্‌স্: যেসব গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় থাকা উচিত।" "গ্রামাঞ্চল: গ্রামবাসী শহরবাসীর থেকে অনেক ভাল; তাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করবে।" "সমালোচক: সব জানে, সব পড়েছে, সব দেখেছে। তবে তার কোনো

মত যদি তোমার অপছন্দ হয়, তাহালে তাকে হিজড়ে বলে গাল পাড়বে।" "ডারউইন : যে বলেছিল, বাঁদর থেকে মানুষের উৎপত্তি।" "দেকার্ত : 'ভাবি, সুতরাং আছি'।" "ভক্তি : অন্যদের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব নিয়ে অভিযোগ করবে। এদিক দিয়ে আমরা কুকুরদের থেকে নিকৃষ্ট।" "শব-ব্যবচ্ছেদ : মহান মৃত্যুর অবমাণনা"—"অভিধান : অজ্ঞ ব্যক্তির পাঠ্য।" "কুকুর : প্রভুকে রক্ষা করার জন্যই এদের সৃষ্টি। মানুষের সেরা বন্ধু।" "সন্দেহ : নাস্তিকের চাইতেও খারাপ।" "ভোরে ওঠা : সাধুতার লক্ষণ। যে-লোক রাত চারটেয় শুয়ে সকাল আটটায় ওঠে, সে কুঁড়ে; কিন্তু যে-জন রাত ন'টায় ঘুমিয়ে ভোর পাঁচটায় ওঠে, সে খুব পরিশ্রমী।" "মুখ : আত্মার আরশী।" "জাতীয় পাতাকা : দেখামাত্র বুকের রক্ত উচ্ছল হয়ে ওঠে।" "ফরাসী জাত : পৃথিবীর সেরা জাত।" "কিচিমিচি : বিদেশীদের কথাবার্তা।" "পৌত্তলিক : নরভুক।" "ঝি : সব ঝিরাই আসলে বেশ্যা। আজকাল ঝি পাওয়া শক্ত।" "লজ্জা : স্ত্রীলোকের সব চাইতে মূল্যবান ভূষণ।" "মেকিয়াভেলী : কেউ তার লেখা পড়ে নি, কিন্তু লোকটা মহা পাজী। "মধ্যরাত্রি : নীতিসঙ্গত সম্ভোগ মাঝরাতের আগে পর্যন্ত করা চলে। তারপর করলেই নীতিবিগর্হিত।" "নিগ্রো : কোন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করতে হলে নিগ্রোদের মত ভাঙ্গা-ফরাসীতে কথা বলা বিধেয়। নিগ্রোদের থুতু সাদা, এ এক মহাবিস্ময়ের ব্যাপার। তারা ভাঙ্গা-ফরাসীই বা কি করে উচ্চারণ করে।" "প্রয়োগ : তত্ত্বের চাইতে মূল্যবান।" "ধর্ম : সমাজের অন্যতম ভিত্তি। নীচু শ্রেণীর লোকেদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে বেশী ধার্মিকতা ভাল নয়। আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম এই কথাটা খুব ভক্তিগদগদ স্বরে উচ্চার্য।"

আর উদ্ধৃতি বাড়াবো না। কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকা বইটি সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। তবে যে-কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল তা থেকে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, মূঢ়তার বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রামে ফ্লোবেয়ার প্রায় পক্ষপাতহীন, তাঁর ব্যঙ্গ কোনো রকমের নির্বুদ্ধিতাকেই রেয়াৎ করে নি। তাঁর বৈনাশিকতা সর্বগ্রাসী। অপরপক্ষে ফ্লোবেয়ার বিশ্বাস করতেন যে শিল্পসাধনায় সিদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত হোল শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন। তাঁর উপন্যাসে এ চেষ্টা স্পষ্ট; এই অভিধানে তিনি আপনাকে অতি সযত্নে প্রচ্ছন্ন রেখে অন্য মানুষদের কথাতেই তাদের শূন্যগর্ভতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাঁচ

তবু বইটি পড়ে দুটি প্রশ্ন মনে আসে। প্রচলিত ধারণাগুলি অন্যদের কাছ থেকে আহরণ করা হয়েছে বটে; কিন্তু সেই আহরণের মধ্যে সংকলয়িতার ব্যক্তিত্ব এবং জীবনদর্শনের সক্রিয় উপস্থিতি কি আমরা পদে পদে অনুভব করি না? এমন একটি অভিধান বা বিশ্বকোষ ফ্লোবেয়ার ভিন্ন আর কেউ সঙ্কলন করতে পারতেন, ভাবা শক্ত। সুতরাং এই অভিধানকে নৈর্ব্যক্তিক বলা কতদূর সঙ্গত? দ্বিতীয়ত, যদিচ ফ্লোবেয়ারের কল্পনায় মূঢ়তা এবং মনুষ্যত্ব অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, তবু এই অভিধান সঙ্কলনের অধ্যবসায়ী প্রয়াস কি প্রমাণ করে না যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে তাঁর একটা অবচেতন কিন্তু সুগভীর প্রত্যাশা ছিল? মানুষ যদি অবিমিশ্রভাবে নির্বোধ জীব হয়, তবে এ অভিধান কার উদ্দেশ্যে রচিত? এর মূঢ় কৌতুকরসের যাঁরা সম্ভাব্য সম্ভোক্তা তাঁদের উপস্থিতির দ্বারাই কি ফ্লোবেয়ারী বৈনাশিকতা আতিশয্যদুষ্ট প্রমাণিত হয় না? ফ্লোবেয়ার এবং তাঁর আধুনিক উত্তরসাধকবৃন্দ মানুষের খণ্ডরূপকেই কি তার পূর্ণ সত্তা ভেবে ভুল করেন নি? শিল্পী এবং ভাবুকদের অস্তিত্ব এবং তাঁদের কল্পনা, জিজ্ঞাসা এবং সৃষ্টি থেকেই কি আমরা মানুষ সম্পর্কে সেই ভরসার সমর্থন পাইনা যে ভরসাকে ফ্লোবেয়ার এই বিশ্বকোষে উচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন?

স্রষ্টা বনাম সৃষ্টি : ব্রেখ্‌ট্-এর একটি নাটক

সাহিত্য যদি হয় ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে সাহিত্যের সবচাইতে বড় শত্রু হোল মতবাদ বা ইডিওলজী। কারণ মতবাদমাত্রই গুটিকয়েক স্থির সিদ্ধান্তের মধ্যে এই বিচিত্র, পরিবর্তনশীল এবং বহুবেধ অস্তিত্বকে ছকে ফেলতে উদ্যোগী। মতবাদের কাছে প্রথম বলি জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় বলি কল্পনা, তৃতীয় বলি অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান-আহরণের সামর্থ্য। মতবাদগ্রস্ত মন সংসারে যা-কিছু অপ্রত্যাশিত, অভিনব, এবং সেকারণে বিস্ময়কর, তাকেই অবান্তর, নিরর্থ অথবা মতিভ্রমজাত মায়া বলে উড়িয়ে দেয়। অথচ সামান্যের মধ্যে অনন্যের আবিষ্কার অথবা অভ্যাস থেকে উদ্ভাবনায় উত্তরণ ছাড়া সাহিত্য অকল্পনীয়। ফলত সাহিত্যিকের পক্ষে মতবাদে আশ্রয় নেওয়া আর বাঘের পক্ষে বোষ্টম বনা, প্রায় একই ব্যাপার। ওটা হয় স্রেফ ভান, আর না হলে আত্মহত্যা।

এক সময়ে পৃথিবীর বেশীরভাগ সভ্যদেশে মতবাদের প্রধান রূপ ছিল ধর্মশাস্ত্র। বলা বাহুল্য, ধর্মবোধ এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। ধর্মের প্রধান উৎস অপরোক্ষানুভূতি; এবং যতক্ষণ এ উৎস না শুকিয়ে যায়, ততক্ষণ ধর্মবোধ এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী নয়। কবীর, চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর বিস্তর উদাহরণ বর্তমান। এঁরা ধার্মিক হয়েও কোনো নির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন না। অপরপক্ষে ধর্মশাস্ত্রের প্রধান লক্ষণ হোল গুটিকয়েক প্রশ্নোর্দ্ধ প্রত্যয়ের দ্বারা অস্তিত্বের সর্বাত্মক ব্যাখ্যার অপচেষ্টা। ফলে যখনই কোনো সভ্যতায় ধর্মশাস্ত্রের প্রতাপ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনি সেখানে মানুষের সৃজনশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে। এপ্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের কথা সহজেই স্মরণে আসে।

ধর্মবোধ এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব আজো পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু এযুগে মতবাদের অন্য আরো রূপও দেখা যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপে যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে একটি হোল ফ্যাসিজ্‌ম্, অন্যটি কম্যুনিজ্‌ম্। এদের মধ্যে প্রথমটি সাহিত্যের কী সর্বনাশ

ঘটিয়েছিল, মুসোলিনীর আমলে ইতালী এবং হিটলারের আমলে জার্মানীর বিবরণ পড়লেই তা জানা যায়। মৌনব্রত, কারাবাস, মৃত্যু অথবা নির্বাসন —এই ছিল বিবেকবান্ সাহিত্যিকদের সামনে বাছাই করার বিকল্প-মাত্র। অপর পক্ষে ইয়োরোপে একদা যেসব সাহিত্যিক কম্যুনিজ্‌মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আজ তাঁদের প্রায় সকলেই উক্ত মতবাদের বিরূপ সমালোচক। এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে উক্ত মতবাদের প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে রুশ ভাষায় সৃষ্টিশীল রচনা এখন প্রায় অতীত-স্মৃতিতে পর্যবসিত। মুখে মানুন বা নাই মানুন সাহিত্যানুরাগী কমুনিস্টরা তিরিশের দশক থেকে রুশ সাহিত্যের নিরুপস্থ এবং অপজাত দুর্দশার কথা জানেন। এমন কি সাময়িকভাবে এ কথা স্বীকৃতও হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে শোলোকভ, কাভেরিন, বাবুগোলৎজ্, আলিগার, ওভেচ্‌কিন প্রমুখ অনেক লেখকই সাম্প্রতিক রুশ-সাহিত্যের মুমূর্ষু দশার উল্লেখ করে আত্মবিলাপ করেছিলেন।[১] কিন্তু বিলাপ বিলাপই; পরে তাও নিষিদ্ধ হয়েছে।

মতবাদের খপ্পর থেকে না বেরোতে পারা পর্যন্ত সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিয়মকে প্রমাণ করার জন্যই বোধহয় মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা দেয়। দান্তের কল্পনার ওপরে টমাস আকুইনাসের ধর্মশাস্ত্রের গভীর প্রভাব ভুবনবিদিত; কম্যুনিস্ট্ মতবাদ ম্যাক্‌সিম গোর্কির জীবনবোধের ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অথচ যেসব পাঠক খ্রীষ্টানও নন, কম্যুনিস্টও নন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে দান্তে এবং গোর্কি উভয়েই মহৎ লেখক। ব্যাপারটার নানাভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব। আমার কাছে যে-তিনটি কারণ প্রধান মনে হয়, তাদেরই উল্লেখ করি। প্রথমত, বিশেষ মতবাদে আস্থাশীল হয়েও উক্ত লেখকেরা আপন আপন কল্পনার স্বাধীনতাকে খর্ব করেন নি। ব্রুনো নার্দি বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, দান্তের চিন্তা টমিজ্‌ম্-এর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এবং গোর্কির "ক্লিম্ স্যাম্‌গিন" উপন্যাস গোঁড়া কম্যুনিস্ট্ মতবাদের নির্দেশকে অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করেছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাপারটা পুরোপুরি সজ্ঞান মনের ক্রিয়া নয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সাহিত্যিকের সচেতন উদ্দেশ্য অবচেতন নানা বৃত্তি, আবেগ এবং অনুভূতির রসায়নে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যাঁর সাহিত্যপ্রেরণা দুর্বল তিনি হয়ত উদ্দেশ্যকে আগাগোড়া আঁকড়ে ধরে থাকতে

পারেন; কিন্তু তার ফলে তাঁর রচনায় প্রচারক অথবা সাংবাদিকের লক্ষণ ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। স্রষ্টার অবচেতন থেকে সম্ভোক্তার অবচেতনে অনুরণন ওঠার ওপরে সাহিত্যের রস এবং ব্যঞ্জনা অনেকটা নির্ভর করে। প্রেরণার অবচেতন দিকটি লক্ষ্য করে গ্রীক কবি পিণ্ডার লিখেছিলেন, কাব্যসৃষ্টির আগে কবি স্বয়ং জানেন না সৃষ্টির শেষে তিনি কোথায় গিয়ে পৌঁছবেন। ফলে একজন সাহিত্যিক কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে আশ্রয় নিলেও তাঁর মধ্যে যদি প্রেরণার শক্তি প্রবল হয়, তাহলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মতবাদের প্রভাব তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়ত, সাহিত্য ব্যাপারটা শুধু সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ নয়; তার একটা সম্ভোগের দিক আছে। স্রষ্টার কল্পনার সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের অনুভূতির যোগসাধন ঘটলে তবেই রসের উদ্ভব হয়। কিন্তু সহৃদয় পাঠক নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নন; আস্বাদনের কালে পাঠকের কল্পনাও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সার্থক সাহিত্য-কর্মের মধ্যে রসিক পাঠক এমন অনেক সম্পদ আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন, যে-বিষয়ে স্বয়ং লেখকও হয়ত সচেতন নন। তার ফলে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনে একই লেখার বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়। রসিক পাঠকের পক্ষে সে-কারণে কোনো লেখকের মতবাদকে সরাসরি বর্জন করেও ঐ লেখকের রচনার অন্য গূঢ় সম্পদ আবিষ্কার এবং উপভোগ করা অকল্পনীয় নয়। অবশ্য যদি সে রচনায় সত্যিই কোনো সম্পদ নিহিত থাকে।

দুই

আমার বক্তব্যের সমর্থনে পশ্চিমী সাহিত্য থেকে নানাবিধ উদাহরণ দেওয়া চলত, কিন্তু আপাতত এ প্রসঙ্গে শুধু একজন বিখ্যাত আধুনিক সাহিত্যিকের একটি স্বল্পখ্যাত রচনার উল্লেখ করব। বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্-এর নাম শিক্ষিত বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অপরিচিত নয়। বাংলাদেশের বেশীরভাগ সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের ওপরে এক সময়ে কম্যুনিস্ট মতবাদের খুব প্রভাব পড়েছিল; এবং তাদেরই মুখে মুখে এদেশে ব্রেখ্‌ট্-এর নাম প্রচার লাভ করেছে। শুধু নাট্যকার নয়, নাট্যশাস্ত্রী এবং নাট্যমঞ্চের পরিচালক বা ডাইরেক্টর হিশেবেও ব্রেখ্‌ট্-এর প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর। অথচ মজার ব্যাপার হোল, এদেশে যে-সব "প্রগতিশীল" নাট্যামোদী

ব্রেখ্‌ট্‌-এর নামে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তাঁদের অনেকে আবার একই সঙ্গে স্টানিস্লাভ্‌স্কির থিয়েটাররীতির বিশেষ অনুরাগী। ব্রেখ্‌ট্‌ আজীবন স্টানিস্লাভ্‌স্কির রীতির বিরোধিতা করেছেন। নাটক এবং প্রযোজনা সম্পর্কে দুজনের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। রাজা রবিবর্মা এবং রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে যতখানি ব্যবধান, নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে যতটা ফারাক, এঁদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব তার চাইতে কম নয়।

যাইহোক, এখানে আমরা শুধু ব্রেখ্‌ট্‌-এর একটি নাটক নিয়ে আলোচনা করব। তার পূর্বে তাঁর জীবন এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। আর্ন্‌স্ট্‌ টোলারকে বাদ দিলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এতাবৎকালের মধ্যে জার্মান ভাষায় ব্রেখ্‌ট্‌-এর মত শক্তিমান আর একজন নাট্যকার চোখে পড়ে না। ব্রেখ্‌ট্‌-এর মতবাদের যাঁরা কড়া সমালোচক তাঁরাও নাট্যকার হিশেবে তাঁর অসামান্য প্রতিভার কদর করে থাকেন। নাটক রচনা এবং প্রযোজনা ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশে কমবেশী প্রভাব ফেলেছে। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে পারী শহরে ১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক থিয়েটার উৎসবে "ককেশীয় খড়ির গণ্ডী" নামে তাঁর নাটকটির অভিনয় হওয়ার পর সমস্ত সমালোচক তাঁকে একবাক্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন বলে ঘোষণা করেন।[২]

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে আউগ্‌সবুর্গ শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একটা কাগজের কারখানার মালিক। ব্রেখ্‌ট্‌ কিছুকাল ডাক্তারী পড়েন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁকে সামরিক নার্স হিশেবে কাজ করতে হয়। তাঁর প্রথম রচনা "বাল" (Baal, রচনাকাল ১৯২০) প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দিবা-রাত্রির কাব্যের" মত তাঁরও এই অল্পবয়সের দুঃসাহসী রচনার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে 'যে অদম্য লিরিক প্রেরণাকে ব্রেখ্‌ট্‌ কঠিন অভিনিবেশ সহকারে দমন করার চেষ্টা করেছিলেন, এই নাটকটির মধ্যে তার প্রবল এবং সমৃদ্ধ প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে। এই লেখাটি থেকে শুরু করে "ড্রাইগ্রোশেন্‌-ওপার" (তিন পয়সার অপেরা) পর্যন্ত সমস্ত লেখার মধ্যে যে কবিমানস প্রকাশ পেয়েছে তা একদিকে যেমন ধ্বংসের অনিবার্যতা বোধের ফলে আর্ত, অন্যদিকে তেমনি জৈব অস্তিত্বের প্রতি আকর্ষণে দেদীপ্যমান। মেজাজ এবং রচনারীতির দিক থেকে এই যুগে তাঁর নিকটতম আত্মীয় হলেন পনের শতকের

ফরাসী কবি ফ্রাঁসোয়া ভিলঁ। তাছাড়া বোদ্‌লেয়ার এবং র‍্যাঁবো, জার্মান লোকগাথা এবং প্রথম যুদ্ধোত্তর মার্কিন বোহেমিয়ান সাহিত্যিকদের লেখাও তাঁর ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। "ভ্রষ্ট দেবতা" বাল হলেন বিশের দশকের আশাভরসাহীন অথচ তীব্র অনুভূতিশীল পশ্চিমী তরুণদের প্রতিভূ। সুরা, সঙ্গীত আর নারীদেহ, সভ্য ভণ্ডামির বিরুদ্ধে উচ্চনাদ বিদ্রোহ আর বোবা প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীর যোগ—আর এই ভাবে নিজের অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ভুলে থাকবার প্রবল চেষ্টা—এই হোল "বাল্" নাটকের মূল সুর।

ব্রেখ্‌ট্-এর দ্বিতীয় নাটক "রাতের দামামা"-য় (Trommeln in der Nacht, ১৯২২) যুদ্ধোত্তর যুগের শূন্যতাবোধ তীব্র ব্যঙ্গের আকার নিয়েছে। দেশাত্মবোধ, আত্মত্যাগ, সামরিক শৌর্যবৃদ্ধি ইত্যাদি বড় বড় বুলির আড়ালে যে সন্ত্রস্ত, নির্বিবেক স্বার্থপরতা আপনাকে লুকিয়ে রেখেছিল, নাট্যকার নিষ্ঠুর প্রহসনের আঘাতে তার মুখোস খুলে দিয়েছেন। যে সৈনিককে মৃত ভেবে সবাই ভুলে গিয়েছিল, যুদ্ধের পর অপ্রত্যাশিত ভাবে সে ঘরে ফিরে আবিষ্কার করল যে ইতিমধ্যে জনৈক চোরাকারবারীর ঔরসে তার বাগ্‌দত্তা বধূর গর্ভ-সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে মোটেই কিছু বিপ্লবী দলে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করল না। সব আদর্শবাদই যে আসলে বোকা-দের ধাপ্পা দেবার জন্য কল্পিত, এ বিষয়ে এখন সে সুনিশ্চিত। প্রতিবাদে নিরুৎসুক এবং মনুষ্যত্বে আস্থাহীন এই সৈনিক সুতরাং নির্বিকার চিত্তে অপরের উৎসৃষ্ট গর্ভবতী নারীকে নিয়ে রওনা হল ঘরের দিকে।

বিশের দশকে লেখা ব্রেখট্-এর সমস্ত রচনার মধ্যে শুভ-নাস্তিক্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব অথবা হিংসা এবং শত্রুতা, কোনো ভাবেই মানুষ আপনার একাকিত্ব অতিক্রম করে অপর মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করতে পারে না। Im Dickicht der Stadte (শহুরে জঙ্গলে) নাটকের এটাই মূল প্রতিপাদ্য। অপর পক্ষে "মানুষ মানুষই" (Mann ist Mann) প্রহসনে তিনি দেখবার চেষ্টা করেছেন, কোন মানুষই অপর মানুষের কাছে এমন মূল্যবান নয় যে তার স্থান অন্য মানুষকে দিয়ে পূরণ করা যায় না। আসলে মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় তার মুখোস ; যখন যে মুখোসটির দরকার সেটি পরিয়ে দিলে যে কোনো মানুষকে যে কোনো মানুষ বলে চালানো চলে। এই নাটকের নায়ক ডকমজুর গালি গে একদিন দুপুরে বাজার করতে বেরিয়ে-

ছিল ; পথে সে পড়ে গেল একদল সৈন্যের সামনাসামনি। সেই দলের একজন সৈনিকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ; এরা গে-কে ধরে নিয়ে গিয়ে ইউনিফর্ম পরিয়ে তাকে হারানো সৈনিকের বদলি চালিয়ে দিল। অর্থাৎ ব্রেখ্‌ট্-এর ভাষায় সংখ্যা ঠিক থাকলেই হোল, সূর্য কার ওপরে আলো ছড়ায় তাতে কিছুই আসে যায় না (Es ist ganz egal auf wen die Sonne Schien)[৩]।

"মাহাগনী" (Mahagonny) নাটকে সার্বিক নাস্তিক্যের আর এক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই কাল্পনিক শহরের মানুষেরা জুয়া, মদ, মেয়েলোক, মারপিট, হৈহল্লার মধ্যে ডুবে আছে। আলাস্কার সরলমতি কাঠুরে জনি এখানে এল ফূর্তির খোঁজে। আর তারপর তার সারাজীবনের সঞ্চয় উড়িয়ে দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করল যে সংসারে এমন কিছু নেই যা মানুষ ধরে রাখতে পারে (Da ist nicht, woran man sich halten kann)।[৪] সত্য, শিব, সুন্দর, সততা, প্রেম, ত্যাগ, এ সব শুধু বুলি।

ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা যে অনতিক্রম্য, অপর মানুষের চোখে প্রতি মানুষই যে মুখোস মাত্র, সংসারে যে কোনো কিছুই নেই যা নিত্য, যাকে আশ্রয় করে মানুষের জীবন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে,—এই দুঃসহ উপলব্ধি শুধু ব্রেখ্‌ট্-এর প্রথম যুগের নাটকগুলিতে নয়, তাঁর কাব্যেও নানভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর প্রথম ও প্রধান কাব্যসঙ্কলন Die Hauspostille (পারিবারিক প্রার্থনা গ্রন্থ) প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। নাস্তিকের আবার কী প্রার্থনা? প্রার্থনা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য, যাতে পরিবর্তনের স্রোতে নিজেকে নিশ্চিন্তে ভাসিয়ে দিয়ে ব্যক্তি তার নিঃসঙ্গতাকে ভুলে যেতে পারে। গলিত শবদেহ রূপান্তরিত হচ্ছে পুষ্পিত তরুশাখায়। এর কোনটিই নিত্য নয়, নিত্য শুধু এই ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া। প্রার্থনা গর্ভের অন্ধকার শান্তিতে ফিরে যাওয়ার জন্য, যেখানে নিজের স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় মানুষ অশান্তি ডেকে আনে না। আইনকানুন, নীতি, আদর্শ, এসব আঁকড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা বৃথা। গাছপালা, জীবজন্তুর মত অবক্ষয়ের অনিবার্যতাকে সহজে মেনে নেওয়াই প্রাজ্ঞতার পরিচয়।

কিন্তু মানুষ তা মানতে পারে না, এবং ব্রেখ্‌ট্ সেকথা ভালভাবেই জানতেন। এ জ্ঞান পরোক্ষ নয়, নিজের উপলব্ধি থেকে পাওয়া। কবির সৃষ্টিকর্ম ধ্বংসের অনিবার্যতার বিরুদ্ধে চৈতন্যের প্রতিবাদ। আর তাই ব্রেখ্‌ট্-এর নাটকে এবং কবিতায় নিয়তিকে মেনে নেওয়ার প্রকৃষ্টতা ঘোষিত হলেও তাদের

প্রাণশক্তির উৎস হোল এই প্রতিবাদের উৎক্ষেপ এবং যন্ত্রণা, কারণ কবির মনে সে যুগে সন্দেহ ছিল না যে এই প্রতিবাদের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। তবু প্রতিবাদ না করে উপায় নেই, কারণ তিনি কবি। যে মানুষদের মধ্যে এই যন্ত্রণাবোধ নেই, তাদের তিনি হিংস্র বিদ্রূপে বারবার আঘাত করেছেন। অপর পক্ষে যারা ধর্ম এবং নীতিকথার বুলি শুনিয়ে মানুষের ব্যর্থতাবোধকে ভোঁতা করে দিতে চান, তাঁদের তিনি ক্ষমা করেন নি। এই যুগে লেখা তাঁর সব চাইতে বিখ্যাত রচনা হোল "তিন পয়সার অপেরা" (Die Dreigrcschenoper, ১৯২৮)। চোর, বেশ্যা, ঠগ এরাই হোল নাটকের কুশীলব। বিখ্যাত সুরকার কুর্ট ভাইল এই অপেরার সঙ্গীত রচনা করেন। বুলিসর্বস্ব সভ্যতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে ব্রেখ্‌ট্‌ এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে মানুষের সঙ্গে জন্তুর পার্থক্য শুধু এইটুকু যে মানুষ বড় বড় কথা দিয়ে নিজেকে এবং অপরকে ঠকায়, জন্তুরা তা করে না। এ নাটকটির একটি বিখ্যাত উক্তির মধ্যে সে যুগের শুভ-নাস্তিক ব্রেখ্‌ট্‌-এর বক্তব্য আকার পেয়েছে ; আগে ত চাই পেটঠাসা, তারপরে নীতিকথা (Erst kommt das Fressen, dann die Moral)।[৫] হ্বাইমার রিপাবলিকের পতনের যুগে ব্রেখ্‌ট্‌-এর এই ঘোষণা দলনির্বিশেষে তৎকালীন জার্মান তরুণদের মনে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। বিশের দশকের শেষদিকে জার্মানীর মন হিটলারী অভ্যুত্থানের জন্য কীভাবে তৈরি হয়ে উঠছিল, এই ঘোষণার মধ্যে কি তারি ইঙ্গিত চোখে পড়ে না ?

তিন

পোড়ো জমিতে ফসল ফলানোর আশায় এলিয়ট ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শূন্যতার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রেখ্‌ট্‌ অবশেষে মার্কস্‌বাদ অবলম্বন করলেন। ১৯২৭ সাল থেকেই তাঁর লেখায় মার্কস্‌বাদের কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায়। ১৯৩০ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফলে তাঁর নাটকগুলি ক্রমে প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে। কিন্তু মতবাদের বিষ তাঁর লিরিক প্রেরণা এবং শিল্পবোধকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীর্ণ করতে পারেনি। তবে মত-বাদে আশ্রয় নেওয়ার ফলে তাঁর নাটকে চরিত্র সৃষ্টি অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ নাটক প্রতীকধর্মী এবং তত্ত্বপ্রধান। তাদের মূল বক্তব্য হোল ব্যক্তির চাইতে সমাজ বড়, বিবেকের চাইতে ইতিহাসের নির্দেশ অনেক বেশী ক্ষমতাশীল। নাটকের মধ্যে নাটক, ঘটনার পাশাপাশি সেই ঘটনার বিশ্লেষণ

এবং মূল্যায়ন, প্রাচীন নাট্যরীতি অনুসরণে স্বগতোক্তি এবং কোরাসের সঙ্গীত-ব্যঞ্জিত ভাষা, মুখোসের আড়াল থেকে অভিনয়, সুপরিচিত প্রাচীন কাহিনীতে আধুনিক অর্থ আরোপ, শ্রোতাদের বিচারক হবার জন্য আহ্বান, ইত্যাদি বিবিধ রীতিপ্রকরণের সাহায্যে তিনি তাঁর পাঠক এবং দর্শক সম্প্রদায়কে উক্ত মতবাদে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই যুগের নাটকগুলির তিনি নামকরণ করেছিলেন শিক্ষামূলক রচনা (lehrstucke)। নিজের স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং দুর্মর লিরিক কবিসত্তাকে কঠিনভাবে সংযত করে তিনি এই নাটকগুলিতে কম্যুনিস্ট্ মতবাদের বিভিন্ন প্রত্যয় প্রচার করেছেন।

কিন্তু আগেই বলেছি লেখকের উদ্দেশ্য এবং তাঁর লেখার নিহিতার্থের মধ্যে সব সময়ে মিল নাও থাকতে পারে। ব্রেখ্ট্-এর এই যুগে লেখা যেটি শ্রেষ্ঠ নাটক সেটির কথা ধরা যাক। কাজ-চলা বাংলা তর্জমায় এটির নামকরণ করা যেতে পারে "ব্যবস্থা" অথবা "বিধান" (Die Massnahme, ১৯৩০)।[৬] ১৯২৭ সালে চীনে কমুনিস্ট্ পার্টির বিপ্লবপ্রচেষ্টার ব্যর্থতা এই নাটকটির আখ্যানবস্তু। এই ব্যর্থতার জন্য রুশ কম্যুনিস্ট্ পার্টির পরস্পরবিরোধী নির্দেশ মুখ্যত দায়ী। এই ব্যর্থতার ফলে অনেক কম্যুনিস্ট্ রুশনেতৃত্বের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তৎকালীন ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে রুশনেতৃত্বের দোষ ঢাকতে অনিচ্ছুক হওয়ার জন্য চীনা কম্যুনিস্ট্ পার্টির সাধারণ সম্পাদক চেন-তু-হ্সিউ-কে কমিণ্টার্নের কার্যকরী কমিটি থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই বিরোধীদের দমন করার জন্য রুশ নেতারা নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ব্রেখ্ট্-এর নাটকটি এই শাস্তিবিধানের সমর্থনে রচিত।[৭]

যবনিকা উঠলে আমরা দেখি পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত কোরাসের সামনে চারজন কম্যুনিস্ট্ কর্মী তাদের কাজের হিশেবনিকেশ পেশ করছে। এই হিশেবনিকেশের সূত্রে ইতিপূর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি দেখানো হয়। কর্মীরা কোরাসকে জানায় কাজের প্রয়োজনে তারা নিজেদের একজন কমরেডকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। কাজটা ঠিক হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তারা কোবাসের কাছে বিচারপ্রার্থী। তখন ঘটনাটা কীভাবে এবং কেন ঘটেছিল, কোরাস তা জানতে চায়। একটির পর একটি ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্য দিয়ে আমরা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হই।

প্রথম দৃশ্যে দেখি চীনের সীমান্তে পার্টির শিক্ষাশিবিরে রুশ থেকে পাঠানো এই কর্মীদের সঙ্গে একজন তরুণ চীনা কমরেড আলোচনা করছে। কর্মীরা

তাকে জানায় যে চীনের মজুরদের বিপ্লবী আদর্শে এবং কর্মপন্থায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের পাঠানো হয়েছে। তাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র "কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর ক খ গ"। দ্বিতীয় দৃশ্যে পার্টি শিক্ষাশিবিরের পরিচালক ঐ কর্মীদের এবং তরুণ কমরেডটিকে বিপ্লবী মতবাদের মূলসূত্রটি ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। "এখন থেকে তোমাদের আর কোনো ব্যক্তিসত্তা রইল না। তুমি এখন থেকে আর বার্লিনের কার্ল শ্মিট্‌ নও, কাজানের আনা কিএর্‌স্‌ক্‌ নও, মস্কোর পিটার সাভিচ নও। তোমাদের নাম নেই, পিতৃপরিচয় নেই। তোমরা এখন থেকে শুধু এক এক টুকরো শাদা কাগজ যার ওপরে বিপ্লব তার হুকুমনামা লিখে দেয়।" পরিচালক তখন প্রত্যেক কর্মীর মুখে একটি করে মুখোস এঁটে দেয়। কণ্ট্রোল-কোরাস এপর্যন্ত শোনার পর তাদের সমর্থন জানিয়ে প্রতিধ্বনি তোলে : "কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর যারা সৈনিক দরকারমত তারা সত্য বলতে পারে, সত্য না বলতে পারে, প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে, প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারে। তাদের শুধু একটি গুণ থাকাই যথেষ্ট ; তাদের হতে হবে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর একনিষ্ঠ সৈনিক।"

অতঃপর কর্মীরা চীনে প্রবেশ করে। তাদের প্রথম কাজ হোল একটি শহরতলীতে শ্রমিকদের শ্রেণীসচেতন করে তোলা। অভিজ্ঞ রুশ কর্মীরা তরুণ চীনে কমরেডকে সাবধান করে দেয়, এপথে মায়ামমতার কোনো স্থান নেই। স্থানীয় কুলিরা নদী থেকে একটা ভারী নৌকো ডাঙায় তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা বারবার পা পিছলে কাদায় পড়ে যাচ্ছিল। তরুণ কমরেড প্রথমে কাদার মধ্যে একটা বড় পাথর রেখে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে সে বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে চায়। ফলে মালিকরা তাদের বিপ্লববাদী বলে চিনে ফেলে এবং তখন পুলিশের হাত এড়াবার জন্য তাদের সেখান থেকে পালাতে হয়। তারপর তারা কারখানায় গুপ্তভাবে প্রচারের কাজ শুরু করে। তরুণ কর্মীটিকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় যেন পুলিশের সঙ্গে কোনো গোলমালে সে না নিজেকে জড়ায়। কিন্তু এখানেও একদিন একটি মজুরকে এক পাহারাওয়ালা অকারণে নির্দয়ভাবে পিটছে দেখে তরুণ কমরেডটি আত্মবিস্মৃত হয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং সেখান থেকেও তাদের কেটে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

ইতিমধ্যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সেখানকার বিদেশী শাসনকর্তাদের

পদে পদে সঙ্ঘর্ষ ঘটছিল। কম্যুনিস্ট্‌রা ঠিক করে, এই সঙ্ঘর্ষের সুযোগে ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের জন্য তারা অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য সেখানকার সবচাইতে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীর কাছে তরুণ কমরেডকে প্রতিনিধি হিশেবে পাঠানো হয়। তাকে বলে দেওয়া হয় যেভাবেই হোক সে যেন ঐ চোরা কারবারীর সঙ্গে রফা করে অস্ত্রশস্ত্রের বন্দোবস্ত করে আসে। ব্যবসায়ীটি কমরেডকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। আলাপসূত্রে ব্যবসায়ী তাকে বলে, মানুষ আসলে কী তা আমি জানিনে। আমি শুধু জানি, বাজারে তার দাম কত। (Ich weiss nicht was ein Mensch ist, Ich kenne nur seinen preis). একথা শুনে তরুণ কমরেড উত্তেজিত হয়ে খাওয়া ফেলে টেবিল থেকে উঠে পড়ে। এতবড় নির্লজ্জ শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে কোনো কারণেই সহযোগিতা করতে সে প্রস্তুত নয়। তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিবেকবুদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীর সঙ্গে না হোল রফা, না পেল মজুররা অস্ত্রশস্ত্র। এপর্যন্ত শুনে কণ্ট্রোল-কোরাস গান ধরে: "অন্যায়ের উচ্ছেদ করার জন্য এমন কোন্ অন্যায় আছে, যা আমরা না করতে পারি ?··· পাঁকের মধ্যে ডুবে যাও, কসাইকেও বুকে টেনে নাও, কেননা দুনিয়াটাকে বদলাতে হবে, ইতিহাসের তাই নির্দেশ।"

যাই হোক, কম্যুনিস্ট্‌রা প্রস্তুত হবার আগেই দুর্ভিক্ষ এবং অত্যাচারের চাপে শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। তরুণ কমরেড চায় এই বিদ্রোহে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু পার্টির নির্দেশ এল, এখনো অবস্থা ঠিকমত তৈরি হয়নি, সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞ রুশ কর্মীরা তরুণ কমরেডকে আদেশ দেয়, বিদ্রোহীদের সে নিজে গিয়ে বোঝাক্ এখন বিদ্রোহ করা মূঢ়তা। চীনা কমরেড তাতে আপত্তি তোলায় তারা বোঝাল যে ব্যক্তির বিবেকের চাইতে পার্টির নির্দেশ অনেক বড়। কণ্ট্রোল-কোরাস অমনি "পার্টিস্তোত্র" পাঠ করে: "প্রত্যেক মানুষের মোটে এক জোড়া চোখ, আর পার্টি হোল সহস্রাক্ষ। ব্যক্তি দেখতে পায় একটা শহর। পার্টির নজরের মধ্যে আছে সাত সাতটা দেশ। ব্যক্তির মোটে একটা জীবন, এবং তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। পার্টির অসংখ্য জীবন এবং তার মৃত্যু নেই।" সুতরাং ব্যক্তির বিচারের কোন মূল্য নেই, কিন্তু পার্টি অভ্রান্ত।

তরুণ কমরেডের বিবেক এই সম্মিলিত মন্ত্রপাঠে সায় দেয়নি। সে

"কম্যুনিজ্‌মের ক খ গ" ছিঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "পার্টির হুকুমের চাইতে মানবতার দাবি অনেক বড়।" এই বলে সে তার মুখোস ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কোরাসের প্রশ্ন : তখন তোমরা কি করলে ?

চার কর্মী : গোধূলির আলোয় আমরা তার অনাবৃত মুখ দেখতে পেলাম। নিষ্পাপ, নিরাবরণ, মানবীয় সেই মুখ।···আমরা তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে রাস্তায় ফেলে দিলাম। তারপর তার অচেতন দেহ কুড়িয়ে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলাম।

শেষ দৃশ্যের নাম "বিধান"। কর্মীরা কোরাসকে বলল : তারপর আমরা সিদ্ধান্ত করলাম তাকে একেবারে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে। সুতরাং তখন তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হোল। আর তার দেহটাকে আমরা একটা চুনের গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম যাতে সে দেহ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে চুনের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

কোরাস : অন্য কোন উপায় ছিল না ?

চার কর্মী : না, অন্য কোন পথ ছিল না।···আমরা জানতাম হত্যা অন্যায়, কিন্তু আমরা তার চাইতেও ভালভাবে জানতাম যে, পৃথিবীকে বদলাবার প্রায়োজনে (die welt zu verandern) হত্যা না করা আরো বড় অন্যায়। সেই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শাস্তিবিধান ন্যায়সঙ্গত।

কোরাস : কিন্তু তরুণ কমরেড সেকথা বুঝতে পেরেছিল ?

কর্মীরা কোরাসকে জানায়, হ্যাঁ, মৃত্যুর আগে নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে স্বীকার করেছিল, সে ভ্রান্ত। পার্টির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে সে নিজের মৃত্যুকে স্বাগত করেছিল।

অতঃপর কোরাসের স্বস্তিবাচন। এবং তারপর যবনিকা।

নাটকটি যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ওপরের নিতান্ত অপটু সংক্ষিপ্তসার থেকে পাঠকরা আশা করি তা অনুমান করতে পারবেন। শুধু বিষয়বস্তুর গুরুত্বে নয়, ঘটনাসংস্থানের নৈপুণ্যে, কোরাসের গম্ভীর সঙ্গীত এবং প্রধান চরিত্রকটির আবেগক্ষিপ্র কথোপকথনে আমাদের মন গভীরভাবে বিচলিত না হয়ে পারে না। প্রতিভাবান্ কম্যুনিস্ট্ সুরকার হান্‌স আইস্‌লার এই নাটকটির জন্য যে বাদ্য-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এর আবেদন তার দ্বারা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ব্রেখ্‌ট্ যে উদ্দেশ্যে নাটকটি লিখেছিলেন, তা এখানে কতখানি সার্থক হয়েছে ? ব্রেখ্‌ট্ কম্যুনিস্ট্-মতাবলম্বী একথা যদি আমাদের না জানা থাকত,

তাহলে কি আমাদের মনে হত না যে কম্যুনিস্ট্ মতবাদের বীভৎস আত্মঘাতী রূপটিকে নাট্যকার এখানে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন? এবং তাঁর উদ্দেশ্য জানার পরও এ নাটকটি পড়ে আমরা কি কম্যুনিজ্‌ম্-এর ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেই সচেতন হয়ে উঠি না? কোয়েসলার তাঁর "ডার্কনেস অ্যাট মুন" উপন্যাসে অথবা সার্ত্‌র তাঁর "লে মেঁ সাল" নাটকে কম্যুনিজ্‌ম্-এর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কি এই ধরণেরই কথা বলেন নি? আমার ত "বিধান" নাটকটি পড়তে পড়তে বারবার রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"-এর কথা স্মরণে এসেছে। অথচ ব্রেখ্‌ট্ কোনদিনই কোয়েসলার কিম্বা সার্ত্‌র-এর মত কম্যুনিজ্‌ম্-এর বিরূপ সমালোচনা করেননি। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে কম্যুনিস্ট্ বলে ঘোষণা করে গেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টি এখানে স্রষ্টার সচেতন নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করেছে।

চার

ফলত কম্যুনিস্ট্‌রা মানুষকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢেলে গড়তে চাইলেও আসলে প্রতি মানুষই অন্য মানুষ থেকে পৃথক্, এবং (বর্তমান প্রসঙ্গে তার চাইতেও যেটি লক্ষণীয়) প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই অনেকগুলি বিভিন্ন, এমন কি পরস্পরবিরোধী, প্রবণতা বিদ্যমান। শিল্পীর অনুভূতি এবং কল্পনা তাঁর সৃজনপ্রেরণাকে যে পথে চালিত করছে, তাঁর অর্জিত সংস্কার অথবা সংগৃহীত সিদ্ধান্ত তা থেকে ভিন্নপথগামী হতে পারে। তিনি হয়ত সঙ্গতির প্রয়োজনে সিদ্ধান্তের কাছে অনুভূতি এবং কল্পনাকে বলি দেওয়ার সংকল্প করতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রেরণা যদি দুর্বল না হয় তাহলে এই আত্মঘাতী সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কম।

আমার বিশ্বাস ব্রেখ্‌ট্-এর ক্ষেত্রে তাঁর কবিকল্পনা প্রকাশ্যে মতবাদের শ্রেয়ত্ব মেনে নিয়েও সংগোপনে তার বিরোধিতা করেছিল। তিনি নিজে একথা না স্বীকার করলেও গোঁড়া কম্যুনিস্ট্‌রা এই বিরোধের খানিকটা আভাস পেয়েছিলেন। ফলে Die Massnahme যদিও পার্টির মত প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত, এবং যদিও এর নাটকীয় গুণ অনস্বীকার্য, তবু যতদূর জানি কোনো কম্যুনিস্ট্ রাষ্ট্রে অথবা কোনো কম্যুনিস্ট্ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এ নাটকটি অভিনীত হয় নি। এই যুগে লেখা তাঁর নাকি একটিমাত্র নাটক এযাবৎ রুশভাষায় মস্কো পাব্‌লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ফাসিজ্‌ম্

সম্বন্ধে লেখা রচনাটি (Die Rundkopfe und die Spitzkopfe : গোলমাথা আর ছুঁচলোমাথা) তাঁর সবচাইতে দুর্বল নাটক।

নাৎসীরা ক্ষমতায় আসার পর আরো অনেকের মত ব্রেখ্‌ট্‌ জার্মানী থেকে পালিয়ে যান। তিনি কিন্তু তাঁর সহকর্মী অন্যান্য জার্মান কম্যুনিস্ট্‌ সাহিত্যিকদের অনুসরণে মস্কোতে আশ্রয় খোঁজেন নি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি নির্বাসন যাপন করেছেন ডেনমার্কের স্বেন্‌ড্‌বর্গ শহরে। হিটলার ডেনমার্ক আক্রমণ করলে তিনি প্রথমে ফিনল্যাণ্ডে এবং তারপর সেখান থেকে ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ায় ডেরা বাঁধেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ফিরে আসেন। মৃত্যুর পূর্বে শেষ আটবছর তাঁর এখানেই কেটেছিল।

"বিধান" নাটকটির মধ্যে প্রত্যয় এবং প্রেরণার যে বিরোধের কথা বলেছি, হিট্‌লারী অভ্যুত্থানের সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বার বার তার লক্ষণ চোখে পড়ে। কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর প্রবল সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ব্রেখ্‌ট্‌ নির্বাসন-যাপনের স্থান হিশেবে রাশিয়ার পরিবর্তে ডেনমার্ক এবং আমেরিকাকে বেছে নিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস তার কারণ তিনি অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছিলেন যে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে তাঁর প্রেরণাকে বাইরে থেকে জোর করে দমন করা হবে ; এবং কম্যুনিস্ট মতবাদের ওপরে তাঁর যতই আস্থা থাক, প্রেরণার দাবীকে একেবারে অস্বীকার করার অর্থ শিল্পীর আত্মহত্যা। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ সত্ত্বেও তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে সেসমাজে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক বেশী, এবং সেখানে ধীরেসুস্থে শিল্পীর অন্তর্বিরোধ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অধিকার স্বীকৃত। ফলে ফিনল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় প্রবেশ এত সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্যাণ্টা মনিকায় স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন। পূর্ব জার্মানীতে ফিরে যাওয়ার পর যতদূর জানি ব্রেখ্‌ট্‌ আর নতুন কোনো নাটক রচনা করেন নি। শেষ কয়েক বছর তিনি মুখ্যত প্রযোজনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। অপরপক্ষে এই সময়ে পূর্ব-জার্মানীর কম্যুনিস্ট সরকার এবং পার্টির চাপে তাঁকে নিজের পুরোনো নাটকগুলিতে নানা পরিবর্তন করতে হয়েছে। কম্যুনিস্ট মতবাদ অবশ্য তিনি কোনো দিনই প্রকাশ্যে ত্যাগ করেন নি। কিন্তু শেষের দিকে কম্যুনিস্ট সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ, ১৯৫৬ সালে জানুয়ারী মাসে পূর্ব জার্মান লেখকদের কংগ্রেসে তিনি

অভিযোগ করেন যে কম্যুনিস্ট্ জার্মানীতে তাঁর স্বরচিত নাটকের অভিনয় একরকম প্রায় নিষিদ্ধ।[৮]

এই প্রসঙ্গে ব্রেখ্‌ট্-এর সাহিত্যিক জীবনের একটি তথ্য বিশেষ অর্থপূর্ণ। "মাহাগনী", "তিন পয়সার অপেরা" এবং "বিধান" বাদ দিলে তাঁর প্রায় সব কটি উৎকৃষ্ট নাটক জার্মানী থেকে নির্বাসনের কালে রচিত। "মাদার কারেজ" (Mutter Courage), "লুকুল্লুস্-এর বিচার" (Das Verhoer des Lukullus), "গ্যালিলিওর জীবন" (Leben des Galilei), "দি গুড্ ওম্যান্ অব সেট্‌জুয়ান" এবং "দি ককেসিয়ান চক্ সার্কল্" (শেষোক্ত দুটির মূল জার্মান সংস্করণ বেরোবার কয়েক বছর আগেই এরিক বেণ্টলি এবং মায়া আপেলমান কৃত ইংরেজী তর্জমা মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়)—তাঁর এই শ্রেষ্ঠ নাটক ক'টির মধ্যে মার্ক্সীয় মতবাদের প্রভাব অনুপস্থিত নয়। কিন্তু সেই প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে ব্রেখট্-এর কল্পনা যে ভাবে স্ফূর্তি লাভ করেছে তাতে কোনো গোঁড়া মার্ক্সবাদীর পক্ষে এ নাটকগুলিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব।[৯] তিরিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের বিচিত্র, সুবিস্তৃত পটভূমিতে মাদার কারেজ্-এর দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি সব রকমের নীতিকথা এবং মতবাদকে অগ্রাহ্য করে প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকের বিরুদ্ধে পূর্ব জার্মান কম্যুনিস্ট্ পার্টির কর্তারা তাই অভিযোগ এনেছিলেন যে যুদ্ধের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে মাদার কারেজ ত কোন বৈপ্লবিক শিক্ষা লাভ করল না। আসলে এখানে সিদ্ধান্তের চাইতে কল্পনা অনেক বেশী প্রবল, আর তাইত এই মহানাটকের অমরত্ব সুনিশ্চিত। তাছাড়া এই যুগের প্রত্যেকটি নাটকের ঘটনাক্রম শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে কোনো না কোনো গূঢ় প্রশ্নের উপস্থাপনে, কোনো নিশ্চিন্ত সমাধানের মধ্যে নয়। ব্রেখ্‌ট্-এর পক্ষে এ জাতীয় রচনা শুধু নির্বাসনের কালেই সম্ভবপর ছিল ; ডেনমার্ক অথবা ক্যালিফোর্ণিয়ায় শিল্পীর কল্পনাকে পার্টি অথবা রাষ্ট্রের নির্দেশ মত নিয়ন্ত্রিত করার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। পূর্ব জার্মানীতে প্রত্যাবর্তনের পর পার্টির আদেশে "লুকুল্লুসের বিচার" নাটকটি তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সংশোধন করেন। তা সত্ত্বেও তিনি কর্তাদের খুশী করতে পারেননি।

ফলত ব্রেখ্‌ট্ কম্যুনিজম্-এর মৌমাছিতান্ত্রিক মতবাদকে অবলম্বন করলেও তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি তাদের অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি।[১০] যাঁরা কম্যুনিজম্-এর সমর্থক এবং যাঁরা কম্যুনিজম্-এর বিরোধী, এই

গোঁজামিলকে তাঁরা উভয় পক্ষই অবশ্য অশ্রদ্ধেয় বিবেচনা করবেন। ব্রেখ্‌ট্ যদি পূর্ব জার্মানীতে ফিরে না যেতেন তাহলে হয়ত শেষ পর্যন্ত নাট্যকার হিশেবে তাঁকে মৌন অবলম্বন করতে হত না। কম্যুনিস্ট মতবাদ আশ্রয় করার ফলে জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁকে এক কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার ঐশ্বর্য অবিসম্বাদিত। এবং তা যে তিনি পেরেছিলেন তার কারণ, ঐ তিন দশকের মধ্যে তাঁর মতবাদ তাঁর প্রেরণাকে বহু চেষ্টাতেও জীর্ণ করতে পারেনি। গোয়েটের "ফাউস্টে"র মতই ব্রেখ্‌ট্-এর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিও কূটাভাস চিহ্নিত; তাদের মধ্যে সেই ব্যঞ্জনার উপস্থিতি অনুভব করা যায় মতবাদের সরল জ্যামিতিতে যাকে মাপার চেষ্টা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা।

নায়কের মৃত্যু

ইতালিতে রেনেসাঁসী সভ্যতার বিবরণ লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক বুর্ক্‌হার্ট লক্ষ করেছিলেন যে ব্যক্তিত্ববোধের পুনরুন্মেষ উক্ত সভ্যতার অন্যতম প্রধান এবং বিশিষ্ট লক্ষণ। মধ্যযুগে খ্রীস্টধর্মের আওতায় পশ্চিমের মানুষ আত্মবিলোপের সাধনায় শান্তি খুঁজেছিল। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের মানুষ আবার আত্মসচেতন হয়ে উঠল। পরতন্ত্রতার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্য, পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে উদ্ভাবন, আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ—এটাই হোল রেনেসাঁসী মানসের বৈশিষ্ট্য। ধর্ম মানুষকে দাস্যভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল। রেনেসাঁসী কল্পনায় মানুষ দেখা দিল নায়ক রূপে।[১]

ব্যক্তিতে নায়কত্ব আরোপ করার দুঃসাহস গ্রীকদের মধ্যেই বোধ হয় সর্বপ্রথম দেখা যায়। মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড—প্রোটাগোরসের এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে এই ধারণার আভাস আছে। পেরিক্লেসের সমাধি-ভাষণে আথেনীয় নগর-রাষ্ট্রের যে আদর্শরূপটি প্রতিফলিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বতঃসিদ্ধতা তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে শুধু গ্রীক গণতন্ত্র নয়, গ্রীক ভাস্কর্য এবং গ্রীক নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠত না।[২] রেনেসাঁসের শিল্পী এবং মনীষীরা মধ্যযুগের বহু-শতাব্দীব্যাপী বিস্মৃতির কবল থেকে গ্রীক সভ্যতার এই উত্তরাধিকারকে উদ্ধার করলেন। তাঁরা নতুন করে উপলব্ধি করলেন যে মানুষ দৈবের অথবা প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক নয়, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে মানুষ উপাদানসমষ্টি মাত্র নয়, সে নিজেকেও নিজের কল্পনা এবং প্রয়াসের সামর্থ্যে বিচিত্রভাবে গড়ে তুলতে পারে। রেনেসাঁসের অন্যতম প্রখ্যাত মনীষী পিকো দেলা মিরান্দোলার ভাষায় বলা যেতে পারে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মানুষই একমাত্র জীব যার অস্তিত্বের আদল এবং বিকাশের ধারা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, যার আত্মরূপান্তরের ক্ষমতা অপরিসীম, যে অনিবার্যরূপে স্বতন্ত্র এবং অনন্য।[৩]

পশ্চিম ইয়োরোপের যে-সভ্যতাকে ইতিহাসে 'আধুনিক' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যে-সভ্যতা আবিষ্কারক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং প্রচারক, যোদ্ধা, ভাগ্যান্বেষী এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের মারফত ক্রমে সমুদ্র, পর্বত, মরুভূমি এবং অরণ্যের বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে,

তার অন্যতম প্রধান উৎস হোল রেনেসাঁসের এই উপলব্ধি। এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে রেনেসাঁসের স্থাপত্যে এবং চিত্রকলায়, দর্শনে এবং রাজনীতিতে, দুঃসাহসী অ্যাড্‌ভেঞ্চারারদের কীর্তিকলাপে এবং উদ্যোগী বণিকদের সমুদ্রযাত্রায়, এবং সব চাইতে সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যিকদের কল্পনায়। জাতি, সম্প্রদায়, কুলশীল, বর্ণ, বিত্ত, বয়স ইত্যাদি চিহ্নের মধ্যে মানুষের পরিচয় নেই; তার পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে, তার স্বাতন্ত্র্যে, তার কর্মে। রেনেসাঁসের জীবনবোধ-অনুসারে "আমার আমিত্ব"-কে সমৃদ্ধতর এবং সুপ্রকাশিত করাই হোল মানুষের যথার্থ সাধনা। ব্যক্তি তার বিশিষ্টতাকে ফুটিয়ে তুলুক বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে; রেনেসাঁসের ভাষায় **uomo unico** পরিণতি পাক **uomo universale**-এ।[৪]

ফলত রেনেসাঁসের মনীষীরা গ্রীকদের চাইতেও বেশী প্রাবল্যের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তায় নায়কত্ব আরোপ করেছিলেন। নায়কের লক্ষণ কি? যাকে গড়পড়তার ছাঁচে ফেলা যায় না, কারণ সে বিশিষ্ট; ঘটনাস্রোত যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, কারণ সে না থাকলে ঘটনা নিরর্থক; কাসিরারের ভাষায় যে শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাত্র নয়, অভিজ্ঞতার উপাদানকে যে ব্যক্তি নিজের কল্পনা অনুযায়ী রূপ দিতে সমর্থ; উৎকর্ষের মহৎ আকাঙ্ক্ষা (**lo gran deliecellenza**) যাকে কখনও তামসিক অভ্যাসাশ্রয়িতায় নামতে দেয় না; যে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে জানে এবং হেরে গেলেও নতি স্বীকার করে না; যে জোরের সঙ্গে দাবি করতে পারে এবং তার জন্য দাম দিতে প্রস্তুত;—সেই ব্যক্তিই নায়ক। সে স্ত্রী কিংবা পুরুষ, বিবেকবান বা নিরঙ্কুশ উচ্চাভিলাষী, যোদ্ধা, সওদাগর, এমনকি সুদখোর, শুভ্রকেশ বৃদ্ধ অথবা বিকলাঙ্গ যুবা, যা খুসী হতে পারে। কিন্তু নায়ক হবার জন্য তার যা অবশ্যই থাকা চাই তা হোল ব্যক্তিত্ব এবং সকল অবস্থার মধ্যে এই ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখবার শক্তি। এই শক্তি যার আছে সে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারে পৃথিবী তার দেশ, কারণ যেখানেই সে যাক না কেন, সেখানেই তার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।[৫]

ব্যক্তিত্বের ওপরে জোর দেওয়ার ফলে একদিকে রেনেসাঁসের যুগে যেমন সত্যিই বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রী পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাদের অবলম্বন করে বিরাট জীবনী-সাহিত্য গড়ে ওঠে। আত্মজীবনী লেখার এবং আত্মপ্রতিকৃতি আঁকার রেওয়াজও এই যুগে চালু হয়। তাছাড়া বিখ্যাত মানুষদের ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, তাদের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব, তাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ, তাদের নিয়ে কাব্যকাহিনী রচনা, এসবও এই যুগের বৈশিষ্ট্য। ইতালি থেকে শুরু

করে জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে রেনেসাঁসী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ তার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। ইংল্যাণ্ডে এই বোধের প্রথম প্রস্ফুরণ ঘটে এলিজাবেথান এবং জেকোবিয়ান সাহিত্যে, বিশেষ করে নাটকে। পরে সতেরো এবং আঠারো শতকে এই বোধ উদারতান্ত্রিক সমাজদর্শনের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শেক্সপীয়র এবং তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের রচনা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে তাঁদের কল্পনা মুখ্যত নায়ককেন্দ্রিক ছিল। এই নায়ক মার্লোর লিরিকে নায়িকাকে ডাক দিয়ে বলেছে :

> **Come live with me and be my Love,**
> **And we will all the pleasures prove···**

শেক্সপীয়রের সনেটের ভিতর দিয়ে ঘোষণা করেছে :

> **Let me not to the marriage of true minds**
> **Admit impediments. Love is not love**
> **Which alters when it alteration finds,**
> **Or bends with the remover to remove···**

এমন কি জন ডানের কৌতুকসরস অতিশয়োক্তির মধ্যেও এর উজ্জ্বল উপস্থিতি অস্পষ্ট নয় :

> **Busie old foole, unruly Sunne,**
> **Why dost thou thus,**
> **Through windows, and through curtains call on us?**
> **Must to thy motions lovers seasons run?···**
> **This bed thy centre is, these walls, thy spheare.**[৩]

এই নায়কের আর যে অভাবই থাক, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। সতেরো শতকের প্রথম ভাগে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত্ সমস্ত অস্তিত্ব এবং অভিজ্ঞতাকে সন্দেহ করার পর অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আর কিছু থাক বা নাই থাক আমি আছি, কেন না আমার সন্দেহক্রিয়ার দ্বারাই আমার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। Cogito ergo sum—ভাবি, সুতরাং আছি। রেনেসাঁসকল্পিত নায়ক কোন যুক্তিতর্ক ছাড়াই নিজের অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে উপলব্ধি করেছিল। এই নায়ক কখনও-বা ফলস্টাফের মত দায়িত্ববোধমুক্ত প্রৌঢ় বিদূষক, কখনও-বা

ব্রুটাসের মত আদর্শবাদী পণ্ডিত, কখনও-বা হ্যামলেটের মত চতুর কল্পনাপ্রবণ বিশ্লেষণপ্রিয় যুবক, কখনও-বা লীয়রের মত অন্ধ একাগ্র সর্বস্বপণকারী উন্মত্ত বৃদ্ধ। কিন্তু কি এদের কৌতুকে, কি এদের যন্ত্রণায়, কি এদের বাক্যে, কি এদের কর্মে, বিশ্বজগৎ থেকে পৃথক্ আপন আপন ব্যক্তিসত্তার চেতনা সব সময়েই প্রবলভাবে জাগ্রত। নির্ভীক্ এবং হৃদয়বান প্রৌঢ় ওথেলো তাই বিভ্রান্তিবশে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে অসহ্য ঈর্ষার কাছে বলি দেবার পর নিজের ভুল জানতে পেরে আত্মঘাতী হবার মুহূর্তেও একথা না বলে পারে না :

Speak of me as I am ; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice…

বিদগ্ধ, বিপর্যস্ত, নির্বেদাক্রান্ত হ্যামলেট তাই ওফেলিয়ার করুণ কবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোষণা করে :

…this is I,
Hamlet the Dane.

ছলাকলানিপুণা নায়িকা ক্লিওপেট্রা তাই স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নিজের বিজয়িনী-সত্তাকে স্মরণ করে :

Give me my robe, put on my crown ; I have
Immortal longings in me…
I am fire and air ; my other elements
I give to baser life…[৭]

ওয়েব্‌স্টারের নায়িকা বিত্তোরিয়া কোরোম্বোনা নিষ্ঠুর নিপুণতার সঙ্গে একটির পর একটি দুষ্কার্য করে ধরা পড়ার পরও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্তিমান শাস্তিদাতাদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে একা সংগ্রাম করে, এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে অকম্প আত্মস্থতার সঙ্গে এই মহাগণিকা বলে যায় :

My soul, like to a ship in a black storm,
Is driven, I know not whither.[৮]

এই নায়কনায়িকাদের চরিত্রে অনেক নৈতিক গলদ আছে। কিন্তু এক জায়গায় এরা খাঁটি। আর সেটা হোল, সব রকম অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সামর্থ্যে। এই একটি ক্ষেত্রে মার্লোর বারাবাস, শেক্‌সপীয়রের বিভিন্ন পরিণত নাটকের নায়কনায়িকারা, বেন জনসনের ভলপনে, চ্যাপম্যানের বুজি দাঁবোয়াজ, টুর্নরের ভিন্দিচে, ওয়েবস্টারের বিত্তোরিয়া এবং ডাচেস্

অব ম্যাল্‌ফি, বোমণ্ট-ও-ফ্লেচারের ইভাদ্‌নে, এবং ফোর্ডের আনাবেলা ও জ্যোভানি পরস্পরের নিকটাত্মীয়। এলিয়ট এই জাতীয় চরিত্র কল্পনার ভিতরে সেনেকার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন; তাঁর মতে এলিজাবেথান নাটকে রোমান স্টোইসিজ্‌মের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট।[৯] স্টোইক দর্শনের প্রতি এলিয়টের প্রতিন্যাস আমার কাছে বিষয়মুখ ঠেকে না; কিন্তু তাঁর এই উক্তিটি সত্য যে স্টোইক মনোভাব খ্রীস্টীয় "হিউমিলিটি"র পরিপন্থী। এলিজাবেথান নায়ক ভাগ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে বার বার হেরে যেতে পারে; কিন্তু পরাজয়ের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য আগে থেকেই দাস্যভাবের অনুশীলনে তার একান্ত অনীহা। পরবর্তীকালে এই নায়কেরই প্রতিধ্বনি করে মিলটনের শয়তান বলেছে, স্বর্গে সেবা করার চাইতে নরকে রাজত্ব করা ভাল। এরই বংশধর গোয়েটের ফাউস্ট, শেলীর প্রমেথিয়ুস, স্তাঁদালের জুলিয়াঁ সোরেল—সমগ্র সমাজের সঙ্গে যার লড়াই (en guerre avec toute la societe.)।[১০]

দুই

মধ্যযুগের তামসিক জীবনযাত্রা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার ব্যাপারে রেনেসাঁসী নায়ক-কল্পনার মস্ত দান থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে উক্ত কল্পনার মধ্যে কিছু মারাত্মক ত্রুটিও ছিল। মানুষ সৃজনক্ষম জীব এ কথা যেমন সত্য, বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনাক্রম নিয়মনির্দিষ্ট এ কথাও তেমনি সত্য। প্রথমটির ওপরে ঝোঁক দিয়ে দ্বিতীয় সত্যকে অগ্রাহ্য করলে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সংঘাত অনিবার্য, এবং সে সংঘাতে ব্যক্তির বিনাশের সম্ভাবনাই সমধিক। প্রাতিস্বিকের স্বয়ম্ভরতায় প্রত্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও রেনেসাঁসী বিশ্ববীক্ষা তাই অনেক সময়েই ট্র্যাজিক পরিণতির দ্বারা উপক্রান্ত। পরবর্তীকালে রোম্যান্টিক আন্দোলনে এই প্রবণতা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য যেমন পরিবেশের বাধাকে লঙ্ঘন করা প্রয়োজন, ব্যক্তির বিকাশের জন্য তেমনি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি অবশ্যকাম্য। রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী ভাবুকদের মধ্যে কেউ কেউ দুই সূত্রের মধ্যে অন্বয় খুঁজেছিলেন; কিন্তু রেনেসাঁস-কল্পিত নায়ক দ্বিতীয় দিকটিকে সব সময়ে স্মরণে রাখেন নি। ফলে যে কোনো পরিবেশেই তিনি পরদেশী—স্তাঁদালের ভাষায় etranger.

দ্বিতীয়ত, স্বাতন্ত্র্যকেই একমাত্র সাধনার বিষয় করার ফলে রেনেসাঁসী নায়ক সব মানুষের মূলগত ঐক্যের প্রতি অনেক সময়ে উদাসীন। অথচ এই ঐক্যকে

মূল্য না দিলে ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য, এসবের কোনও সার্বলৌকিক ভিত্তি থাকে না। ফলে সমাজজীবন অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং সমাজকে একেবারে বাদ দিয়ে ব্যক্তির বিকাশ অকল্পনীয়। সব চাইতে বড় কথা, এই মনোভাবের ফলে এক ব্যক্তি অপরকে তাঁর নিজের বিকাশের উপায়মাত্র মনে করেন; এবং সেক্ষেত্রে একের স্বাতন্ত্র্য অপরের স্বাতন্ত্র্য-বিলোপের হেতু হয়ে ওঠে। রেনেসাঁসী নায়কের এই বিনাশন-প্রবণতা মেকিয়াভেলীর প্রিন্স পরিকল্পনার মধ্যে সব চাইতে সুপরিস্ফুট। রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে তিনি প্রত্যাশা করেছেন সিংহের সাহস এবং শৃগালের ধূর্ততা; অপরের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে বোধ তাঁর পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, সে বোধ নাকি দুর্বলতার চিহ্ন।[১১] অথচ অপরের প্রতি যিনি উদাসীন তাঁর নিজের বিকাশও বিকৃত হতে বাধ্য; ক্ষমতার একাগ্র সাধনায় তিনি ক্রমে মনুষ্যত্বের অন্য সব সম্পদকে বলি দিতে থাকেন। রেনেসাঁসী নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রে তাই অনেক সময়ে স্নেহ, দাক্ষিণ্য, দায়িত্ববোধ এবং অপরের হৃদয়বৃত্তি সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতির অভাব আমাদের পীড়া দেয়। তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রবল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সহৃদয়তার দ্বারা পরিশীলিত নয়।

পশ্চিম ইয়োরোপের বেশ কিছু শিল্পী ও মনীষী গোড়ার দিকে রেনেসাঁসী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরোক্ত ত্রুটি-সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এবং হল্যাণ্ডে সতেরো শতক থেকে এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা চোখে পড়ে। ডাচ্ মনীষী গ্র্ট্ বা গ্রটিয়াস বিচার করে দেখালেন যে ব্যক্তির বিকাশের উৎস হচ্ছে তার মানবীয় প্রকৃতি বা মনুষ্যত্ব; এই প্রকৃতি সার্বলৌকিক; এই প্রকৃতির নির্দেশ অনুসরণ করে মানুষ উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ করে; এই প্রকৃতির স্ফুরণের জন্য যা কিছু প্রতিমানুষের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় তাকেই বলা হয় মানবীয় অধিকার বা রাইট; এবং এই সব অধিকারের সংরক্ষণ এবং প্রবর্ধনের জন্য যে সব আইনকানুন করা হয় তাই হোল সমাজ এবং রাষ্ট্রের যথার্থ ভিত্তি।[১২] লক্ প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকেরা ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহন-শীলতার মিলনকে সুস্থ সমাজের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করলেন; এবং তাঁদের সেই চিন্তাধারার প্রভাবে ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে উদারতান্ত্রিক প্রতিন্যাস প্রসার লাভ করে। ক্রমে উদারতান্ত্রিক আদর্শ অন্যান্য দেশের মনীষীদেরও আকৃষ্ট করতে থাকে এবং আঠারো ও উনিশ শতকে এই আদর্শ পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। আঠারো শতকের ফ্রান্সে এবং আমেরিকায়, উনিশ শতকে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আফ্রিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে

উদারতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে রামমোনহ, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিয়োর শিষ্যবর্গ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট কর্মীদের চরিত্রে এবং ক্রিয়াকলাপে উদারতন্ত্রী জীবনবোধের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

উদারতন্ত্র ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে পূর্ণ মূল্য দিলেও তাকে আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ রাখেনি। উদারতন্ত্রী একদিকে কাণ্টের ভাষায় প্রতি ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য হিশেবে কল্পনা করেছে; কোন ব্যক্তিই অপরের স্বার্থসাধনের উপায়মাত্র নয়। অপরদিকে উদারতন্ত্র যুক্তির দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধ দূর করার প্রয়াস পেয়েছে, অনেকের ক্ষতির দ্বারা একের লাভ বা একজনের আত্মবিলোপের দ্বারা অনেকের কল্যাণকে আদর্শ বলে স্বীকার করেনি। উদারতন্ত্র অধিকার এবং দায়িত্বকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত করেছে। উদারতন্ত্রীর বিচারে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার শর্ত হোল অপরের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা, সহ্য করা এবং শ্রদ্ধা করা। এই ক্ষেত্রে উদারতন্ত্র রেনেসাঁসের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধতর করেছে, তাকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করেছে।

রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের উপরোক্ত বিবর্তনের ফলে নায়ক-সম্বন্ধে ধারণাতেও গভীর পরিবর্তন দেখা দিল। রেনেসাঁসের ট্র্যাজিক নায়ক শুধু স্বতন্ত্র নন, সর্বসাধারণের চাইতে ওপরে ওঠা তাঁর সাধনা। এই সাধনার জন্য তিনি শুধু সর্বসাধারণের বিরোধিতা করতেই প্রস্তুত নন, তাঁদের দমন (এবং প্রয়োজন হলে বিনাশ পর্যন্ত) করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। অভীপ্সার আরশীতে নিজের যে প্রতিচ্ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ, সেটি অতিমানবের। এই নাটকীয় ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এলিজাবেথান-জেকোবিয়ান সাহিত্যিকেরা স্বভাবত নাট্যরূপের মাধ্যম অবলম্বন করেছিলেন। অপরপক্ষে উদারতন্ত্রের নায়ক আত্মপ্রত্যয়ী হলেও অপরের প্রতি উদাসীন নন; নিজের বিশিষ্টতার প্রতি নিষ্ঠা সত্ত্বেও তার নাটকীয় অতিস্ফীতি উদারতন্ত্রীর অনাকাঙ্ক্ষিত। তিনি নিজের 'প্রাইভেসী' রক্ষায় যত্নশীল; কিন্তু যুগপৎ সমাজের সঙ্গে নানারকম সম্পর্ক গড়ে তোলায় উদ্যোগী। তাঁর চেতনায় ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, প্রাইভেট এবং পাবলিক-এর ব্যবধান স্পষ্ট। যা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সেখানে সমাজের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করেন না; অপরপক্ষে স্রেফ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে অপরের অসুবিধা ঘটাতে তিনি কুণ্ঠিত। রেনেসাঁসের নায়ক সকলকে ছাড়িয়ে উঠে নিজের বিশিষ্টতা প্রমাণ করতে চান; উদারতন্ত্রের নায়ক সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থেকেও নিজের বিশিষ্টতা হারান না।

বুর্ক্‌হার্ট্‌ লিখেছেন যে চতুর্দশ শতকের শেষভাগে ফ্লোরেন্সে প্রত্যেক নাগরিক না কি আপন আপন খেয়ালমাফিক পোশাক পরতেন ; নাগরিক পরিচ্ছদে কোন সাধারণ রীতি ছিল না।[১৩] কিন্তু পরবর্তী যুগে উদারতন্ত্রী নায়ক পোশাক-আশাকে, আচার-ব্যবহারে প্রচলিত প্রথাকেই সচরাচর অনুসরণ করেছেন, অথচ তাঁর চরিত্রের কেন্দ্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ যে একারণে নিশ্চিতভাবে দুর্বলতর হয়েছে, একথা বোধহয় বলা চলে না।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যাদর্শে এই নব্য নায়ককল্পনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত চোখে পড়ে। এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমকালীন অধিকাংশ রোমান্টিক কবিদের থেকে পৃথক্‌। শেষোক্ত কবিদের অনেকেই রেনেসাঁসী ট্র্যাজিক নায়কের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ চেয়েছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব আবিষ্কার করতে। এমন কি তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সাধারণ মানুষের কথোপকথন এবং ভাবনাচিন্তার ভাষাই কাব্যের যথার্থ ভাষা।[১৪] অপরের থেকে কোন হিশেবে উৎকৃষ্ট না হয়েও প্রতি মানুষ যে অনন্য, এ কথাটা বোঝাবার সরলতম উপায় হোল তাঁকে ভালবাসা। যাঁর মধ্যে অন্য কেউ নায়কত্বের কোন লক্ষণ দেখেন নি, তিনিও তাঁর প্রেমিকার চোখে নায়ক। তাঁর অভাব কোন সর্বগুণান্বিত অতিমানবও পূরণ করতে পারেন না। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের লুসি স্পষ্টত শেক্‌সপীয়রের পোর্শিয়া, লেডি ম্যাক্‌বেথ অথবা ক্লিওপেট্রা নয়। কারও চোখে সে চমক লাগায় নি, তার পরিবেশের ওপরে সে কোন স্বাক্ষর রেখে যায় নি। কিন্তু শ্যাওলাঢাকা পাথরের আড়ালে ভীরু নম্র ভায়োলেট ফুলের মত এই অখ্যাত অজ্ঞাত মেয়ে যেদিন ঝরে পড়ল, সে দিন অন্তত তার প্রেমিকের চোখে পৃথিবীর রূপ বদলে গিয়েছিল :

> **She lived unknown, and few could know**
> **When Lucy ceased to be ;**
> **But she is in her grave, and, oh**
> **The difference to me !**

লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু-সংবাদে ম্যাক্‌বেথের উক্তির সঙ্গে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতার শেষ চরণ তুলনা করলে সন্দেহ থাকে না যে শেক্‌সপীয়রের মহানায়িকার চাইতে পরবর্তী কবির এই অতি নগণ্যা নায়িকা তার প্রেমিকের চেতনায় অনেক বেশী অনন্যা রূপে উপলব্ধ হয়েছিল।

এখন সাধারণ স্ত্রীপুরুষকে নায়ক-নায়িকা হিশেবে কল্পনা করলেও তাঁদের

কাহিনীতে নাটকীয় পরিস্থিতি অবতারণার সুযোগ কম। সংঘাতের চাইতে সহযোগিতা যাঁর বেশী কাম্য, নিজের বিশিষ্টতাকে তিনি বাহ্য আচরণের মধ্যে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক, বীরত্বের চাইতে শিষ্টতাকে যিনি বেশী মূল্য দেন, তাঁকে নিয়ে ট্র্যাজেডি লেখা কঠিন। আমার অনুমান. আঠারো এবং উনিশ শতকের পশ্চিমী সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডির সংখ্যা যে অত্যন্ত স্বল্প, উদারতন্ত্রের প্রভাবে নায়ক সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হয়ত তার অন্যতম প্রধান কারণ। অপরপক্ষে এই নতুন ধরনের নায়ক-নায়িকাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসের গদ্যভাষা, মন্থর ঘটনাবিন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বহু চরিত্র অবতারণার অবকাশ বিশেষ উপযোগী। এই ধরনের নায়ক-নায়িকার বিশেষত্ব কোন প্রচণ্ড প্রয়াসের মধ্যে ধরা পড়ে না। ছোটখাট ঘটনা, বিচিত্র সম্পর্ক, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মধ্যে তারা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। স্কট কিংবা দুমা এ কথাটা বুঝতে পারেননি। নাটকীয় ব্যক্তিত্বের অভাবে তাঁদের রোমান্টিক নায়ক-নায়িকারা আমাদের অভিভূত করেন না ; অথচ উপন্যাসের বিচিত্র সম্ভাবনাকেও তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গল্পকাহিনীর মধ্যে সার্থক করতে পারেন নি। নতুন ধরনের নায়ক-নায়িকাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসই যে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইংল্যাণ্ডে স্টর্ণ, ফিল্ডিং এবং বিশেষভাবে জেন অস্টেন-এর রচনায়, ফ্রান্সে দিদেরো, কঁস্তাঁ, স্তাঁদাল এবং বালজাকের লেখায়, জার্মানীতে গোয়েটের হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টারএ, রাশিয়াতে গোগোল এবং গণচারভ্‌-এ। এঁদের মধ্যে স্তাঁদাল অবশ্য রেনেসাঁসী নায়ক-কল্পনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। অন্যদিকে তাঁর কল্পনায় সাম্প্রতিক নব্যনাস্তিক্যের পূর্বাভাসও লক্ষণীয়। দান্তে যেমন মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁসের মাঝখানে সেতুবন্ধ, তাঁকেও তেমনি রেনেসাঁস এবং বর্তমান কালের মধ্যে এক আশ্চর্য সেতুবন্ধ বলা চলে। তবে মোটামুটি এ কথা বোধ হয় স্বীকার্য যে আঠারো এবং উনিশ শতকে উপন্যাস যেমন সাহিত্যের জগতে নাটকের স্থান গ্রহণ করেছে, তেমনি সমাজ-জীবনে এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের কল্পনায় রেনেসাঁসের স্বরাট্‌, প্রচণ্ড এবং ট্র্যাজিক নায়কের রূপান্তর ঘটেছে উদারতন্ত্রের সহিষ্ণু অথচ আত্মপ্রত্যয়ী, ভারসাম্যকামী অথচ গতিশীল, সহৃদয় এবং হিশেবী নায়কে।[১৫] ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে ; ডস্টয়েভ্‌স্কি তার মধ্যে সর্বপ্রধান। কিন্তু উদারতন্ত্রপরিকল্পিত নতুন নায়কের বিচিত্র পরিচয় লাভ করতে হলে যে লেখকের কাছে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে, তিনি রুশিয়ার ডস্টয়েভ্‌স্কি নন, তিনি ইংল্যাণ্ডের চার্লস ডিকেন্স।

তিন

কিন্তু বর্তমান শতকে রেনেসাঁসী এবং তা থেকে বিবর্তিত উদারতন্ত্রী নায়ক-নায়িকারা নিতান্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছেন। এই অনুপস্থিতি পুবের চাইতে পশ্চিমে বেশী তীব্রভাবে অনুভূত। কারণ পূর্বদেশীয় সমাজগুলিতে বহুকাল ধরে ব্যক্তির তুলনায় সমাজ, প্রাতিস্বিকের তুলনায় সামান্য, স্বকীয়তার তুলনায় প্রথানুগত্য অধিক প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ফলে এসব সমাজে নায়কচেতনার এতটা পরিস্ফুটন ঘটেনি যার ফলে ইতিহাসের পটভূমি থেকে নায়কের অপসরণ বিশেষ পীড়াদায়ক ঠেকতে পারে। অপরপক্ষে পশ্চিমে কয়েক শতাব্দী ধরে সমাজে এবং সাহিত্যে ব্যক্তির বিশিষ্টতার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল; সুতরাং সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবক্ষয় তীব্রতরভাবে অনুভূত হবে, এটা স্বাভাবিক। তবে পশ্চিমের চেতনায় এই ধারা অনেক বেশী স্পষ্টতা লাভ করলেও, এটির প্রভাব আজ আর ইয়োরোপ-আমেরিকায় আবদ্ধ নেই। পৃথিবীর সব সমাজেই ব্যক্তির আত্মবিলোপ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে শুধু কাপেকের মত পশ্চিমের সাহিত্যিকেরাই মানুষের "রোবট"এ (robot) রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী লিখছেন না। সংখ্যাচিহ্নের মধ্যে ব্যক্তিকে নিঃশেষিত করার সর্বনাশা প্রক্রিয়া প্রাচ্যদেশীয় কবি রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত প্রত্যয়েও ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণে অশক্ত মানুষের সজ্ঞান নিষ্ক্রিয়তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাঙালী কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুতুলনাচের ইতিকথা"য়।

আধুনিক সভ্যতার অধুনাতম অধ্যায়ে ব্যক্তির অপঘাত কীভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে, সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে তার কিছুটা নির্দেশ পাওয়া গেলেও এই প্রক্রিয়ার আন্তর রূপটি সব চাইতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে সাহিত্যিকদের অনুভবে এবং রচনায়। এজ্রা পাউণ্ডের ভাষায় বলা যায় যে সাহিত্যিকেরা যেন মানবজাতির পতঙ্গ শুঁড় (antennae); তাঁদের সুতীক্ষ্ণ অনুভূতিশীলতার সূত্রে সমাজের অন্যসব মানুষ পরিবর্তন-বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।[১৩] অন্য মনীষীরা ঘটনাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। সাহিত্যিকের জ্ঞান অপরোক্ষ। তাছাড়া সাহিত্যিকেরা হলেন ভাষাশিল্পী; এবং মনের জটিল ক্রিয়াপ্রক্রিয়াকে প্রকাশ করবার সমৃদ্ধতম মাধ্যম হোল ভাষা। সাহিত্যিকের কল্পনায় একদিকে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির সামর্থ্য এবং অন্যদিকে প্রকাশ-

নৈপুণ্যের একত্র সমাবেশ ঘটার ফলে মানবজীবনের গূঢ়তম অভিজ্ঞতা এবং প্রক্রিয়ানিচয় তাঁর রচনার মধ্যে প্রথমে এবং সবচাইতে বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, এটা প্রত্যাশিত। আধুনিক সাহিত্য এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়।

ব্যক্তির নির্বাণ আধুনিক সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হোলেও তার পূর্বাভাস উনিশ শতকেই পাওয়া যায়—বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষার্ধের ফরাসী সাহিত্যে। মোটামুটি বোধ হয় বলা যায় যে সাহিত্যিকদের চেতনায় নায়কত্বের বিলোপ মুখ্যত দুইভাবে অনুভূত হয়েছে। একজাতের লেখক (এঁরা সকলেই রোম্যান্টিক এবং অনেকেই কবি) ব্যক্তির নির্বাণকে অবশ্যম্ভাবী বলে উপলব্ধি করেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে স্বাতন্ত্র্যের বিনাশে অস্তিত্ব নিরর্থ। এবং সেকারণে নিজেদের স্বকীয়তার চেতনা এবং বিনাশের অনিবার্যতা বিষয়ে জ্ঞান দুই মিলে তাঁদের কল্পনায় দুঃসহ যন্ত্রণা এবং গ্লানি সঞ্চার করেছে। এঁদের মধ্যে সময়ের হিশেবে প্রথম এবং সামর্থ্যের বিচারে প্রধান হোলেন বোদ্‌লেয়ার; তাঁর ডানাভাঙা সিন্ধুশকুন ত' শুধু আধুনিক কবির নয়, নবকালের পঙ্গু নায়ক-নায়িকারও প্রতীক।[১৭] মালার্মের রাজহাঁস এবং ফন এরি আত্মীয়। হিম মৃত্যু এবং অলঙ্ঘ্য অক্ষমতার বিরুদ্ধে এদের একমাত্র সম্বল স্মৃতি এবং স্বপ্ন, যা মহৎ কিন্তু নিরাশাস (magnifique mais qui sans espoir), অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর। দ্বিতীয় প্রকৃতির লেখক (এঁরা প্রধানত বস্তুতন্ত্রী এবং ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখক) আধুনিক সভ্যতায় নায়কের অস্তিত্ব অসম্ভব জেনে হয় সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে তথাকথিত নায়ক-নায়িকাদের শূন্যগর্ভতা উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত, আর না হয় নিরাসক্ত নিষ্ঠায় ব্যক্তির আত্মবিলোপ-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে উদ্যোগী। এই ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক বোধহয় ফ্লোবেয়ার। তাঁর "বুভার এ পেকুশে" উপন্যাসে নব্যযুগের নির্বীর্য, নপুংসক, পরতান্ত্রিক চরিত্রের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে।

উনিশ শতকে বিশেষ কয়েকজনের চেতনায় যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত ধরা পড়েছিল, বিশ শতকে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে, অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য আধুনিক সাহিত্যিকের কল্পনা তার-ই মর্মকামী উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত। বেশী উদাহরণের প্রয়োজন নেই, দু'একজন সুপরিচিত লেখকের উল্লেখ করলেই কথাটা পরিস্ফুট হবে। ইংরেজি কাব্যে যিনি আধুনিকতার প্রবর্তক এবং মুখ্য শিল্পী, সেই এলিয়টের প্রায় সমস্ত কবিতা এবং নাটকের কেন্দ্রীয় উপলব্ধি হোল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শূন্যগর্ভতা, এবং তাদের মূল আবেগ বা ভাব হোল এই উপলব্ধিজনিত গ্লানি এবং নিরুদ্যম। তাঁর প্রথম নায়ক প্রুফ্রক্-এর বিরল কেশ, বাঁধানো দাঁত,

শীর্ণ দেহ, জীর্ণ যৌবন, সশঙ্ক হৃদয়, আর প্রত্যয়বিলোপী আত্মসচেতনতার মধ্যে মানুষের যে রূপ প্রতিফলিত, গ্রীক, এলিজাবেথান অথবা লিবর‍্যাল সাহিত্যিকেরা তার সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করেননি। "পোর্ট্রেট অব্ এ লেডি"-র নায়িকা এই পুরুষেরই উপযুক্ত প্রকৃতি, ভালবাসার স্বপ্ন দেখার সাহসও যিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি, শীতের ধূমার্ত অপরাহ্নে কবরখানার মত স্বল্পালোকিত হিম কক্ষে নির্বাক্ সঙ্গীকে যিনি শুধু ফিসফিস করে বলতে পারেন :

But what have I, but what have I, my friend,
To give you, what can you receive from me ?

অথচ তাঁর ধারণা যে উক্ত সঙ্গীটি বীর্যবান এবং আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ :

You are invulnerable, you have no Achilles' heel.

কিন্তু আসলে ওই পুরুষটি প্রুফ্রক্-এরই সহোদর :

I feel like one who smiles, and turning shall remark
Suddenly, his expression in a glass.
My self-possession gutters ; we are really in the
dark......

And I must borrow every changing shape
To find expression dance, dance
Like a dancing bear,
Cry like a parrot, chatter like an ape...[১৮]

ফলত এলিয়টের কল্পজগতের যাঁরা স্ত্রীপুরুষ তাঁদের না আছে আত্ম-প্রত্যয়, না ভালবাসার সামর্থ্য, না সৃষ্টির প্রেরণা। "ওয়েস্ট্ল্যাণ্ড্" বর্ণিত সেই তরুণ কেরানীটির মত তাঁদের প্রেম এবং দুঃসাহসের দৌড় হোল, একটি ক্লান্ত, নিরাসক্ত, নিরুত্তাপ নারীদেহে খানিকটা হিশেবী ধস্তাধস্তি করে তারপর নিরালোক সিঁড়ি হাতড়ে কেটেপড়া।

এই সব ফাঁপামানুষেরা তাঁদের জীবনে কোনো মহৎ সুখ অথবা মহৎ দুঃখ অনুভব করেন নি। ত্যাগ এবং ভোগ উভয় ব্যাপারেই এঁরা অক্ষম। এঁরা তাই :

...with a thousand small deliberations
Protract the profit of their chilled delirium,
Excite the membrane, when the sense has cooled,

With pungent sauces, multiply variety

In a wilderness of mirrors......[১৯]

জীবন থেকে এঁরা কোনো সম্পদ আহরণ করতে পারেননি। এঁদের তাই প্রাণপণ চেষ্টা নিজেদের অস্তিত্বকে সব সময়ে ভুলে থাকার জন্য। যখনই তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন তখনই তাঁদের মনে হয় :

...I, not a person, in a world of persons

But only of contaminating presences···[২০]

এঁদের কাছে তাই :

Death or life or life or death

Death is life and life is death[২১]

এলিয়ট লিখেছিলেন পোড়োজমির কাব্য; হাক্স্লি, হেমিংওয়ে, বেকেট, সার্ত্র্, গ্রাস্ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকেরা বিভিন্ন দিক থেকে লিখেছেন পোড়োজমির উপন্যাস। প্রেমে অক্ষম, বিকাশের সামর্থ্যে বঞ্চিত, এঁদের নায়কনায়িকারা অস্তিত্বের মধ্যে শুধু জরা আর মৃত্যুকেই সত্য বলে জানেন। হাক্স্লির "দোজ ব্যারেন লীভস্" উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র মিস্টার কার্ডান-এর ভাষায় :

The tragedies of the spirit are mere struttings and posturings on the margin of life, and the spirit itself is only an accidental exuberance, the product of spare vital energy, like the feathers on the head of a hoopoo or the innumerable populations of useless and foredoomed spermatozoa. The spirit has no significance ; there is only the body. When it is young, the body is beautiful and strong. It grows old, its joints creak, it becomes dry and smelly ; it breaks down) the life goes out of it and it rots away...The farce is hideous, thought Mr. Cardan, and in the worst of bad taste···[২২]

দেহের এই নশ্বরতা এবং "অনাত্ত" বিষয়ে এই জ্ঞান কিন্তু এই স্ত্রী-পুরুষদের মনে করুণা, ঔদার্য বা সত্যনিষ্ঠার সঞ্চার করে নি। উলটে এই বোধ তাঁদের মনে শুধু ভয়, ক্লৈব্য, উৎকণ্ঠা এবং মর্ষকামকেই প্রবল করে তুলেছে। আধুনিক বহু শক্তিশালী ঔপন্যাসিকদের কল্পিত চরিত্রেরা প্রেম, সৃষ্টি, বিকাশ, বৈচিত্র্য, স্বকীয়তা, এসব বোধে বঞ্চিত। হেমিংওয়ের ভাষায় তাঁরা শুধু জানেন :

…death is the unescapable reality, the one thing any man may be sure of ; the only security…[২৩]

এমৃত্যু কিন্তু ট্র্যাজিক নায়কের মৃত্যু নয়, কারণ আধুনিক সাহিত্যের এই সব স্ত্রী-পুরুষ জীবন থাকতেই তো মৃত। দেকার্তের সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে অর্থহীন। ভাবনার স্রোত আছে বটে, কিন্তু তার কেন্দ্রে কোন "আমি" নেই; অভিজ্ঞতার বহুবাচনিকতায় ঐক্য দিতে পারে এমন কোন সক্রিয় ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। জ্যঁ-পল সার্ত্র্-এর প্রথম উপন্যাসের নায়ক রকঁত্যার ভাষায় :

The 'I' that goes on existing is merely the everlengthening stuff of gluey sensations and vague fragmentary thoughts…[২৪]

খ্রীস্টাশ্রয়ী এলিয়ট এবং বৈদান্তিক হাক্স্লি উভয়েই তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ শুধু নিরর্থ নয়, এই বোধই পাপের উৎস এবং সর্ববিধ দুঃখযন্ত্রণার হেতু। হাক্স্লির ভাষায় :

To be a se'f is the original sin, and to die to self, in feeling, will and intellect, is the final and all-inclusive virtue…[২৫]

আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা এলিয়ট অথবা হাক্স্লির মত পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত নন, তাঁরাও ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান। এঁদের মধ্যে যাঁরা আধুনিককালের সবচাইতে উগ্র এবং প্রভাবশালী ধর্মমত কম্যুনিজ্ম্ অবলম্বন করেছেন, তাঁদের বিচারে গোষ্ঠীসত্তাই একমাত্র সত্য, ব্যক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হলে তবেই নাকি সার্থকতা অর্জন করেন। অপরপক্ষে যাঁরা প্রাচীন অথবা অর্বাচীন কোনো ধর্মমতেই আস্থা রাখেন না, তাঁরাও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র্যে সংশয়ী। ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর অন্যতমা নায়িকা এলিনর পার্জিটার তাই সত্তর বছর পেরিয়েও নিজের অস্তিত্বের কেন্দ্রে কোনো আমিত্ব খুঁজে পান নি :

…somebody had talked about her life. And I haven't got one, she thought…Millions of things came back to her. Atoms danced apart and massed themselves. But how did they compose what people called a life ? She clenched her hands and felt the hard little coins she was holding. Perhaps there's 'I' at the middle of it, she thought ; a knot ; a centre…

…It's useless, she thought, opening her hands. It must drop. It must fall. And then? she thought…She looked ahead of her as though she saw opening in front of her a very long dark tunnel…[২৬]

একদিকে নিজের আমিত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে অপর মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষমতা। আর তারি সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই দুঃসহ উপলব্ধি যে ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং বিলয় উভয়ের প্রতি বিশ্বজগত সম্পূর্ণ উদাসীন, যে অস্তিত্বের গতিস্রোতে ব্যক্তির বিলয় অনিবার্য :

…the normal purpose for which life was framed; its complete indifference to the individuals, whom it swallowed up and rolled onwards…[২৭]

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মনে এই বোধ প্রশান্ত বেদনার সঞ্চার করেছে। অপরপক্ষে ফ্রানৎজ কাফ্‌কাঁর তীক্ষ্ণতর অনুভূতি এরই ফলে কল্পনা করেছে এমন এক জগৎ যা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত দমবন্ধকরা অথচ যা থেকে জাগরণ অসম্ভব। "দুর্গ" (Das Schloss) উপন্যাসের নায়ক আপ্রাণ সাধনা সত্ত্বেও কারো আত্মীয়তা অর্জন করতে পারল না। দুর্গের অধিবাসীরা তাকে ছাড়পত্র দেয় নি, গ্রামের মানুষরা তাকে বেগানা বলে সরিয়ে রেখেছে। হতাশ হয়ে সে শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছে: "To the peasants I don't belong and to the Castle I don't either…Nobody can be the companion of anyone here."[২৮]

অথচ কেন যে তার নিঃসঙ্গতা অলঙ্ঘনীয়, তা তার কাছে চিরদিন রহস্য রয়ে গেল। এবং এই একাকীত্বের মধ্যে সে কোন ঐশ্বর্য দেখেনি, এ তার কাছে অভিশাপমাত্র। "বিচার" (Der Prozess) উপন্যাসের নায়ক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারেনি কেন তার বিচার, কী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কে তার বিচারক, কী তার আইন! এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিষ্ফল, এবং সেই ব্যর্থতার মধ্যে কোনো বীরত্বের আভাস নেই। এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে রহস্যময় প্রহরীযুগল তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তামিল করার আগেই সে নিজের মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছে।

Into his mind came a recollection of flies struggling away from the fly-paper till their little legs were torn off…he

suddenly realised the futility of resistance. There would be nothing heroic in it were he to resist...to snatch at the last appearance of life in the exertion of struggle...[২৯]

স্যামুয়েল বেকেটের ট্রিলজিতে ব্যক্তির অস্তিত্বে আপজাত্য উপক্রান্ত; রিরংসা, পৈশুন্য, মর্ষকাম সর্বব্যাপী; নায়করা পঙ্গু মুমূর্ষু, রোমন্থক; নির্বেদ থেকে উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা তাদের নেই।

আর উদাহরণ বাড়াব না। বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ খ্যাতিমান পশ্চিমী সাহিত্যিকের রচনায় একথা সুস্পষ্ট যে হয় তাঁরা ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বেই সন্দিহান, আর নয়ত তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাঁদের বিশ্বাস যে ব্যক্তিত্বের বিলোপ অনিবার্য এবং প্রাতিস্বিকতার চেতনা নিরর্থ যন্ত্রণার উৎসমাত্র। রেনেসাঁসের কল্পনা ব্যক্তির অনন্যতা এবং সৃজনসামর্থ্য আবিষ্কার করে বিচিত্র পথে প্রস্ফুরিত হয়েছিল। উদারতন্ত্রী মনীষীরা ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্যকে সার্বলৌকিকতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকদের আর্ত অনুভবে ব্যক্তি যে রূপে দেখা দিয়েছে সেটি হোল:

Shape without form, shade without colour
Paralysed force, gesture without motion...[৩০]

চার

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই পরিবর্তনের কারণ কী? সংক্ষেপে গুটিকয়েক মূল সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ও প্রসারের ফলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হয় বটে, কিন্তু তারি সঙ্গে সমাজের অধিকাংশ মানুষ ক্রমে যন্ত্রের দাসে পর্যবসিত হন এবং তাঁদের ভাবনাচিন্তা, আচার-ব্যবহারে যান্ত্রিকতার লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। কারখানায় কাজ করতে গিয়ে কর্মীরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং সৃজনক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অপরপক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে একই ছাঁচে-গড়া অসংখ্য উৎপন্ন দ্রব্যে বাজার ছেয়ে যায়, এবং ভোক্তাদের রুচি ক্রমে একই ধরনের হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যা অল্পসংখ্যক লোকের হাতে প্রচুর বিত্ত ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে এবং সুপরিকল্পিত প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সবসাধারণের মনকে নিয়ন্ত্রিত করার মারাত্মক শক্তি উক্ত মুষ্টিমেয় মানুষদের হাতে এনে দেয়।

এইভাবে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হ্রাস পায়, অন্যদিকে যন্ত্রনির্ভর শক্তির নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনের সামনে ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং অসহায় মনে করে।

যন্ত্রবিপ্লব শুধু আর্থিক সংগঠনকে কেন্দ্রাভিগ করে নি, পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং দায়িত্বের দ্রুত সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করেছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে রাষ্ট্রের হাতে প্রভূত শক্তি কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই কেন্দ্রাভিগ প্রবণতা কয়েকটি দেশে সার্বিক (totalitarian) রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যুত্থানে পরিণতি পায়। এই ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান বলি ব্যক্তিস্বাধীনতা। এই ব্যবস্থায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যের ওপরে নির্ভরশীল। বিংশ শতাব্দীর সুসংগঠিত দাসতন্ত্রে ব্যক্তির প্রাইভেসী এবং স্বকীয়তা অস্বীকৃত, তার ভাবনা-চিন্তা, বিশ্বাস, ব্যবহার, অপর স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক, সমস্ত কিছু নির্দিষ্ট করার মালিক রাষ্ট্র। যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের এই সর্বময় ক্ষমতা না মানতে চান তাহলে তাঁর সামনে বিকল্প হোল মৃত্যুদণ্ড, আত্মহত্যা অথবা (সুযোগ মিললে) অন্যদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন।

সৌভাগ্যবশত সার্বিক রাষ্ট্রতন্ত্র এখনো পর্যন্ত গুটিকয়েক দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে সম্প্রতিকালে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কেন্দ্রাভিগতা দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যে অল্প কয়েকটি সমাজে বিগত দু-তিন শতাব্দী ধরে উদারতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, শুধু সেখানেই উপরোক্ত ধারাকে রোধ করার সচেতন প্রয়াস কিছু কিছু চোখে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ দেশে এই ধারার সমর্থনে বিভিন্ন গোষ্ঠীবাদী সমাজ-দর্শন জনসাধারণের মনে ক্রমেই প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। এই সব মতবাদ উনিশ শতকে উদ্ভাবিত হয়েছিল ; তবে এদের ব্যাপক প্রতিপত্তি শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে। মহাযুদ্ধের ফলে একদিকে ব্যক্তির অসহায়তাবোধ এবং অন্যদিকে ধর্ষকামী বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠায় এইসব মতবাদ বহু লোককে আকৃষ্ট করে। বস্তুত সমষ্টিবাদী মতবাদের প্রভাব ব্যক্তির মনে আত্মপ্রত্যয়কে শিথিল করে না দিলে একটির পর একটি দেশে দলবদ্ধ অল্পসংখ্যক বিদ্রোহীর পক্ষে সার্বিক রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়ে উঠত কি না সন্দেহ। অবশ্য আর্থিক, রাষ্ট্রীক, সামাজিক উপপ্লব শুধু কোনো মতবাদের প্রভাবে ঘটেনা ; কিন্তু মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন মতবাদের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা নিতান্তই মূঢ়তা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এইসব ব্যক্তিবিলোপী মতবাদের মধ্যে যেটি সবচাইতে মারাত্মক এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সেটি হোল কম্যুনিজ্‌ম্।

পৃথিবীর দুটি বিরাট দেশে এই মতবাদে বিশ্বাসীরা একচ্ছত্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে শুধু আর আপন আপন রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদে নিযুক্ত নেই। তাঁরা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ওপরেও নিজেদের প্রভাববিস্তারে ব্যাপৃত। সামষ্টিক সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তির বিলয় যে একই সঙ্গে কাম্য এবং অনিবার্য—উক্ত দুই রাষ্ট্রের পরিচালনায় বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বসাধারণের মনে এই মারাত্মক ধারণার বিষ ঐকান্তিক উদ্যমে সঞ্চারিত করে চলেছে। সম্প্রতিকালে রুশ এবং চীনের মধ্যে বিরোধ, এবং সেইসূত্রে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিদের মধ্যে ভাগাভাগি অথবা কোনো কোনো দেশে কম্যুনিস্ট পার্টিদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা কম্যুনিজ্‌মের সার্বিক এবং কেন্দ্রাভিগ মতবাদে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনেনি।

এখন যে মানুষদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ সবচাইতে সুস্পষ্ট, সেই শিল্পী, সাহিত্যিক বা মনীষী-সমাজ যে উপরোক্ত প্রবণতা অথবা মতবাদকে স্বাগত করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু একদিকে সাধারণ স্ত্রীপুরুষকে একই ছাঁচে ফেলে গড়ার দিকে যন্ত্রসভ্যতার ঝোঁক এবং অন্যদিকে তারি সমর্থনে সমষ্টিবাদী ভাবধারার প্রসার; একদিকে রাষ্ট্রের হাতে অপরিসীম ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং অন্যদিকে তারি ফলে সর্ববিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষণার ওপরে নির্ভরশীলতা; একদিকে সংগঠিত প্রচারের দ্বারা ব্যক্তির বিবেক, বিচারশক্তি এবং রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপক অপচেষ্টা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ লঙ্ঘনের পরিণামে কঠোর শাস্তির ভয়—সব মিলে আধুনিক কালের জ্ঞানীগুণীদের মনে ব্যক্তির অক্ষম, অসহায়, আত্মঘাতী রূপ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁদের কল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিলোপ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি তাঁদের অনেকেই ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে আস্থা হারিয়েছেন। নিজেরা প্রখর স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অনেকে তাই প্রাচীন অথবা অর্বাচীন বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যবিলোপী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। পাউণ্ড, ব্রেখ্‌ট্‌ অথবা এলিয়টের মত প্রোজ্জ্বল সৃজনক্ষম ব্যক্তিত্ব এ যুগে কজনের মধ্যে দেখা যায়? এঁরা প্রত্যেকেই স্বকীয় রুচি এবং বিবেকের নির্দেশে আপন দেশ এবং সমাজ ত্যাগ করে অন্যত্র স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন। অথচ "সর্গমালা" (Cantos)-র মহাকবি শেষে মোক্ষ খুঁজলেন ফাসিজম্‌-এ; ব্রেখ্‌ট্‌ নিজের নাস্তিক্য সহ্য করতে না পেরে অবলম্বন করলেন কম্যুনিজ্‌ম্‌; আর এলিয়ট আশ্রয় নিলেন খৃস্টধর্মে। যাঁরা এঁদের মত আত্মপ্রবঞ্চনায় অনিচ্ছুক, তাঁরা কোনো মতবাদে দীক্ষা না নিলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্লৈব্য, মর্ষকামিতা এবং পরতন্ত্রের আধিক্য লক্ষ্য করে সম্প্রতি বিমূঢ়।

এই মনোভাবকে আরো প্রবল করে তুলেছে আধুনিককালে বিভিন্ন শাস্ত্রের অতিসরলীকৃত নানা ব্যাখ্যা। প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে মহাশূন্যে শক্তির সমবিকিরণের ফলে একদিন এই বিশ্বজগতের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। তা থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে মনুষ্যজাতির বিলোপ যখন সুনিশ্চিত, তখন ব্যক্তির বিলোপ নিয়ে চিন্তা করা পণ্ডশ্রম (যে নিতান্ত সহজ কথাটা এঁদের অনেকেরই মনে আসেনি সেটা হোল, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানি বলেইত আমার জীবনকে রূপে রসে গন্ধে সার্থক করে তোলার এত তাগিদ। আলবেয়ার কাম্যুর ভাষায় বলা যায় যে বিশ্বজগতের নির্বোধ নিরর্থকতার বিরুদ্ধে সার্থকতার সাধনায় নিষ্ঠাবান থাকার মধ্যেইত আমার মনুষ্যত্ব)।[৩১] ব্যবহারবাদীদের মতে ব্যক্তির ভাবনা, চিন্তা, আদর্শ, রুচি, বিবেক সবই নাকি বিশেষ বিশেষ ঘটনাচক্রের পৌনঃপুনিক অভিঘাতের ফল। সুতরাং ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারেন, এ ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিকের অনুমান যে ব্যক্তির চেতনা অভিজ্ঞতার প্রবাহ মাত্র; কার্তেসীয় "অহং" প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। অপরপক্ষে অনেক মনোবিশ্লেষকের ধারণা, ব্যক্তির সচেতন জীবনযাত্রা অবচেতন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে চৈতন্যের সূত্রে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিকাশধর্মী ঐক্য অর্জন করে, তার সামর্থ্য আসলে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এদিকে আবার বহু নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন 'সভ্য' এবং 'অসভ্য' সমাজের তুলনামূলক বিচারের সূত্রে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন যে সভ্যতার নাতিস্থূল আবরণের আড়ালে মানুষের আদিম মন আজো প্রবলভাবে সক্রিয়। এবং নব্যযুগের অনেক খ্যাতিমান সমাজশাস্ত্রীও ঘোষণা করেছেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন ব্যক্তিমানসের অধৃষ্য নিয়ামক; যে মানুষের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধের চাইতে যূথচারিতা এবং অভ্যাসাশ্রয়িতা অনেক বেশী প্রবল, যে মুষ্টিমেয় অধিকর্তার পরিচালনায় জীবননির্বাহ করাই অধিকাংশ মানুষের নিয়তি।

বলা বাহুল্য, এইসব ভাবধারা সমকালীন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে ব্যক্তির স্বকীয়তা এবং সামর্থ্যের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বাড়িয়ে চলেছে। তাসত্ত্বেও যেটুকু-বা আত্মপ্রত্যয় বজায় থাকত, তিরিশ বছরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তারও প্রায় আমূল উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। বহু মানুষের ব্যক্তিগত বোধবুদ্ধিকে অসাড় করে না দেওয়া পর্যন্ত না সম্ভব যুদ্ধপ্রস্তুতি, না যুদ্ধপরিচালনা। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে যাঁরা অসংখ্য লোককে অসহায়ভাবে মরতে অথবা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যেতে দেখেছেন তাঁদের পক্ষে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যে আস্থা রাখা প্রায় অসম্ভব। হিরোশিমার পরে এই অসহায়তাবোধ আজ সর্বব্যাপী আকার ধারণ করেছে।

পাঁচ

ইতিহাসের পটভূমি থেকে স্বাতন্ত্র্যসমন্বিত মানুষের অপসরণ তাহলে কি অনিবার্য? এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যাঁরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে পড়েছেন অন্তত তাঁদের কাছে একথা নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে আমি এ জাতীয় ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় আস্থাহীন। নিসর্গের জগৎ একদিন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে এবং তার বহুপূর্বে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হবে, এ প্রস্তাব যদি সত্য হয়, তা থেকে এসিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে না যে পৃথিবীতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য চেষ্টা করবে না, অথবা মনুষ্যজাতির কাছে ব্যক্তির স্বকীয়তা মূল্যহীন বলে প্রতিপন্ন হবে। মূল্যায়ন মানুষের অন্যতম মূল এবং বিশিষ্ট বৃত্তি। পৃথিবীতে মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন সে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাবে। তার বিচারে সাময়িক ভুল হতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস ঘুরে ফিরে মানুষ এই সত্যই আবিষ্কার করবে যে প্রতিমানুষের একটি অনন্য সত্তা আছে, এবং সত্তাই সমস্ত মূল্যের স্রষ্টা।

দার্শনিক কূটতর্ক বাদ দিয়ে সহজ বোধবুদ্ধির সাহায্যে যদি ব্যাপারটা নিয়ে কেউ একটু ভাবেন, তাহলে আমার এই বিশ্বাস হয়ত তাঁর কাছে একেবারে অসঙ্গত ঠেকবে না। সংগঠিত প্রচারের দ্বারা ব্যক্তির রুচি এবং বিবেকবোধকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, একথা সত্য বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও কি চোখে পড়ে না যে আমাদের আশেপাশে বিস্তর সাধারণ লোক ছোটবড় নানা ব্যাপারে চলতি ধারণাকে অগ্রাহ্য করে নিজের ভালমন্দবোধ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করছেন? তার দেহ এবং দেহজাত মন প্রত্যেকটি মানুষকে জগৎ থেকে পৃথক করেছে। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো ভাবেই এই পার্থক্য সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে না। এই বিশিষ্ট প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অত্যন্ত গভীর বলেই না মৃত্যুতে আমাদের এত অনীহা।

সার্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিকে যন্ত্রে পর্যবসিত করার প্রচুর চেষ্টা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এত সুপরিকল্পিত, সংগঠিত চেষ্টা সত্ত্বেও ঐসব দেশে ব্যক্তিকে কি পুরোপুরি যন্ত্রে রূপান্তরিত করা গেল? ঐসব রাষ্ট্রের কর্তারাই কি বার বার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং প্রতিরোধের উপস্থিতি স্বীকার করেন না? সোভিয়েট ইউনিয়নে, পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট্ দেশগুলিতে, মহাচীনে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হেরেসি কি এত পীড়ন সত্ত্বেও উৎসাদিত হয়েছে? অপরপক্ষে স্পেনে এবং পর্টুগালে দীর্ঘ কয়েক দশকের ফাসিস্ত্ শাসন কি আমাদের চোখের

সামনেই ভেঙে পড়ল না? খাওয়া, ঘুমোনো, ভালবাসার মত স্বাধীনতা যে মানুষের একটি মূলবৃত্তি এ প্রস্তাব কি অভিজ্ঞতা-সমর্থিত নয়?

যান্ত্রিক সংগঠন, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, সমষ্টিবাদী মতবাদের প্রচার, ব্যাপক বিজ্ঞাপন, সমস্ত কিছুর চাপ সহ্য করেও আজো কি দেশে দেশে এমন মানুষ দেখা দিচ্ছেননা যাঁরা বিবেকী, বীর্যবান, সৃষ্টিশীল, আত্মপ্রত্যয়ী? শুধু যে অজানাকে জানার আগ্রহে আজো মানুষ দুরধিগম্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে বা অরণ্যে এবং মরুদেশে ঘুরছে, তাই নয়। প্রবল অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত মানুষ আজো দুর্লভ নয়। নিজের সাধনায় একনিষ্ঠ ব্যক্তি আজো আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে চোখে পড়ে। সংখ্যায় এঁরা অল্প; কিন্তু এঁদের মধ্যেই কি মনুষ্যত্বের বিকাশ সব চাইতে সুস্পষ্ট নয়? ব্যক্তিত্ববিলোপের যন্ত্রণা যাঁদের অনুভূতিতে সব চাইতে তীব্র স্পন্দন তুলেছে, সেই শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা নিজেদের সৃষ্টিকর্মের দ্বারাই কি ব্যক্তির সামর্থ্য এবং ব্যক্তিত্বের মূল্য প্রমাণিত করছেন না? তাঁরা শূন্যতার কথা বলছেন বটে; কিন্তু তাঁদের কল্পনা সেই শূন্যতাবোধকে রূপের মধ্যে ধারণ করার ফলে শূন্যতা কি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি? এই অর্থসমৃদ্ধ রূপ কি মানুষের সৃজনক্ষম ব্যক্তিসত্তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

অবশ্য এসব স্মরণে রেখেও আমি স্বীকার করি যে আধুনিক কালে ব্যক্তিত্ববিনাশী প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। এত প্রবল যে আধুনিক কোনো শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা মনীষী যদি এ বিষয়ে অনবহিত থাকেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টি এবং ভাবনা এ যুগের অনুভূতিশীল এবং বিদগ্ধ পাঠকপাঠিকার হৃদয়সম্বাদী হতে পারে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নেই যে এই প্রবণতাকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া মানুষের পক্ষে অসঙ্গত; এবং একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের মনে ছোটবড় প্রতিরোধ গড়ে ওঠার ইতস্তত চিহ্ন আমাদের নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। আজকের শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাবুকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তাঁদের অনুভবে এবং কল্পনায় এযুগের বৈনাশিক প্রবণতা যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনি ব্যক্তির সৃজনধর্মের ইঙ্গিতও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক। এই সৃজনধর্মের প্রমাণ যদি তাঁরা অন্য কোথাও না খুঁজে পান, তাঁদের নিজেদের শিল্পকর্ম এবং মনস্বিতার মধ্যে তার অসংশয় প্রমাণ পাবেন। আর যেহেতু অপরের চিত্তে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চারিত করায় তাঁদের জুড়ি নেই, সেহেতু এ আশা হয়ত নিতান্ত দুরাশা নয় যে তাঁদের সেই শিল্পোজ্জ্বল ইঙ্গিত একদিন অন্য মানুষদের মনেও নিজেদের ব্যক্তিত্বে এবং মনুষ্যত্বে বিশ্বাসকে আবার উজ্জীবিত করে তুলবে।

রূপদর্শী-কে খোলা চিঠি

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা

কল্যাণীয়েষু,

খোলা চিঠি, যা আধা চিঠি, আধা প্রবন্ধ। চিঠির খাস কামরায় বাইরের মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; প্রবন্ধের আমদরবারে নিয়মকানুনের ভারি কড়াকড়ি। যে প্রসঙ্গ তুলব ভেবেছি সে সম্পর্কে তুমি ছাড়া আরো কিছু পরিচিত এবং অপরিচিত লোকের আগ্রহ থাকা সম্ভব। অপর পক্ষে বেশ কয়েক বছর বাইরে কাটানোর ফলে বাংলাদেশের পাঠকপাঠিকাদের মুখ আমার স্মৃতিতে কিছুটা ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে; ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অন্তত এমন একজন পাঠক সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দরকার যার এবং আমার মানসিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্রতিষঙ্গ বর্তমান। চেনাজানা বাঙ্গালী বন্ধুদের মধ্যে তোমার চাইতে সুবেদী পাঠক কোথায় পাব?

বছর পঁচিশেক আগে যখন তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় তখন আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান ছিল। বয়সের খুব তফাত না থাকলেও তুমি তখনো মফস্বলের মানুষ, অবস্থাচক্রে পড়াশুনোয় বেশীদূর এগোতে পারনি, তোমার মধ্যে যে প্রতিভা আছে তার খোঁজ অন্যেরা দূরে থাক, তুমি নিজেও জানতে না। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলের তুমি ছিলে একজন অখ্যাত কর্মী। আর সেই হিশেবেই কৃষ্ণনগরে তুমি নিজে থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলে। আমি কলকাতায় জন্মেছি, বড় হয়েছি (পারী, লণ্ডন ন্যুইয়র্কের সঙ্গে তুলনীয় যে শহর), পরিচয়ের বছর খানেক আগে থেকে অধ্যাপনা শুরু করেছি, বাংলায় এবং ইংরেজিতে আমার খান দুই বই ইতিমধ্যে ছাপা হয়েছে, দ্বিতীয় বইটিতে স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। ফলে, আমাদের মধ্যে সমানে সমানে সখ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সহজ ছিল না। তোমার প্রতিন্যাসে শ্রদ্ধার ভাবটা ছিল অনেক বেশী প্রবল, আমার দিক থেকে ছিল স্নেহ।

কিন্তু যেহেতু সব কিছুকেই বিশ্লেষণ করে দেখা আমার আকৈশোর অভ্যাস (অনেক শুভার্থীর মতে, বদভ্যাস), সেহেতু প্রায় প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই আমি লক্ষ করি যে তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে একটা পারস্পরিক পূরকতার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত। তুমি যখন জীবনের নানা ঘাটে জল খেয়ে বেড়াচ্ছ, আমি তখন সারাদিন ডুবে আছি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ফয়েরবাক্‌, মার্কস্‌, এঙ্গেলস্‌,

প্লেখানভ্‌, রোজা লুক্সেমবুর্গের কেতাবাদির মধ্যে। দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা, তাচ্ছিল্য, সমাজ-সংসারের কাছ থেকে পাওয়া নিরন্তর আঘাত তোমাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। তোমার প্রবল প্রাণশক্তি, অতন্দ্র কৌতূহল, সহজাত কৌতুকবোধ তোমাকে রক্ষা করেছে অসূয়া, হীনমন্যতা এবং ব্যাথিত নির্বেদ থেকে। অভিজ্ঞতার মক্তব থেকে তুমি শিখেছ সাধারণ মানুষের মধ্যে অসামান্যতাকে খুঁজে পাওয়ার সহজ সূত্র। পরিচয়ের গোড়া থেকেই বুঝতে পারি মানুষকে ভালবাসা তোমার স্বভাব—কেতাবী নির্দেশে নয়, নিজের তাগিদেই তুমি সব সরহদ্দ পেরিয়ে অন্যের মনের অন্দরে আসন জুড়তে পার। পরে তুমি যখন তোমার প্রথম বই "এই কলকাতায়" লেখ তার প্রাণৈশ্বর্যের উৎস ছিল তোমার এই নির্ব্যূঢ় মানবতা।

সে সময়ে তোমার সঙ্গে আমার মনের বৈসাদৃশ্য ছিল স্পষ্ট। আত্মীয়, পরিজন, সতীর্থ, সহকর্মীদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ দুর্বল; চারপাশের স্ত্রী-পুরুষদের সম্পর্কে আমি প্রায় কৌতূহলহীন, অপরিচিত-জনের সান্নিধ্যে আমার অপাটব স্বজনমহলে প্রসিদ্ধ; দু চারজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু (এবং বান্ধবী) থাকলেও সাধারণ মানুষদের হৃদ্যতা অর্জনের ব্যাপারে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। প্রলেটারিয়েটের বৈপ্লবিক বীর্যবত্তা সম্পর্কে মনে তখনো ভরসা ছিল বটে, কিন্তু কি করে মজুর চাষীর মুনাসীব হতে হয়, কেতাবে কিংবা অনুভূতির মধ্যে তার কোনো হদিস পাইনি (মার্কস্‌ পেয়েছিলেন কি?)। আমার আজনবী চেতনার দোরোখা কাঁথার একপিঠে বুনেছি ঋতুরঙ্গের বিচিত্র প্রতিরূপ, অন্যপিঠে বিভিন্ন দেশ-কালের মানস অন্বেষণের স্বনির্বাচিত হক্কিকত। কলকাতায় যে প্রায় হাজার জাতের তরুলতা আছে তাদের অনেকেরই জীবন-বৃত্তান্তের সঙ্গে সেকালে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অপরপক্ষে, আমার অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে নিজের মনে প্লেটোর সঙ্গে তর্ক করে, তরুণী সুন্দরীর চাইতেও স্পিনোজার সঙ্গ মনে হয়েছে বেশী লোভনীয়, হল্‌বাখ্‌, হেলভেশিয়াসের লেখা পড়ে হাজার তারিফ করেছি, টার্গেনেভ্-কে মেনেছি নিকট আত্মীয় বলে।

গত প্রায় হাজার তিনেক বছর ধরে নানা দেশকালের প্রচেতারা ভাব-ভাবনার যে জগৎ গড়েছেন সেখানে ছিল আমার নিত্য আনাগোনা, যদিও পড়শী মানুষদের মধ্যে বেগানা হিশেবে বাস করতে আমি প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

তোমার সঙ্গে ক্রমে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে তার ফলে আমার কম লাভ হয়-নি। তোমার সূত্রে নানাপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে; মনীষার দীপ্তি না থাকলেই যে মানুষ নীরস হয় না এটা বুঝতে শিখি; সাধারণ মানুষের সুখ-

দুঃখের মধ্যে রসের খোঁজ পাই। আমি প্রধানত ইংরেজিতেই লিখতাম। সে সময়ে বাংলায় কালেভদ্রে যেটুকু লিখেছি তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সুধীন্দ্র দত্তের উৎসাহে এবং প্রভাবে; সে সব লেখায় চিন্তার যেটুকু গাঁথুনি ছিল ভাষায় তার তুলনায় কোনো স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি। এখনো যেমন মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমনি বাংলাভাষায় নিজের কথা গুছিয়ে বলার ব্যাপারে আমি মাঝে মাঝে আড়ষ্ট বোধ করি। তবু যেটুকু স্বচ্ছন্দতা এসেছে তার জন্য তোমার কাছে আমার ঋণ কম নয়। তোমার (এবং পরে তোমার সূত্রে সাগরময়ের) আগ্রহ না থাকলে আমি সম্ভবত কোনো দিনই "দেশ" পত্রিকায় লেখার কথা ভাবতাম না, এবং "দেশ" পত্রিকায় না লিখলে আমার বাংলা লেখার রীতি "প্রেক্ষিত" থেকে "সাহিত্যচিন্তা"য় পৌঁছত কিনা সন্দেহ। সে হিশেবে আমার কাছে তোমার ঋণ খুবই কম। তবু স্মরণ করতে ভাল লাগে যে, স্টর্ণের লেখার সঙ্গে তোমার পরিচয় আমিই ঘটিয়েছি; দিদেরোর "নিয়তিবাদী যাক্"-এর খবর আমি না দিলে তোমার নিজের পক্ষে খুঁজে বার করতে হয়তো অনেক বেশী সময় লাগত; এবং আধুনিক পশ্চিমী ভাবধারা সম্পর্কে তোমার কৌতূহল উদ্রেকের ব্যাপারে আমার কিছুটা হাত আছে। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ হকীকৎ-কে মূল্য দিতে, আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে চেষ্টা করেছি যুক্তিনির্ভর অন্বেষণের উদ্যমে।

অবশ্য আমাদের মন সমান্তরাল পথে চলতে পারত যদি না আমাদের পারস্পরিক অনুরাগের মূলে গভীর কোনো মিল থাকত। পশ্চিমে যাকে বলা হয় র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্, বাংলায় যার কোনো প্রতিশব্দ ভেবে পাই না (মৌলতন্ত্র? রাজশেখরবাবু জীবিত থাকলে তাঁর দ্বারস্থ হতাম), পরিচয় হবার আগে থেকেই তুমি আমি সেই পথের পথিক। ঈশ্বর, আত্মা, মোল্লা-পুরুত, মন্ত্র-মাদুলি, জাত-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদিকেই শুধু আমরা অমূলপ্রত্যক্ষ বলে খারিজ করিনি; ভূগোল-প্রতিমার পূজো আমাদের কাছে কৌতুকাবহ ঠেকেছে; জাতিপ্রেম এবং সাম্প্রদায়িকতা উভয়কেই আমরা ব্যাধিত প্রত্যয় হিশেবে গণ্য করেছি। নিজের নিজের অনুসন্ধানের সূত্রে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে মানুষ স্বয়ং তার ভাগ্যবিধাতা; ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য মানুষের বাইরে কোনো তুরীয় প্রাধিকার খোঁজা নিষ্ফল এবং নিষ্প্রয়োজন; ব্যক্তির নিহিত সৃজনক্ষমতার বিকাশে যা কিছু সাহায্য করে তাই শ্রেয় এবং যা সেই বিকাশে বাধা দেয় তাই অকৃত্য। পরম্পরার চাইতে উদ্‌ভাবনাকে আমরা বেশী মূল্য দিয়েছি; কোনো মৌরুসীস্বত্বে আমাদের আস্থা ছিল না; সব রকমের আমড়াগাছিকে আমরা ঘৃণা

করেছি ; নানা উপায়ে অন্যদের বঞ্চিত করে যারা ক্ষমতায় আসীন, প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, এবং নানাকারণে সমাজে যাঁরা নীচের তলার মানুষ তাঁদের পক্ষে হয়ে লড়াই করা গোড়া থেকেই আমাদের মনে হয়েছে সঙ্গত কাজ। এই কারণেই আমরা তরুণ বয়সে মার্কসীয় ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম (কম্যুনিস্টদের নির্বোধ, নিষ্ঠুর এবং অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও সে আকর্ষণ অন্তত আমার ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি শিথিল হয়নি), এবং যৌবনে মানবেন্দ্রনাথের রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রতি। বাংলাদেশের যে সব ভাবুক এবং সাহিত্যিককে আমরা দুজনে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেছি—উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, তারপর রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল এবং আমাদের অগ্রজদের মধ্যে "তারুণ্য", "প্রকৃতির পরিহাস" এবং "পুতুল নিয়ে খেলা"র অন্নদাশঙ্কর, "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী"র শিবরাম, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— তাঁদের চরিত্রে এবং চিন্তায় র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্-এর লক্ষণ স্পষ্ট। যাকে আমি আমার একটি লেখায় "মৌমাছিতন্ত্র" আখ্যা দিয়েছি, তুমি আমি দুজনেই আগাগোড়া তার বিরুদ্ধপন্থী। গান্ধীবাদী অতিনৈতিকতার মধ্যে আমরা যেমন পরোৎকর্ষের সন্ধান পাইনি, উগ্র জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্রকে "নেতাজী" আখ্যা দিয়ে উদ্দীপ্ত হতে আমাদের তেমনি বেধেছে।

র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম-এর সূত্রে এই মিল আমাদের মধ্যে ব্যবধানকে বাধা হতে দেয়নি, বরং যা হতে পারত সমান্তর তাকে করেছে পূরয়িতা।

দুই

এ তো গেল পূর্বরঙ্গ। আসল কথায় আসি। মাস তিনেক আগে এক ভিজে সকালে পুরোনো দিনের মত তোমার ঘরে আমরা আড্ডায় বসেছিলাম। ছিল চা, সিঙ্গাড়া, মুড়ি এবং তুলুর হাসিমুখের অকৃপণ আতিথ্য। খবর পেয়ে হাজির হয়েছিলেন কিছু সাহিত্যিক বন্ধু—যতদূর মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী, নরেন মিত্র, গৌরী ভট্টাচার্য, সন্দীপন চাটুজ্যে, অরুণ ভট্টাচার্য এবং তরুণ কবি মহ্‌বুব তালুকদার। সেখানে যে সব প্রসঙ্গ উঠেছিল—যা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে তক আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি তার কয়েকটি এই চিঠিতে আবার তুলতে চাই।

আমরা যারা জীবনের মৃতাগ্নিক নানা সমস্যা নিয়ে ভাবি এবং সেই ভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে অন্যদের মনে পৌঁছে দেবার কমবেশী মুরদ রাখি (কখনো মুখের

কথায়, কখনো বা লিখে)—ইংরেজিতে যাদের বলা হয় ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল, চলতি বাংলায় বুদ্ধিজীবী (বাংলা প্রতিশব্দটি আমার মোটেই পছন্দসই নয়, কিন্তু ভাবুক, মনীষী, বুজুর্গ্‌ কিংবা প্রাজ্ঞ বোধ হয় আরো বেমানান প্রতিশব্দ)—সমকালীন ভারতে তাদের স্থান, বৃত্তি, ক্রিয়াকর্মের চেহারাটা কেমনতর ? এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউবা শিল্পী-সাহিত্যিক, কেউ গবেষক-অধ্যাপক কিংবা ছাত্র, কেউ আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বাস্তুকার, কেউবা রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসাদার কিংবা সরকারী চাকুরে—কিন্তু যে সব লক্ষণের জন্য তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা যায় তা হল : তাঁরা তথ্যের পিছনে তত্ত্ব খোঁজেন, ঘটনার পিছনে কারণিক পরম্পরা ; বিচার-বিশ্লেষণ না করে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তকে মেনে নেন না ; তাঁদের মন নিয়ত প্রশ্নশীল ; অনেক দিন ধরে চলে আসছে অথবা অনেক মানুষ সমর্থন করে বলেই কোনো অভ্যুপগমকে তাঁরা প্রমাণিত সত্য বলে গ্রহণ করতে গররাজি ; প্রতি প্রকল্পকেই তাঁরা যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে অভ্যস্ত। জাড্য, যূথচারিতা এবং একান্বয়ের প্রকোপ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা এঁদের প্রধান কাজ, এবং একাজ এঁরা করতে পারেন যেহেতু এঁদের মনে জিজ্ঞাসা নিত্য সক্রিয়। যে পেশাতেই থাকুন না কেন, পড়ে পাওয়া জবাবের মক্‌শ করতে এঁদের স্বভাবে বাধে ; মুফতে মেলা মন্ত্রের নিশ্চিতি এঁদের কাছে অশ্রদ্ধেয়।

এখন এই অর্থে বুদ্ধিজীবী প্রাচীনকালেও ছিলেন—সক্রেটিস-কে এঁদের আদি-রূপ ধরতে পার—তবে আধুনিক কালে এঁদের উপস্থিতি অনেক বেশী ব্যাপক এবং সক্রিয়ভাবে অনুভূত। গত চার পাঁচ শ' বছর ধরে পশ্চিমের চিন্তাজগতে এবং সমাজজীবনে যে প্রবল আলোড়ন চলেছে—যার ধাক্কা এই শতকে আর কোনো দেশই এড়াতে পারছে না—তাতে বুদ্ধিজীবীদের অংশ বিশেষভাবে স্পষ্ট। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে কিছু বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি নজরে পড়ে—কোনো কোনো উপনিষদে, অংশত বুদ্ধের এবং আরো অনেক প্রবলভাবে বৈশেষিক এবং চার্বাকপন্থীদের চিন্তায়—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে মনে হয় এদেশে প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত উপযুক্ত অর্থে বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় এবং প্রভাবের দিক থেকে নগণ্য। তাঁদের জায়গা দখল করেছেন শাস্ত্রকারেরা, টীকাকারেরা, পরের যুগে মহান্ত, পুরুত, মোল্লা-মৌলবীরা। এঁরা প্রশ্ন তোলেননি ; নিয়মের পরে নিয়ম বানিয়েছেন ; ঐহিক পারত্রিক উৎত্রাসনের ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসার সংবেশন ঘটিয়েছেন ; অতিপ্রজ্ঞ নিষেধের চাপে সমাজকে প্রায় গতিহীন করে তুলেছেন। পাঠান-মোগল যুগে প্রচলিত আচার-আচরণ ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যে সব আন্দোলন হয়েছে

তাদের প্রবর্তকেরা বুদ্ধিজীবী নন, তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই মরমিয়া। তাঁদের অস্মিতা স্বজ্ঞানির্ভর ; আরোহী-অবরোহী বিচার-বিশ্লেষণ তাঁদের কাছে বর্জনীয়।

পশ্চিমের তুলনায় ভারতীয় ইতিহাসে যে গতিহীনতা দেখা যায় তার নানা ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু সম্ভবত তুমি স্বীকার করবে যে তার একটা প্রধান কারণ হোল আমাদের পরম্পরানির্ভর সমাজ-সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের আশ্চর্য নিষ্ক্রিয়তা।

বুদ্ধিজীবীদের যেটি প্রধান লক্ষণ এবং বৃত্তি সেটি হচ্ছে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা কায়েমী ব্যবস্থার নৈতিক-মানসিক ভিত্তিকে দুর্বল করে সমকালীন মানুষদের সামনে বিকল্প নানা সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসা। আমাদের দেশে যাঁরা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁরা কায়েমী ব্যবস্থাকে আক্রমণ না করে স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে তাকে সমর্থন জুগিয়েছেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন জাতিভেদ-ব্যবস্থাকে মজবুত করতে, যে ব্যবস্থায় তাঁদের নিজেদের স্থান সমাজের সব চাইতে উপরতলায়। মোল্লা মৌলবীরা উঠেপড়ে লেগেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রবলতর করতে—যে গোঁড়ামির ফসল জমা হয়েছে তাঁদের খামারে। সমকালীন রাজ-শক্তিকে দুই পক্ষই জুগিয়েছেন পরিপোষণ এবং মন্ত্রণা, এবং তার পারিতোষিক হিশেবে রাজশক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন সমাজজীবনে এঁদের একচেটিয়া প্রতিপত্তি। ফলে, একদিকে সমাজ যেমন তার গতি হারিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই রক্ষণশীল বিদ্বজ্জনেরা হারিয়েছেন জিজ্ঞাসার সামর্থ্য—সংস্কৃতি হারিয়েছে উদ্ভাবনের স্ফূর্তি, বুদ্ধির আপজাত্য ঘটেছে যুক্ত্যাভাসে।

এই অবস্থা কিছুটা বদলাতে শুরু করে উনিশ শতকে। ইংরেজ এদেশে শুধু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি, পশ্চিমের প্রাণবন্ত ভাবধারার সঙ্গেও এদেশের কিছু মানুষের পরিচয় ঘটান। তার ফলে দেখা দিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা। এঁদের মেজাজ বেদস্তুর, এঁদের ভাবনার ঢঙ শাস্ত্রকার, টীকাকার, মোল্লা-মৌলবীদের মুতাবিক নয়। রামমোহন প্রথার উপরে স্থান দিলেন যুক্তিকে, শাস্ত্রের উপরে স্থান দিলেন ব্যক্তির বিবেককে। লোকহিতবাদী তাঁর "শতপত্রে" উপস্থিত করলেন বেশুমার নতুন জিজ্ঞাসা। ফুলে তাঁর "গোলামগিরি" পুস্তকে হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির একেবারে গোড়া ধরে টান দিলেন (যদি তোমার কোনো মারাঠীজানা বাঙ্গালী সাহিত্যিক বন্ধু থাকেন তাঁকে দিয়ে এই বই দুটির অনুবাদ করিও—এমন মুক্তবুদ্ধির পরিচয় ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে আর কোথাও পাবে কিনা সন্দেহ)। ডিরোজিওর ছাত্ররা শুধু তাঁদের লেখার মারফত নয়, তাঁদের বাঁচার স্টাইলের ভিতর দিয়েও ফুটিয়ে তুললেন যথার্থ বুদ্ধিজীবীর বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু বলার দরকার

করে না—ব্যাল্যান্টাইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শিক্ষাবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত চিঠিকে আমি তো নবযুগের ম্যানিফেস্টো বিবেচনা করি। আর নির্বোধ ব্যঙ্গের জবাবে তাঁর সেই যে প্রত্যয়ী উক্তি—বরং আলুপটল বিক্রি করে চালাব—তার মধ্যে শুনি স্বপ্রতিষ্ঠ অস্মিতার কণ্ঠস্বর। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের সেই আশ্চর্য পত্রের কথা তোমার মনে পড়ে? -"These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of". নিরীহ, নির্বীজ, সুরাপানবিরোধী হেডমাস্টার কি ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক কবির এই বেপরোয়া নির্ব্যাজ ঘোষণার মানে বুঝেছিলেন?

তিনি বুঝুন চাই নাই বুঝুন, ভারতীয় ভাবনা-কল্পনার মরা গাঙে এই আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা যে নতুন স্রোতের সঞ্চার করেন তা নিয়ে আজ আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এঁদের প্রাণের ধাক্কায় এক এক করে ভারতীয় ভাষারা সজীব হয়ে উঠল—জন্ম নিল গদ্যসাহিত্য, বিপ্লব ঘটল কবিতার জগতে। সমাজজীবনেও এঁরা কিছুটা আলোড়ন ঘটান—বিধবা-বিবাহ থেকে বিধানিক বিবাহ একটা স্মরণীয় যুগ—কিন্তু গভীরতা এবং ব্যাপকতায় তা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আর এইখানেই হয়তো আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের মূল দুর্বলতা। যে অন্বেষী প্রতিন্যাস বুদ্ধিজীবীর লক্ষণ, ইংরেজ আমলে সাধারণ মানুষের মনে তা কতটুকুই বা প্রভাব বিস্তার করে? দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাসী অশিক্ষিত চাষী—নতুন ভাবনা-কল্পনাকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রায় কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। মেয়েরা বেশীর ভাগ রয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে পর্দার আড়ালে, দেশের বিরাট মুসলমান সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন; শহুরে মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের হিন্দু পুরুষদের একটা অংশ বাদ দিলে বাকি প্রায় সকলেই পড়ে রইলেন কমবেশী ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবন-যাত্রার কবলে। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ অথবা জাপানের মতাবিক ভারতবর্ষেও যদি ব্যাপক শিল্পবিপ্লব ঘটত তা হলে সমস্ত সমাজের চেহারাটাই পালটে যেত। কিন্তু বিদেশীর শাসনাধীন উপনিবেশে তা তো সম্ভব ছিল না; ইংরেজ এদেশে সমাজবিপ্লব চাননি, চেয়েছিলেন শোষণের ক্ষেত্র।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা এখন আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। স্বাধীন চিন্তার তাকতে যে কায়েমী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা লড়বেন তার

একটা অংশ হচ্ছে তাঁদের নিজেদের জড়ভরত সমাজ-সংস্কৃতি, অন্য অংশ হচ্ছে দেশের ওপরে চাপানো ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থা। দুইয়ের সঙ্গে পাঞ্জা কষার তাকত তাঁদের ছিল না; অথচ এক অংশের সঙ্গে লড়তে গেলে অন্য অংশের সঙ্গে রফা করতে হয়। গোড়ার দিকে তাঁরা নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন—আশা ছিল, এ উদ্যমে বিদেশী শাসক নিজের স্বার্থেই সহযোগিতা করবেন। কিন্তু ক্রমে তাঁরা বুঝলেন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এ-আশা নিতান্তই অবাস্তব; বিদেশী শাসকদের চোখে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মুন্‌শী মাত্র; এদেশে স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ দেখলে তাঁরা আঁতকে উঠে যে-কোনো অজুহাতে তার প্রকাশ রোধ করতে প্রস্তুত; তাঁরা চান ঘুষ আর ধমক মিশিয়ে এমন এক পদ্ধতির প্রয়োগ যার ফলে বুদ্ধিজীবীরা পর্যবসিত হবেন শিরদাঁড়াহীন কেরানী মুৎসদ্দীতে। অপরপক্ষে, সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীরা দেখলেন এই উদ্যম তাঁদেরকে স্বজাতীয় সমাজ থেকে ক্রমেই সরিয়ে দিচ্ছে; না যন্ত্রবিপ্লব, না আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটায় তাঁদের ভাবনা-চিন্তা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে ফলপ্রসূ হতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই সমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব ত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তাঁদের মুখ্য উপজীব্য হিশেবে গ্রহণ করলেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশ হয়ে উঠলেন ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ তাঁদের সঙ্গে হাত মেলালেও অনেকেই ইংরেজবিরোধী না হয়ে হিন্দুবিরোধী হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁদের বিচারে মুসলমানদের বিকাশের পথে প্রধান বাধা বিদেশী শাসন নয়, তাঁদের নিজেদের সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মবিশ্বাসের গলদ এবং জড়িমা নয়, তা হল হিন্দুদের সংখ্যাগুরুত্ব এবং সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য। মোদ্দা ফল দাঁড়াল, কি হিন্দু, কি মুসলমান বুদ্ধিজীবী নিজেদের সমাজসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমেই হয়ে উঠলেন রক্ষণশীল, এবং তাতে যে শুধু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়ে দাঁড়াল তাই নয়, যে আত্মসমালোচনা উনিশ শতকে এদেশে রেনেসাঁসের সূচনা ঘটিয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে এল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এদেশে যখন রুশ বিপ্লবের ঢেউ এসে লাগে তখন মনে হয়েছিল বুঝিবা এবারে এই সঙ্কটের মোচন ঘটবে। এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আদি প্রবক্তা মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নানা লেখার ভিতর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের মত উপনিবেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরস্পর-নির্ভর, এর একটিকে অবহেলা করলে অন্যটিও ব্যর্থ হতে বাধ্য (১৯২২ সালে প্রকাশিত রায়ের বিখ্যাত বই "ইণ্ডিয়া ইন

ট্র্যান্‌জিশান" বহুদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল—সম্প্রতি বোম্বাই থেকে নতুন সংস্করণ ছাপা হয়েছে—আবার পড়ে দেখো—মূল বক্তব্য এতদিন পরেও অবান্তর ঠেকবে না)। বিশের এবং তিরিশের দশকে এদেশে কিছু বুদ্ধিজীবীর মনে এই যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিভাত হয়েছিল, তাঁদের লেখায় তার প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু তোমার আমার মত সেযুগের কিছু তরুণ এই চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হলেও এদেশের সাধারণ শিক্ষিত মনে মানবেন্দ্রনাথ অথবা অন্য র‍্যাডিক্যাল ভাবুকেরা গভীর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। মানবেন্দ্রের সঙ্গে কম্যুনিস্ট্‌দের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ১৯২৯ সালে; তিরিশের দশকের প্রথম ছ'বছর তিনি কাটিয়েছেন কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দীদশায়; তারপর ছাড়া পাওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একাগ্র অধ্যবসায়ে এদেশে র‍্যাডিক্যাল ভাবান্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সেচেষ্টা তাকে শেষ পর্যন্ত একাকিত্বে ঠেলে দিয়েছে। অপর পক্ষে, তিরিশের দশক থেকে এদেশের কম্যুনিস্ট্‌রা আগাগোড়াই সুবিধাবাদী এবং পরমুখাপেক্ষী; মুখে মার্ক্‌সীয় বুলি আওড়ালেও তাঁদের চিন্তায়, জীবনে এবং ক্রিয়াকলাপে নির্ব্যাজ র‍্যাডিক্যালিজম্‌-এর স্বাক্ষর ক্বচিৎ চোখে পড়ে; সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চাইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে, যে সমস্যার কথা আগে উল্লেখ করেছি তার সমাধানে কম্যুনিস্ট্‌দের দান নিতান্ত নগণ্য। স্বাধীন বুদ্ধির এবং নৈতিক সততার অভাব স্টালিনী যুগে প্রায় সব দেশের কম্যুনিস্টেরই সাধারণ লক্ষণ (স্টালিনের পরের যুগেও তাদের সেই অভাব যে হ্রাস পেয়েছে এমন মনে করার স্বপক্ষে খুব বেশী প্রমাণ দেখি না), কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে এই লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকট।

অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার আগে আমাদের দেশে সেই ধরণের বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সংখ্যায় খুব কম, যাঁরা এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আমূল পুনর্বিচারে উদ্যোগী, যাঁদের বলা যায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর-লোকহিতবাদী-ফুলের যথার্থ উত্তরসাধক। তোমার-আমার বয়ঃপ্রাপ্তির যুগের কথা যখন ভাবি, মনে পড়ে বাঙালী শিক্ষিত হিন্দুদের উপরে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব তখন কত প্রচণ্ড, অবাঙালী-হিন্দুদের ওপরে গান্ধীর এবং বেশীর ভাগ মুসলমানের উপরে উদীয়মান প্রৌঢ় নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার। অবশ্য জবাহরলালও সেই যুগেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন—কিন্তু তিনি তখনো গান্ধীর সমর্থনের ওপরে নিতান্ত নির্ভরশীল।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের সূর্যাস্ত মহিমা আমরা দেখেছি কিন্তু "নাম মঞ্জুর" গল্প থেকে "ল্যাবরেটরী"তে যে ভলতেয়ারি অগ্নিগর্ভতা বর্তমান তার

উত্তাপ এদেশের শিক্ষিত মনে কতটুকুই বা সঞ্চারিত হয়েছে? রামনামের সঙ্গে জয়হিন্দ, কিংবা আজানের সঙ্গে পাকিস্তান জিন্দাবাদ মেশালে কি মনের মুক্তি ঘটে?

তিন

তারপর দেশ দু'ভাগ হয়ে স্বাধীন হল। নবজীবনের সূচনা ঘটল সমাজবিপ্লবের পথে নয়, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে। মনে পড়ে সেই সব আর্ত, উদ্‌ভ্রান্ত দিন-রাত যখন ব্যাধিত পৈশুন্য আর যূথচারী ধর্ষকামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য সহযোগী মেলা কঠিন ছিল? গান্ধী সে সময়ে দেখা দিলেন নতুন রূপে—দেশব্যাপী প্রমত্ত শুভনাস্তিক্যের বিরুদ্ধে নির্ভীক্, প্রায় নিঃসঙ্গ, বিবেকী পুরুষ। গান্ধীবাদের বেশীটাই আমার কাছে অগ্রাহ্য ঠেকলেও গান্ধীর অনুকম্পায়ী পৌরুষকে সেদিন গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেছি। সে আলোও অকস্মাৎ নিবল।

কিন্তু আশা নেবেনি। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল স্রেফ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি তারই সঙ্গে ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন নব্য বুদ্ধিজীবী। কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর দ্ব্যর্থক রাজনৈতিক আচার-আচরণের যতই সমালোচনা করি না কেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার উদ্যমে তিনি যে একাগ্রচিত্ত তা নিয়ে তখনো সংশয় ছিল না, এখনো নেই। দেশের পুনর্গঠনে লোকায়ত চিন্তাকে তিনি বিশেষ মূল্য দিলেন; তাঁর চেষ্টায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ অনেকটা স্বীকৃতি লাভ করল; শুরু হল এক দিকে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা শিল্পবিপ্লবের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, অন্য দিকে উদ্‌বৃত্ত সম্পদকে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়নে নিয়োগের উদ্যম। রক্ষণশীল হিন্দুদের সংগঠিত বিরোধিতাকে হটিয়ে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা লোকসভায় নতুন সংহিতা পাস করালেন, যার ফলে এদেশের হিন্দু মেয়েদের অনেকগুলি মানবীয় অধিকার আইনের চোখে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। শুধু আইনের জোরে সমাজ বদলায় না—এ কথা তুমিও জান, আমিও মানি; হিন্দু সংহিতা আর হিন্দু সমাজের মাঝখানে ব্যবধান আজও স্পষ্ট; তবু সংস্কারের অন্যতম উপায় হিশেবে আইনের মূল্য আছে, সেটা লক্ষ না করলে ভুল হবে (আমার দুঃখ, এই সংহিতার সুযোগ শুধু হিন্দু মেয়েরাই পেয়েছেন—মুসলমান মেয়েদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এদেশে আজও নেতৃত্বের অভাবে নিতান্ত দুর্বল রয়ে

গেছে। নেহরুকে দোষ দেওয়া নিরর্থক—এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এমনি প্যাঁচালো যে যতক্ষণ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মুসলমান সমাজের সংস্কারে না নামছেন, অন্য কেউ সে চেষ্টা করলে ভালর চাইতে মন্দের আশঙ্কাই বেশী)।

নেহরুর নেতৃত্বে যে ব্যাপক রূপান্তরের উদ্যম শুরু হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সুফল আজ প্রত্যক্ষ। তোমার আমার শৈশবে এদেশে গড়পড়তা বাঁচার মেয়াদ ছিল তিরিশ বছরেরও কম—স্বাধীন ভারতে তা অন্তত বছর পনের দীর্ঘতর হয়েছে। জন্মের হারে রদবদল না ঘটলেও মৃত্যুর হার উল্লেখ্যভাবে কমেছে। দেশের অনেক অঞ্চলেই জমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; চাষীদের মধ্যে যাঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে তাঁরা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য নন। সদরে-মফস্বলে মেয়েরা বেশ কিছুটা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন; হিন্দুসমাজে যাঁদের একেবারে নীচের তলায় হেঁট করে রাখা হয়েছিল তাঁদের অনেকে আজ মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারছেন। যা হওয়া উচিত ছিল, যা হওয়া নিতান্ত জরুরী, তার হিশেবে উন্নতি যে যথেষ্ট হয়নি, এটা ঠিক। তবু দেশে যে আর্থিক-সামাজিক রূপান্তর ঘটেছে তার মধ্যে কিছুটা আশার চিহ্ন দেখতে পাই।

কিন্তু যেখানে সেই চিহ্ন সম্প্রতি প্রায় অপহৃত সেটা হল আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রে, ক্রিয়াকর্মে, আচার-আচরণে।

নেহরু নিজে বুদ্ধিজীবী ছিলেন বলেই হয়তো দেশের রূপান্তরের কাজে এঁদের সহযোগিতা খুঁজেছিলেন। পেছন ফিরে মনে হচ্ছে, সব মিলিয়ে এই সহযোগিতার ফল ভাল হয়নি। নেহরুর আমলেই বিপদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল, ইন্দিরার আমলে সেটা প্রায় বিপর্যয়ের আকার নিয়েছে। যাঁদের হবার কথা স্বাধীন সমালোচক তাঁদের অনেকেই হয়ে দাঁড়িয়েছেন সভাসদ, কর্মচারী। যাঁদের নির্বিশঙ্ক বিচার-বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, উদ্ভাবনা সমাজসংস্কৃতিতে নতুন সম্ভাবনা এবং বিকল্পের প্রতিশ্রুতি আনবে তাঁদের অনেকেই সরকারী তকমা, খেতাব, বৃত্তি, চাকরি কিংবা পৃষ্ঠপোষণার লোভে আশ্রয় নিয়েছেন বাক্‌ছলে, অবচয় ঘটিয়েছেন আপন আপন অস্মিতার, ভাগীদার হয়েছেন প্রশাসনিক অপচারের, হারিয়ে ফেলেছেন জিজ্ঞাসার সামর্থ্য, বিবেকের স্বপ্রতিষ্ঠ প্রাধিকার।

উপাত্তের প্রয়োজন আছে? তুমি শুধু সাহিত্যিক নও, সাংবাদিকও—হাঁড়ির খবর আমার চাইতে তুমি অনেক বেশী রাখ। তবু দু'একটা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করি। নেহরু তখনো তুঙ্গে, সেই সময়ে পারী শহরে একটা পুরো দিন কাটাই সর্দার পানিকরের সাহচর্যে। তিনি তখন ফ্রান্সে ভারতীয় রাজদূত, কিন্তু আমার সঙ্গে

তাঁর যেটুকু চেনা-জানা তা ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবী হিশেবে। পানিকর আমাকে খান কুড়ি উৎকৃষ্ট বইয়ের তালিকা দিয়ে বললেন, এগুলি ভারতবর্ষে সরকারী নির্দেশে নিষিদ্ধ, অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো ভারতীয় মনীষী এতাবৎ প্রতিবাদ করেননি (এর মধ্যে একটি বই তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন: অব্রি মেনেনের "রামা রিটোল্ড্"-ঝকঝকে লেখা—কাহিনীছলে হিন্দু অবতারতত্ত্বের ব্যঙ্গাত্মক পুনর্বিচার—টমাস মান ইহুদীদের "দশ হুকুম" নিয়ে যে ধরণের কাহিনী লিখেছিলেন)। তিনি নিজে কেন এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে নীরব—এই প্রশ্ন করায় পানিকর সোজা স্বীকার করলেন, "সরকারের কাছ থেকে সম্মান এবং চাকরির ঘুষ নিয়েছি যে।" তারপর তিনি বললেন, অন্য যেসব বুদ্ধিজীবী এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারাও মুখ খুলবেন না, কারণ হয় তাঁরা কোনো-না-কোনো সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কমিশনের সঙ্গে যুক্ত, নয় তাঁরা পদ্মশ্রী-জাতীয় খেতাব পেয়েছেন কিংবা কোনো আকাদেমি পুরস্কার, অথবা তাঁরা গোঁফে তেল মাখতে ব্যস্ত এই ধরণের কোন কাঁঠাল যদি তাঁদের বরাতে জোটে তারই প্রত্যাশায়।

প্রতিবাদ যে একেবারেই হয়নি তা সত্যি নয় (ভারতবর্ষে সেন্সরশিপ সম্পর্কে তুমি হয়তো অধ্যাপক এ. বি. শাহ্-র, আমার এবং সরকারী সম্পর্কহীন আরো কারো কারো প্রবন্ধাদি দেখে থাকবে)। কিন্তু এদেশে যাঁরা পণ্ডিত, সাহিত্যিক কিম্বা চিন্তাশীল হিশেবে খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই এসম্পর্কে নীরব। স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত এদেশে যে কত বই নিষিদ্ধ হয়েছে তার খোঁজ পর্যন্ত এঁরা রাখেন না। আমাদের গঠনতন্ত্রে যে সব মৌল অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে তা নিয়ে সকলে গর্ববোধ করেন, কিন্তু পদে পদে সেই সব অধিকারকে যে কাভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা নিয়ে কারো বিশেষ মাথাব্যথা দেখি না। এই স্বাধান রাষ্ট্রে অধ্যাদেশের জোরে কত স্ত্রীপুরুষকে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে তার হিশেব মেলা শক্ত, অথচ তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাহিত্যিক-সাংবাদিক-অধ্যাপকদের অংশ খুঁজতে অনুবীক্ষণ লাগে।

সরকারী অন্যায়ের সমালোচনায় যাঁরা নির্বাক্, শক্তিমানের সাফাই গাইতে কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আশ্চর্য পটুতা দেখা গিয়েছে। এটা বাংলার বাইরে বেশী প্রত্যক্ষ। দিল্লীতে কবি-সাহিত্যিকদের সম্মেলন, বিদ্বজ্জনদের আলোচনা সভায় এক সময়ে নেহরুর, এবং সম্প্রতি ইন্দিরার যেরকম নির্লজ্জ প্রশস্তি শুনেছি তা পুরোনো দিনের রাজচাটুকারদেরও হার মানায়। কিন্তু বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কি এই প্রতিন্যাস স্বাধীনতার পরে প্রবল হয়ে ওঠেনি? ছোটদের কথা

ছেড়ে দিলেও সেই সুবিখ্যাত অগ্রজ সাহিত্যিকের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়বে (খোলা চিঠিতে নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়), যিনি এক সময়ে কম্যুনিস্ট্‌দের সহযাত্রী ছিলেন, তারপর কম্যুনিস্ট্‌-বিরোধী হয়ে ওঠেন, এবং সেই অবস্থাতেই সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুরোধ পাওয়া মাত্র পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী কম্যুনিস্ট্‌ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কর্ণধারকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে গদ্‌গদ স্বাগত সম্ভাষণ লিখে মুখ্যমন্ত্রীকে পৌছে দেন। কম্যুনিস্ট্‌ ব্যবস্থার প্রতি যদি তাঁর সে সময়ে কোনো শ্রদ্ধা থাকত, তা হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমার আমার পরিচয় ছিল ; তিনি তাঁর কম্যুনিস্ট্‌-বিদ্বেষ গোপন করেননি ; অথচ এই অনুরোধ তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিলেন। কিংবা সেই বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানীর কথা মনে কর (ইনি বাঙ্গালী নন—বাংলার বাইরে অধ্যাপনা করার সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়), যিনি দীর্ঘদিন নানা দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কিভাবে বিত্তবান এবং দরিদ্রের মাঝখানে ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছে (বিশেষ করে কিভাবে এদেশের ভূমিহীন চাষমজুরদের আমরা দ্রুত সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি), অথচ যেই তাকে সরকার একেবারে উপরতলায় আসন দিলেন অমনি তার সমালোচনা ক্ষীণ হয়ে এল। এসব যে মোটেই ব্যতিক্রম নয় তা আমার চাইতে তোমার বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জানার কথা।

ভারতবর্ষে ফিরে গত ছ'মাস ধরে যে প্রতিষ্ঠানে আমি একটি বই লেখার কাজে ব্যাপৃত ছিলাম সেটি বয়সে অর্বাচীন হলেও দেশেবিদেশে তার ইতিমধ্যেই প্রচুর খ্যাতি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করা কিছু নবীন এবং প্রবীণ বিদ্বান্‌-বিদুষী এখানে গবেষণা করছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সরকারী উঁচু মহলে চেনাজানার সূত্রে এখানে আসার সুযোগ পেলেও বাকী বেশীর ভাগ সদস্যই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু এখানেও দু'মাসে যেটুকু অভিজ্ঞতা হল এদেশের জ্ঞানীগুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখায় তা মোটেই সাহায্য করে না। এঁরা নিজেদের গবেষণার স্বাধীনতার চাইতে আপন আপন গবেষণা-বৃত্তিকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে দীর্ঘস্থায়ী করার সমস্যা নিয়েই বেশী উৎকণ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অথবা নীতি-নির্ধারণে গবেষকদের কোনো অংশ বা দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগ স্বীকার করেন নি। যা কিছু সিদ্ধান্ত তা নেন দিল্লীতে বসে এই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি (যার সভাপতি স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী), এবং তার সঙ্গে গবেষকদের যোগাযোগের কোনো প্রবিধান নেই।

মাস কয়েক আগে এখানে একটি সপ্তাহব্যাপী সেমিনার হয়। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে

এদেশীয় মনীষীদের তারা মৈত্রীর কিছু নিদর্শন সেই সূত্রে পাওয়া গেল। এলেন রাজ্যপাল, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, মায় প্রাক্তন মন্ত্রী ; তাঁদের সামনে কায়িক অর্থে না হোক মানসিক অর্থে প্রায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন এই উচ্চ গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং এখানকার অধিকাংশ সদস্য (পূর্বে যিনি পরিচালক ছিলেন তিনি শুনেছি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং সম্মান রক্ষায় বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আমি যাঁর কথা বলছি তিনি যদিও কবি এবং বিদ্বান ব্যক্তি, তাঁর চরিত্রে প্রত্যয় এবং বলিষ্ঠতার অভাব আমাকে বিশেষ পীড়া দিয়েছে। তিনি সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন, এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে পরিচালকহীন)। যে দু'চারজন গবেষক-সদস্য মন্ত্রী এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের অসম্বদ্ধ উক্তির কিছুটা সমালোচনার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের ওপরে চাপ পড়ল তাঁরা যাতে সেমিনারের তৈলাক্ত প্রশান্তি না নষ্ট করেন।

এই সেমিনার যখন হয় তখন আমি সবে এখানে যোগ দিয়েছি। ফলে এটির পরিকল্পনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারপর আরেকটি সেমিনার ডাকার সিদ্ধান্ত হয়—এটির আলোচ্য বিষয় : "ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ, দায়িত্ব" ইত্যাদি। অন্য কয়েকজন স্থানীয় গবেষক-সহকর্মীর সঙ্গে এটি পরিকল্পনা করার আংশিক দায়িত্ব আমার ওপরে পড়ে। আলোচনার বিষয়সূচী সম্পর্কে একটি খসড়া তৈরি করি, এবং কমিটিতে বিচার-বিবেচনার পরে কিছু রদবদল সমেত সেটি গৃহীত হয়। কিন্তু আলোচনায় অংশ নেবার জন্য প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে তার তালিকা তৈরী করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল। আমরা সেমিনার কমিটির কয়েকজন সদস্য প্রস্তাব করি যে, এই আলোচনায় সরকারী মাতব্বরদের কোনো অংশ থাকবে না, শুধু যেসব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি আপন আপন ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা এবং অথবা মূল্যবান গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের ভিতর থেকেই কয়েকজনকে বাছাই করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হবে। কিন্তু দেখা গেল, স্বয়ং পরিচালক এবং কমিটির অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রপাল, মন্ত্রী প্রমুখদের বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় অবিশ্বাসী। শেষ পর্যন্ত যদি বা তাঁদের নিমরাজি করানো গেল, আরেক আপত্তি উঠল। আমরা তালিকায় যাঁদের নাম প্রস্তাব করি তাঁদের কয়েকজন সম্পর্কে শোনা গেল যেহেতু তাঁরা বেতরভাবে নিজের নিজের বেদস্তুর মতামত প্রকাশ করে থাকেন (যেমন মহীশুরের কবি-প্রাবন্ধিক গোপালকৃষ্ণ আদিগা, দিল্লীর নীরদ চৌধুরী ইত্যাদি,) সেহেতু তাঁদের নিমন্ত্রণ করা সঙ্গত হবে না, অথবা তাঁদের ডাকলে

দিল্লীর কর্তৃপক্ষ নানা কারণে নারাজ হতে পারেন (যথা, চাগ্‌লা)। যখন শুধোই, কী আসে যায় তাতে, উত্তর শুনি, দিল্লী নারাজ হলে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎও যে অন্ধকার। শেষ পর্যন্ত এই সেমিনার হল না। পরিচালক ভদ্রলোক দিল্লীতে বিস্তর তদ্বির করেও চাকরি বজায় রাখতে পারলেন না ; নতুন পরিচালক এখনো নিযুক্ত হননি ; দিল্লী নির্দেশ পাঠালেন সেমিনারের প্রস্তাব আপাতত ফাইলের নীচে চাপা রাখতে। মাঝখান থেকে এ. আই. সি. সির অধিবেশনের সূত্রে সস্ত্রীক শিক্ষামন্ত্রী তাঁর জনতিনেক উপমন্ত্রী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত এই প্রতিষ্ঠানে কয়েকদিন আহার-বিহার করে গেলেন। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত তুললেন না, এ. আই. সি. সির সদস্যরা কোন্ অধিকারে এই গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের আতিথ্য উপভোগ করেন। প্রশ্ন উঠবে কি করে, যখন প্রশ্ন যাঁদের তোলার কথা তাঁরা নিজেরাই প্রভুদের শরণার্থী।

চার

এখন এই অবস্থার জন্যে দায়ী করবে কাকে ? আমার বিশ্বাস নেহরুর উদ্দেশ্য ভালই ছিল ; তিনি চেয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীদের সম্মান এবং স্বীকৃতি দিতে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে গেলেন প্রলোভনের জালে—শিরোপা, খেতাব, বড় মাইনের চাকরি, খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ ইত্যাদির আকর্ষণ এড়াবার মত চরিত্রবল তাঁদের ছিল না। শিশির ভাতুড়ীর মত স্বাধীন-চেতা পুরুষ এদেশে আর ক'জনই বা দেখা গেল! তবু নেহরুর সময়ে কিছু স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান ছিল এদেশে, এবং সরকারের সমালোচনা করতে পারেন এমন কিছু বিরোধী দল এবং সাহসী ব্যক্তি। ইন্দিরার আমলে তাও প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন মুমূর্ষু দশা ; বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নানা প্রকাশ্য এবং গোপন অতিদিষ্ট প্রভাবের দ্বারা আক্রান্ত ; সংবাদপত্রের উপরে সরকারী উৎত্রাসনের অপচ্ছায়া ক্রমে বিবর্ধমান। পার্লামেণ্টে স্বাধীন বক্তা সম্প্রতি দুর্লভ ; বিরোধী দলেরা প্রায় নিরুপস্থ ; ইন্দিরা তাঁর নিজের দলকে এমন করে ভেঙে গড়ছেন, যাতে সে দলে কেউ আর না থাকেন যিনি নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষণার ওপরে নির্ভরশীল নন। তারই সঙ্গে তিনি দিল্লীতে গড়ে তুলছেন এক উচ্চশিক্ষিত পরিষদ গোষ্ঠী, যার সদস্যরা বিভিন্ন শাস্ত্রে কমবেশী ব্যুৎপন্ন, যাঁদের ভাষার ওপরে দখল আছে, কিন্তু যাঁরা সরকারের মুখাপেক্ষী এবং নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য যাঁরা নিজেদের স্বাধীন চিন্তা এবং প্রকাশকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

তবু শুধু সরকারী নেতৃত্বকে দায়ী করা অসঙ্গত ঠেকে। যাঁরা সরকারী ক্ষমতায় নেই তাঁদের প্রতিন্যাস, ক্রিয়াকলাপই বা কেমনতর? খবরের কাগজের মালিক এবং সম্পাদকরা সাংবাদিক স্বাধীনতা রক্ষায় কতটুকু আগ্রহী? অথচ ইংরেজ আমলে এঁদের অগ্রজদের মধ্যে অনেকেই বিস্তর ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন। এখন তাঁদের বেশীর ভাগই চান কায়েমী শক্তির সঙ্গে রফা করে চলতে। যে সংবাদ, রিপোর্ট, অথবা সমালোচনা কোনো প্রতিষ্ঠিত শক্তির অপছন্দসই হতে পারে, তাকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলাই এঁদের নীতি। আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থপ্রকাশকের মনোভাব এদের চাইতে কম ভীরু অথবা হিশেবী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়রাই বা কী করছেন? এক দিকে আর্থিক সমর্থন এবং সঙ্কটকালে পুলিশী সাহায্যের জন্য তাঁরা সরকারের মুখাপেক্ষী; অন্যদিকে ছাত্রবিক্ষোভের ভয়ে তাঁরা শিক্ষার মানকে যতদূর সম্ভব নীচুতে নামিয়ে এনেছেন। যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন না তাঁরাও নির্দলীয় স্বাধীন জিজ্ঞাসার টুঁটি টিপে ধরতে সক্রিয়।

সবই সত্যি, তবু বলি, এই অবস্থার জন্যে মুখ্যত দায়ী আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। সমাজে যা তাঁদের বিশিষ্ট বৃত্তি, ইতিহাসে যা তাঁদের মুখ্য অংশ, তার অকৈতব স্বীকারে তাঁরা পরাঙ্মুখ। স্বাধীন স্বাবলম্বী অনুসন্ধানের দ্বারা সমাজে গতি সঞ্চার করেন বুদ্ধিজীবীরা, ইতিহাসকে মুক্ত করেন আবর্তক ব্যর্থতা থেকে। ক্ষেতে ফসল ফলাতে তাঁরা পারেন না, কিন্তু মনকে জড়তার আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার সামর্থ্য তাঁরা রাখেন। কিন্তু সেই শক্তির উৎস হচ্ছে নিরন্তর অনুসন্ধান, অকম্প্যজিজ্ঞাসা, নির্ভীক প্রকাশ। প্রতিষ্ঠিত শক্তি, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, অভ্যাসের কাছে যে মুহূর্তে কোনো বুদ্ধিজীবী নিজের প্রশ্নশীলতাকে বন্ধক রাখেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আত্মিক অধঃপতন শুরু হয়; যা তাঁর বিশিষ্ট সামর্থ্য, যার জোরে তিনি ইতিহাসে এবং সমাজে বিবর্তনের বাহক, তা ক্রমে ব্যামোহগ্রস্ত হয়; তাঁর ভেতরকার বুদ্ধিজীবীকে গ্রাস করে সেখানে আবার দেখা দেন পুরুত মোল্লার প্রেত। নিজেদের তাঁরা ঠকাতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসকে ঠকানো যায় না।

এদেশের বুদ্ধিজীবীরা যে এত সহজেই প্রলোভনে ধরা দেন তার একটা কারণ হয়তো এদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য। কিন্তু এটাকেই প্রধান কারণ বলে মানা শক্ত। তাঁদের ভিতরে যে সম্পদ বর্তমান তাকে মূল্য দিতে শিখলে অভাবের চাপেও শিরদাঁড়া শক্ত রাখা সম্ভব। দিদেরো, টম পেইন, উইলিয়ম ব্লেক নিঃসম্বল অবস্থাতেও কোনো শক্তির কাছে মাথা নীচু করেননি; এদেশেও ফুলে, আগার-

করের মত মানুষ দেখা গেছে (অক্লান্ত উদ্যমে রক্ষণশীল সমাজের সমালোচনায় কলম চালিয়ে আগারকর যখন অল্প বয়সে মারা যান তখন শেষকৃত্যের কড়ি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি)। তাছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বুদ্ধিজীবীদের আর্থিক অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। গত বিশ পঁচিশ বছরে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপকদের রোজগার, অন্তত রোজগারের সম্ভাবনা, আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু মনের জোর বাড়ল কই।

আসলে বুদ্ধির যে একটা নৈতিক দিক আছে সেটা এদেশে বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় এবং জীবনে ব্যাপক এবং গভীর স্বীকৃতি লাভ করেনি। বুদ্ধির প্রাণশক্তি আসে জিজ্ঞাসা থেকে, এবং জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বৈমনস্য ঘটলে বুদ্ধিতে জাড্য সঞ্চারিত হয়। জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত রাখা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর মূল নীতি এবং দায়িত্ব। হিন্দু-মুসলমান যুগে জিজ্ঞাসাকে আচ্ছন্ন করেছিল আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নির্দেশ। ইংরেজ আমলে এই জিজ্ঞাসাবোধ কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিতসমাজ বুদ্ধির পথ থেকে সরে এলেন (প্রাচীনকালে বৌদ্ধরাও এই কাণ্ড করেছিলেন। নাস্তিক বুদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, আমার ওপরে নির্ভর ক'রো না, নিজের নিজের মনে প্রদীপ জ্বালাও, তারই শিখায় পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু বৌদ্ধরা শেষ পর্যন্ত খাড়া করলেন বেসুমার বোধিসত্ত্ব দেবদেবী এবং তাদের অবলম্বন করে প্রয়াস পেলেন ধর্ম এবং সঙ্ঘকে টিকিয়ে রাখতে)। যে শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুললাম তার উদ্দেশ্য তরুণ-মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা নয়, বরং জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থবিদ্যায় পারঙ্গম করাই তার উদ্দেশ্য। দেশ শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হল, কিন্তু হায়, মনের স্বাধীনতা এল না।

ফলত, যদিও সমকালীন ভারতবর্ষে কিছুটা রাজনৈতিক সুস্থিতি এবং আর্থিক উন্নতির লক্ষণ দৃশ্যত উপস্থিত, এখানকার মানসজগতে সায়াহ্নিক নির্বিঘ্নতা দ্রুত প্রসারমান। এবং মনের জগতে জড়তা বাসা বাঁধলে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক জগতেও ক্রমে জড়তা আসতে বাধ্য। তা যদি আমরা না চাই তা হলে এদেশে আবার স্বাধীন জিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এবং এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব মুখ্যত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের।

এই দায়িত্ব সম্পর্কে তুমি নিজে সচেতন। তোমার জীবনে এবং লেখায় তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তোমার মত আরো কিছু বিবেকবান বুদ্ধিজীবী এদেশে আছেন। তাঁরা সংখ্যায় অল্প; সেই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব বেশী। তাঁরা যদি

অকম্পনিষ্ঠায় তাঁদের স্বাধীন বুদ্ধির শিখা জ্বালিয়ে রাখতে পারেন তবে তারই আগুন থেকে হয়তো ক্রমে আরো অনেক প্রদীপ জ্বলে উঠবে। একদিন আমি তোমাদের পাশে কাজ করেছি—আজ কয়েকবছর ধরে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে আমার কর্মক্ষেত্র। সেখানেও স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব এবং প্রয়োজন কম নয়, এবং অন্তত তুমি জান, আমার অসংখ্য ত্রুটি থাকলেও দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা আমি করিনি। তবু মনে হয় তোমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসে কাজ করতে পারলে আমার মধ্যে যেটুকু জিজ্ঞাসার সামর্থ্য বর্তমান তার সবচাইতে সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। এবং সামর্থ্যের সার্থক প্রয়োগের বাইরে অন্য কোনো অমরত্বের সন্ধান তুমিও জান না, আমিও জানি না।

শুভার্থী

শিবনারায়ণ রায়

গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয় : উল্লেখ উদ্ধৃতি নির্দেশিকা

উদারতন্ত্রের অবক্ষয়

১। "Reason cannot desire for man any other condition than that in which each individual not only enjoys the most absolute freedom of developing himself by his own energies, in his perfect individuality, but in which external nature…receives an impress given to it by each individual of himself and his own free will, according to the measure of his wants and instincts and restricted only by the limits of his powers and his rights". Wilhelm von Humboldt, *Cosmos.*

২। John Stuart Mill, *On Liberty.*

৩। "The individual human being, with his interests, his desire for happiness and advancement, above all with his reason, which seemed the condition for a successful use of all of his other faculties, appeared to be the foundation upon which a stable society must be built… man as a bare human being, a 'masterless man', appeared to be the solid fact…Society is made for man, not man for society ; it is humanity that must always be treated as an end and not as a means. The individual is both logically and ethically prior…Relations always appeared thinner than substances ; man was the substance, society the relation". G. H. Sabine, *A History of Political Theory.*

৪। Jacob Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy.*

৫। "The Renaissance is the real cradle of that very unchristian concept and reality : the autonomous individual." Reinhold Niebuhr, *The Nature and Destiny of Man.*

৬। Erich Fromm, *Fear of Freedom.*

৭। "The 'autonomy' of reason was a principle quite alien to medieval thought". Ernst Cassirer, *The Myth of the State.*

৮। Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis*,, BK. I, Ch. I.

৯। "Natural rights···are but certain qualities inherent in persons and demonstrated by reason and recognized by natural law. ···The mother of natural law is human nature itself." ঐ, *Prolegomena*, BK. I. Ch. I, Sec 11 and 16.

১০। L. T. Hobhouse, *Liberalism..*

১১। Massimo Salvadori, *Liberal Democracy.*

১২। J. Salwyn Schapiro, *Liberalism and the Challenge of Fascism.*

১৩। S. N. Ray, *Radicalism* ; Ellen Roy and S. N. Ray, *In Man's Own Image.*

১৪। "···this romantic movement···stressed emotion rather than reason. It emphasized the collective mind, or *Volkgeist*, rather than individual reason. It focused attention on the nation, on national culture, rather than on the universal community of mankind." J. H. Hallowell, *The Decline of Liberalism as an Ideology.*

১৫। "Integral humanism maintained that···rights belong to individuals by virtue of their humanity···with the infiltration of positivism into politico-legal thought in the later half of the nineteenth century individual rights were conceived as legal rights···the implication was that as concessions on the part of the state, which willed them into existence, they could be contracted away or even abrogated, if the state so willed." ঐ।

১৬। M. N. Roy, *New Orientation* ; *New Humanism* ; ইত্যাদি।

।। গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি ।।

১। "By the end of the fourth millennium B. C. the *material* culture of Abydos, Ur, or Mohenjo-daro would stand comparison with that of Periclian Athens." V. Gordon Childe, *The Most Ancient East.*

২। "A sense of the value of the individual was the primary condition of the development of political thought in Greece. That sense had its manifestation as much in practice as in theory; and it issued into action in the shape of a practical conception of free citizenship of a self-governing community—a conception which forms the essence of the Greek City-State." Ernest Barker, *Greek Political Theory.*

৩। J. B. Bury, *A History of Greece.*

৪। "There is no exclusiveness in our public life, and in our private intercourse. We are not suspicious of one another, nor angry with our neighbour if he does what he likes; we do not put on sour looks at him which, though harmless, are not pleasant···Our city is thrown open to the world, and we never expel a foreigner or prevent him from seeing or learning anything of which the secret if revealed to our enemy might profit him··· We are lovers of the beautiful, yet simple in our tastes, and we cultivate the mind without loss of manliness··· An Athenian citizen does not neglect the State because he takes care of his own household···. The great impediment to action is, in our opinion, not discussion, but the want of that knowledge which is gained by discussion preparatory to action. For we have a peculiar power of thinking before we act and of acting too, whereas other men are courageous from ignorance but hesitate upon reflection." Thucydides, *History of the Peloponnesion War.*

৫। "The authority to make the law belongs only to those men whose making of it will cause a law to be better observed, or observed at all. Only the whole body of the citizens are such men. To them, therefore, belongs the authority to make the law." Marsilio of Padua, *The Defender of Peace*,, translated by Alan Gewirth.

৬। John Locke, *Two Treatises of Government.*

৭। "We hold these truths to be self-evident, that all men

are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights Governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute a new Government, laying its foundation on such principles and organising its powers in such form, as to them seem most likely to affect their Safety and Happiness." *American Declaration of Independence.*

৮। "...the right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, colour, or previous condition of servitude."

৯। "**Article I.** Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions can only be founded on common utility. **Article II.** The end of every political association is the conservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security and to oppression. **Article III.** The Principle of all sovereignty resides essentially in the nation." *Declarations of the Rights of Man by the French National Assembly*, 1789.

১০। Francis Williams, *Dangerous Estate : The Anatomy of Newspapers.*

১১। T. S. Mathews, *The Sugar Pill : An essay on Newspapers.*

১২। "...the great flatterer of the commonman : it assures him everyday how good he is, how right his prejudices are, how sound his head and heart, and how little anything matters that is outside his experience or understanding." ঐ।

১৩। "...a press campaign will fail if it flies in the face of public opinion...if it deals with an aspect of life beyond

the readers' daily experience or interest···But a compaign will flourish only if it is in tune with public opinion which already exists." Hugh Cudlipp, *Publish and Be Damned.*

১৪। Bernard Rosenberg and D. M. White, ed., *Mass Culture : The Popular Arts in America.*

১৫। "Modern artists are more market-oriented than taste-oriented. They create for anonymous consumers than for the sake of creation." Van Den Hagg, ঐ।

১৬। "The artist who by refusing to work for the mass-market becomes marginal, cannot create what he might have created had there been no mass-market." ঐ।

১৭। "···the great majority of good literature that might be published never gets into print in the first place : —is stillborn." Allan Deutscher. ঐ।

১৮। F. Wertham, *The Curse of Comic Books.*

১৯। Aristotle, *Politics.*

২০। Plato, *The Republie.*

২১। Richard Hoggart, *The Uses of Literacy.*

২২। T. K. Quinn, *Giant Corporations : Challenge to Freedom.*

২৩। A. A. Berle, Jr., *Economic Power and the Free Society.*

২৪। "Since the United States carries on not quite half of the manufacturing production of the entire world to-day, these 500 groupings—each with its own little dominating pyramid within it—represent a concentration of power over economics which makes the medieval feudal system look like a Sunday School Party.···" Barle, ঐ।

২৫। Walter Adams and Horace M. Gray, *Monopoly in America : The Government as Promoter.*

২৬। "Monopoly is not the result of an inevitable, dialectical or immutable process. There is no 'natural' law which transforms the good society···into···technocracy functioning under the aegis of socially irresponsible private power." ঐ।

২৭। "The government's toleration and promotion of monopoly in recent years has become a force of increasing

মৌমাছিতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৩। "...nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality..." Rabindranath Tagore, *Nationalism.*

১৪। "Patriotism is proud of its bulk. It would not acknowledge a difference which is fundamental...Power lies in number, and in extension...It talks of unity but forgets that true unity is that of freedom. Uniformity is unity in bondage." *Rabindranath Tagore, Letters from Abroad.*

১৫। "We must make room for Man, the guest of this age, and let not the Nation of this age obstruct his path" ঐ।

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **রাশিয়ার চিঠি**।

১৭। দ্রষ্টব্য—**ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান** পত্রিকায় প্রকাশিত ফ্যাসিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২০ জুলাই, ১৯২৬।

১৮। **রাশিয়ার চিঠি**।

।। জাতিবাদ, মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি ।।

১। Rabindranath Tagore, *Nationalism.*

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা আরো অনেকে সমর্থন করেছেন। সমকালীন নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে মিল্টন্‌ সিঙ্গার, বার্ণার্ড কোহ্‌ন্‌, প্রয়াত নির্মলকুমার বসু প্রভৃতির রচনার উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই ধারণার অসম্পূর্ণতা এবং কিছুটা একদেশদর্শিতা সম্পর্কেও সচেতন থাকা প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথ ভারত বলতে প্রায় সর্বত্রই হিন্দু ভারতের কথা ভেবেছেন, কিন্তু এই হিন্দু ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যেটুকু ঐক্য আছে তা গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ জাতিভেদ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য এই জাতি নেশন নয়, এটি হলো ইংরেজীতে যাকে বলা হয় কাষ্ট। এই জাতিভেদ প্রথায় যাঁরা নীচের তলার মানুষ তথাকথিত সামঞ্জস্যের উল্লেখে তাঁদের উল্লসিত হবার কোনো কারণ

নেই। যতি রাও ফুলের **গুলামগিরি** কিংবা আম্বেদকরের রচনাবলী পড়লে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

৩। ন্যাশনালিজ্‌ম্ বা জাতিপ্রেম ভারতবর্ষে যে পশ্চিমের কাছ থেকেই আমদানী করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সেটি লক্ষ্য করেছিলেন। জাতিবাদের বঙ্কিমী বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ থেকে খুব একটা আলাদা নয়, কিন্তু এঁদের দুজনের মূল্যায়ন একেবারেই বিপরীতমুখী। বঙ্কিম জাতিবাদের বিরোধী ছিলেন না; উল্টে "বন্দে মাতরম্" গানের ভেতর দিয়ে তিনি শিক্ষিত হিন্দু মনে জাতিবাদী প্রতিন্যাসকে প্রবল করে তোলেন।

৪। Rudolf Rocker, *Nationalism and Culture.*

৫। নৈরাজ্যবাদী চিন্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: G. Woodcock, *Anarchism.*

৬। Rudolf Rocker, *Anarcho-Syndicalism.*

৭। Rudolf Rocker, *Autobiography.*

৮। Rudolf Rocker, *Hinter Stacheldraht Und Gitter.*

৯। শত্রুজাতির প্রতি বৈরিতার প্রাবল্য না ঘটলে স্বজাতিপ্রেম যে দৃঢ় হয় না বঙ্কিম তাঁর সুবিখ্যাত "জাতিবৈর" প্রবন্ধে এটি স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োগবাদী মন এই সমষ্টিগত পৈশূন্যে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করেনি।

১০। Machiavelli, *The Prince.*

॥ তোতাকাহিনী ॥

১। মনুপরাশরের ধর্মশাস্ত্র কিংবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ জাতীয় গ্রন্থাদি থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হোল এই যে সমাজের ওপরের ধাপের এবং নীচের ধাপের মানুষদের মধ্যে ব্যবধান পূর্বনির্দিষ্ট, অমোঘ এবং নীতিসংগত। পরম্পরানির্ভর শিক্ষা অনুসারে অসৎ শূদ্রের দুরবস্থা নিয়ে ব্রাহ্মণতনয়ের মাথা ব্যাথা করবার কোনো কারণ নেই। মাথাব্যাথা যে এখনই খুব হয়েছে তা বলা শক্ত; তবে যেটুকু হয়েছে তা ভারতীয় শাস্ত্রপুরাণ পাঠের ফল নয়, তা হয়েছে মিল্, মার্ক্‌স্ প্রমুখ বিভিন্ন ম্লেচ্ছ পণ্ডিতদের রচনাদি পড়ে।

২। প্রথম যুগে প্রলেটারিয়েটের বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পর্কে এবং পরের যুগের ভবানী মন্দিরের স্বপ্নের কথা লিখলেও অরবিন্দ আসলে কেম্ব্রিজ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, নেহ্‌রু, সুভাষচন্দ্র, কেউই টোলের ছাত্র ছিলেন না, না তাঁরা পেয়েছিলেন কোনো কারিগরি শিক্ষা। টোলে পড়লে কিম্বা কারিগরি শিক্ষা পেলে এঁদের হয়ত বাক্‌ছল কিছুটা কমত, জীবনে আর একটু সারল্য আসত; কিন্তু লিবর‍্যাল শিক্ষা না পেলে এঁদের মনের প্রসার ঘটত কি?

৩। এ সম্পর্কে *Humanist Approach to Education* নামক রিপোর্ট পুস্তিকায় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

॥ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শিল্পীর স্বাধীনতা ॥

১। Plato, *The Republic.*

২। David Riesman, *The Lonely Crowd.*

৩। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি "The situation of the Contemporary Indian Writer" প্রবন্ধে। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় Times Literary Supplement, August 16, 1957 সংখ্যায়; পরে এটি আমার প্রবন্ধ গ্রন্থ *Apartheid in Shakespeare and other Reflections*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

॥ গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার ও "মূঢ়তার বিশ্বকোষ" ॥

১। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আমার লেখা *Explorations* গ্রন্থে "Baudelaire" প্রবন্ধ।

২। Edmund Wilson, *The Triple Thinkers.*

৩। Jean-Paul Sartre, *Situations, II.*

৪। G. Flaubert, *Correspondance, I,* পৃ: ২০১।

৫। G. Flaubert, *L' Education Sentimentale*, Pt. III, Ch. 6.

৬। G. Flaubert, *A Dictionary of Platitudes*, Translated by Edward G. Fluck.

৭। G. Flaubert, *Correspondance, I,* পৃ: ৩৩৭।

৮। G. Flaubert, *Correspondance, II,* পৃ: ১৫৭।

৯। Ezra Pound, "James Joyce et Pecuchet", *Murcure de France*, June 1, 1922.

১০। G. Flaubert, *Lettres inédites a Raoul Duval.*

স্রষ্টা বনাম সৃষ্টি : ব্রেখ্‌ট্‌-এর একটি নাটক

১। Mikhail Sholokov: "...the gray flood of colourless mediocre literature which has swept our literary magazines and is inundating the book market." Olga Bergholtz: "From our lyrical poetry love has disappeared almost completely, just as nude bodies have disappeared from our paintings, and movement has gone out of our movies." Gleb Struve, "The Second Congress of Soviet writers," *Problems of Communism*, March-April, 1955.

২। John Willett, *The Theatre of Bertolt Brecht.*

৩। Bertolt Brecht, *Mann ist Mann.*

৪। Bertolt Brecht, *Mahagonny.*

৫। Bertolt Brecht, *Die Dreigroschenoper.*

৬। Bertolt Precht, *Gesammelte Werke II, Die Massnahme.*

৭। এই নাটকটির আখ্যানবস্তুর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন: Brandt, Schwarz and Fairbank, *A Documentary History of Chinese Communism*; Robert North, *Moscow and Chinese Communists*; H. Isaacs, *The Tragedy of the Chinese Revolution*; এবং M. N. Roy, *Revolution and Counter-Revolution in China.*

৮। দ্রষ্টব্য Herbert Luthy, "Of Poor Bert Brecht", *Encounter*, July, 1956.

৯। Martin Esslin, *Bert Brecht.*

১০। Bertolt Brecht, "Ausfuehrungen Von der Sektion Dramatik", *Beitrage Zur Gegenwartsliteratur*, January 1956.

॥ নায়কের মৃত্যু ॥

১। J. Burckhardt, *The Civilisation of the Renaissance in Italy..*

২। এ সম্পর্কে E. Barker, *Greek Political, Theory* এবং K. Popper, *The Open Society and its Enemies*, Part I, Ch 10, দ্রষ্টব্য।

৩। Pico della Mirandola, *Discourse on the Dignity of Man.*

৪। E. Cassirer, *Individual and Cosmos in the Philosophy of the Renaissance.*

৫। Cassirer, Kristeller and Randall, *The Renaissance Philosophy of Man.*

৬। Marlowe, "The Passionate Shepherd to his Love"; Shakespeare, *Sonnets*, No. CXVI; John Donne, "The Sunne Rising."

৭। *Othello*, V. 2; *Hamlet*, V. 1; *Antony and Cleopatra* V. 2.

৮। John Webster, *The White Devil, Or Vittoria Corombona.*

৯। T. S. Eliot, *Selected Essays*, "Shakespeare and the Stoicism of Seneca".

১০। Stendhal, *Le Rouge et le Noir.*

১১। Machiavelli, *The Prince.*

১২। Hugo Grotius, *Prolegomena.*

১৩। J. Burckhardt, *The Civilisation of the Renaissance in Italy.*

১৪। Lyrical Ballads-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৫। ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাস সম্পর্কে এ কথা অবশ্যই খাটে না। ডস্টয়েভ্স্কি মহৎ শিল্পী; তাঁর কল্পনার গভীরতা এবং তীব্রতা আমাদের অভিভূত করে; কিন্তু তিনি মোটেই উদারতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত নন, বরং তাঁর প্রত্যয় ঘোষিতভাবে উদারতন্ত্রবিরোধী। সাহিত্যিকের বিশ্বাস এবং তাঁর সাহিত্য-কর্মের মূল্য—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের যে কূটাভাষ তার বিচার স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দাবী করে।

১৬। Ezra Pound, *ABC of Reading.*

১৭। "Le Poete est semblable au prince des nueés
Qui hante la tempe'te et se rit de l'archer;
Exile' sur le sol au milieu des hueés,
Ses ailes de ge'ant l'empe'chent de marcher". Charl'es Baudelaire, "L' Albatros".

১৮। T. S. Eliot, *Collected Poems*, "Portrait of a Lady".

১৯। T. S. Eliot, *Collected Poems*, "Geron tion".

২০। T. S. Eliot, *The Family Reunion.*

২১। T. S. Eliot, *Sweeney Agonistes.* এলিয়টের জগৎ সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে *Mysindia* (1945-46) এবং *Le Courrier des Indes* (1948) নামা দুটি পত্রিকায় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২২। Aldous Huxley, *Those Barren Leaves.*

২৩। Ernest Hemmingway, *Death in the Afternoon.*

২৪। Jean-Paul Sartre, *La Nauseé*

২৫। Aldous Huxley, *The Perennial Philosophy.*

২৬। Virginia Wolfe, *The Years.*

২৭। Virginia Wolf, *Night and Day.*

২৮। Franz Kafka, *Das Schloss.*

২৯। Franz Kafka, *Der Prozess.*

৩০। এই প্রসঙ্গে আমার *Explorations* নামক গ্রন্থে "The Crisis in Modern Literature" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৩১। Albert Camus, *Letters to a German Friend.*
কামুর জীবনদর্শন এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা আছে আমার *Apartheid in Shakespeare* গ্রন্থের "The Tragic Humanism of Albert Camus" প্রবন্ধে।

পরিশিষ্ট "ক"

জন্মসূত্রে, শিক্ষাসূত্রে, জীবিকাসূত্রে এবং মনের গঠনের দিক থেকে আমি অনস্বীকার্য ভাবে নিতান্তই শহুরে মানুষ। শহরে শুধু বস্তী আর অট্টালিকা নেই, ভাবনার এবং উদ্‌ভাবনার বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত শহুরে জীবনের বৈশিষ্ট্য। গ্রামে এ জিনিস মেলে না, এবং ফলে গ্রাম্যজীবনের শুদ্ধতা নিয়ে শহুরে উচ্ছ্বাস আমার কাছে চিরদিনই অসৎ মনে হয়েছে।

তা সত্ত্বেও অনেকের মত আমিও অল্প বয়সে বুঝতে পারি গ্রামের জীবনে প্রাণের সঞ্চার না ঘটলে এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ গ্রামবাসী এবং গ্রামদের শুষে শহরদের স্ফীতি গ্রাম এবং শহর উভয়ের পক্ষেই সর্বনাশের কারণ। কিন্তু গ্রামের ভিতর থেকেই যে গ্রামের উজ্জীবন ঘটবে একথায় আমি তখনো বিশ্বাস করতাম না, এখনো করি না। গ্রামের উজ্জীবন ঘটতে পারে যদি শহর থেকে উদ্যোগী, কর্মিষ্ঠ, আদর্শবাদী, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এসে সেখানে নতুন ভাবনাচিন্তা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে বসবাস করেন, এবং সেখানেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র পড়ে তোলেন। তবে একথা লেখা যত সহজ, এ কাজ করা ততটাই কঠিন।

করা যে কত কঠিন যৌবনকালে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সেটা টের পাই। আমার ওপরে গান্ধীর কোনো প্রভাব পড়েনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা পড়ে প্রথম যৌবনেই সিদ্ধান্তে আসি, এদেশে সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন যে অনেকটাই ব্যর্থ তার কারণ ঐসব আন্দোলন সাধারণ গ্রামবাসীর চিন্তায় এবং জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। এই সিদ্ধান্তের ফলে অধ্যাপনা ছেড়ে কিছুকাল গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ শুরু করি। এবং তখন অভিজ্ঞতা সূত্রে বুঝতে পারি এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করার সামর্থ্য আমি আদৌ অর্জন করিনি। শেষ পর্যন্ত তাই হার স্বীকার করে আবার শহরে ফিরে আসতে হয়েছে, এবং তারপর থেকে এক শহর থেকে আর এক শহরে ঠিকানা বদল করে চলেছি।

নিজের ব্যর্থতা থেকে বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনে যে উদ্যোগ করেছিলেন তা কত অভিনব, দুঃসাহসী এবং অর্থপূর্ণ।

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন উদ্যোগের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এদেশের গ্রামজীবনে প্রাণসঞ্চারের সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। এই উদ্যোগের কয়েকটি দিক আমার কাছে প্রায় তুলনাবিরহিত মনে হয়। আধুনিক কালে বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানকে আমরা শহরের পরিবেশে ভাবতেই অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গ্রামের পরিবেশে একটি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে যেখানে দেশবিদেশের উচ্চকোটির জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ ঘটবে, এবং যেখানে সেই জ্ঞানীগুণীরা অকৃপণভাবে তাঁদের অনুশীলনের অংশভাক্ করে নেবেন অনুসন্ধিৎসু তরুণ-তরুণীদের। গ্রামে প্রাণসঞ্চারের একটি প্রধান পন্থা জ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রামের সঙ্গে বিশ্বের আত্মীয়তা রচনা এবং শুধু লেখার ভিতর দিয়ে এই পথের নির্দেশে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে এই পথ নির্মাণেও রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে মাত্র জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিশেবে ভাবেননি। তিনি চেয়েছিলেন সেখানে তারি সঙ্গে সৃজনীশক্তি এবং সৌন্দর্যচেতনারও বিকাশ ঘটাতে। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছি; সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বিচিত্রমুখী পরিকল্পনা সেইসব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানেও এখনো প্রায় কল্পনাতীত। সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য এবং চিত্রাঙ্কনও যে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মত অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়, এদের চর্চার ব্যবস্থা না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান, এই সহজবোধ্য সত্যটি শুধু এদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও বেশীর ভাগ শিক্ষাব্রতী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। জ্ঞান, কল্পনা, সৃষ্টিশীলতা, রূপের আবেদনে সাড়া দেবার সামর্থ্য—এ সবই যে মনের বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন, এবং সেই কারণে তিনি বিশ্বভারতীতে এই ধরনের বহুমুখী চর্চার আয়োজন করেছিলেন। গ্রামের স্তিমিত জীবনে তিনি শুধু জিজ্ঞাসাকেই জাগ্রত করতে চাননি, তারি সঙ্গে ছন্দান্বিত আত্মপ্রকাশকেও বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার এটি হল দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বনাগরিকতা, জ্ঞানচর্চা এবং সৃজনধর্মী রূপচেতনার সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার সংযোগসাধন। এই বৈশিষ্ট্যটি রূপ পায় শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে। জ্ঞান, কল্পনা এবং সৃষ্টির একটি ব্যবহারিক দিক আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিয়ে আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তাতে এদিকটি অবহেলিত। জীবনের শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির ওপরে বিশেষ জোর দেন। তিনি চেয়েছিলেন যে ছাত্র-

ছাত্রীরা একদিকে নানা রকমের হাতের কাজ শিখবে, অন্যদিকে গ্রামের মানুষরা নানা বিচিত্র এবং প্রকৃষ্টতর প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্যে তাদের পরিশ্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবে। তার ফলে যেমন গ্রামে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেবে, তেমনি শিক্ষিতদের পক্ষেও হয়ত স্বনির্মিত বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণ সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব পরিকল্পনা এবং অনন্য উদ্যম তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শান্তিনিকেতনের পতন সূচিত হয়। চাপে পড়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তিনি আংশিক রফা করেন এবং যেহেতু বেশীক্ষণ সিধে হয়ে দাঁড়ানো আমাদের ধাত নয়, বসতে দিলে শুতে চাওয়াটাই আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান করি, সেহেতু রবীন্দ্রনাথের অভিনব এবং সর্বোদয়ী শিক্ষা-পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা তাঁর মৃত্যুর পরেই দ্রুত অবসন্ন এবং নির্বিঘ্ন হয়ে পড়ে। একদিকে গুরুভজাদের দল প্রয়াস পান রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালী প্রতিভাকে সুডৌল শালগ্রামশিলা-রূপে উপস্থিত করতে; অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে ডিগ্রী এবং চাকরীর কাছে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার যে প্রতিন্যাস প্রবল হয়ে ওঠে তার সংক্রাম থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করা ক্রমেই কঠিনতর হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে গত কয়েক দশক ধরে শান্তিনিকেতনের এই সংকট চলছে; যে সব মনীষীরা এখানে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ নিয়ে এসেছেন, সংকটের তাঁরা কোনো নিরাকরণ করতে পারেননি। মাঝখান থেকে তাঁরা নিজেরাই অনেকে অনবস্থ, ভোগবৃত্ত, অসূয়ক অথবা মর্ষকামী পুরুষে পর্যবসিত হয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের এই সংকট এবং ট্রাজেডি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টাকে কোনো মতেই একটি অধ্যাস বা জাগরস্বপ্ন ভাবা চলে না। বরং আমার ধারণা বর্তমানে এই দেশে প্রায় সর্বত্র যে অপজাত এবং উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত যদি তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে কোনো উপযোগী এবং অর্থপূর্ণ ব্যবস্থা আনবার চেষ্টা হয় তাহলে সেই চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের উদ্যম থেকে কয়েকটি মূল্যবান সূত্র পেতে পারে।

প্রথম সূত্র হল শিক্ষার কেন্দ্রে অনুসন্ধিৎসাকে আবার জাগিয়ে তোলা, এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই সম্পর্কের ভিত্তি হবে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সহযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় যে আসলে জিজ্ঞাসু এবং ভাবুকদের প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানের সাধনায় অধ্যাপক এবং ছাত্র যে

পরস্পরকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেন, এই কথাটি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। জিজ্ঞাসা নয়, মুখস্থবিদ্যা ; জ্ঞানার্জন নয়, পরীক্ষাপাশ ; বুদ্ধির মুক্তি ঘটানো নয়, নির্বোধ চৌকিদারী—এসবই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আচ্ছন্ন করেছে। দ্বিতীয় সূত্র হল সৃষ্টিশীল আত্মপ্রকাশকে শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা—চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, কাব্য ইত্যাদিকে বিলাস বা অবসর-বিনোদনের উপায় মনে না করে প্রকৃত শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দেওয়া। মনের বিকাশে তথ্য-সংগ্রহ এবং বিমূর্ত চিন্তার চাইতে অনুভূতি এবং কল্পনার স্থান যে কোনো দিক থেকেই খাটো নয়, এটি রবীন্দ্রনাথ যত স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন সম্ভবত অন্য কোনো শিক্ষাবিদ্ তেমনটি করেন নি। তৃতীয় সূত্র হল, শিক্ষার ভিতর দিয়ে বিশ্বনাগরিকতা-বোধের প্রতিষ্ঠা। কয়েক হাজার বছর ধরে নানা অঞ্চলে নানা ধরনের মানুষ সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, সমাজ-সংগঠনে, প্রযুক্তিবিদ্যায় যা কিছু আকার দিয়েছেন তার সবটাই যে পৃথিবীর সব মানুষের বৈশ্বিক উত্তরাধিকার, এই বোধ গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, শঙ্কর এবং ভিটগেনস্টাইন যা বলেছেন অথবা লিখেছেন তা যে আমাদের সকলেরই যৌথ সম্পদ এটি না বোঝা পর্যন্ত আমরা আমাদের গ্রাম্য-সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হই না। চতুর্থ সূত্র হল শিক্ষার ভিতর দিয়ে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মনে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা এবং সেই দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করা। আমরা যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি অন্যের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া যে আমাদের ন্যূনতম কর্তব্য, এই বোধ ছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ।

এই ধরনের চতুরঙ্গ উদ্যম সারা ভারত জুড়ে একসঙ্গে শুরু হবে এমন দুরাশা আমি করি না। কিন্তু একটি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি এই ধরনের উদ্যম সূচিত হয় তাহলে হয়ত দেশের সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের আবহাওয়ায় কিছুটা ভরসার সঞ্চার হতে পারে। আমার মনে হয় এই উদ্যম শান্তিনিকেতনে সম্ভব—কারণ সেখানে রবীন্দ্রনাথ এই উদ্যমের ভূমিকা স্বয়ং রচনা করে গেছেন। সেখানে অঙ্গগুলি সবই বর্তমান, কিন্তু সেখানে সম্প্রতি প্রাণের ধারা বড় ক্ষীণ। সেখানে কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনের দিক থেকে (এবং অনেকে দেহের দিক থেকে) জরাগ্রস্ত—রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একদা আশ্রয় দিয়েছিলেন এই দাবী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। প্রাণের প্রকাশ উদ্ভাবনায়, এবং উদ্ভাবনার তাঁরা বিরোধী। সেখানে আরেক ধরনের স্ত্রী-পুরুষ আছেন যাঁরা চাকরীসূত্রে বিশ্ব-ভারতীতে এসেছেন, শিক্ষা সম্পর্কে কোনো আদর্শ যাঁদের সেখানে বিশেষভাবে

আকৃষ্ট করেনি। ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা অর্জন করা অথবা তাদের মনের জিজ্ঞাসার প্রকাশের, কর্তব্যজ্ঞানের স্ফুরণ করা যাঁদের সাধ্যাতীত। ফলত শান্তিনিকেতনের পুনরুজ্জীবনের জন্য এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন যে নেতৃত্বে জ্ঞান, সুবেদিতা, শিল্পবোধ এবং দায়িত্বচেতনা প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার সামর্থ্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। ফতোয়ার জোরে সঙ্কটমোচন হয় না।

পরিশিষ্ট "খ"

রবীন্দ্রনাথ, রেনেসাঁস ও জীবনজিজ্ঞাসা

(শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি)

মাননীয় উপাচার্য মহাশয়, সমবেত সুধীবৃন্দ এবং স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রীরা—

আজকের এই উৎসব অনুষ্ঠানে আপনারা যে আমাকে সভামুখ্যের আসন গ্রহণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন তাতে আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। বিশ্বভারতীর যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন এযুগের সব চাইতে বহুমুখী প্রতিভা, এবং বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ করে তাঁদের ঋণ একেবারেই অপরিশোধ্য। শান্তিনিকেতনের অতিথি হওয়া যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সৌভাগ্য। এখানকার শালবীথিতে এবং আম্রকুঞ্জে, রাঙা ধুলোয় এবং আকাশে-বাতাসে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ছড়ানো। তাঁর বিচিত্র এবং অমেয় সৃজনী-শক্তির অন্যতম প্রকাশ এই বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর বহু দেশ ঘোরা সত্ত্বেও যার সঙ্গে তুলনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার অন্তত নজরে পড়ে নি।

এই অনুষ্ঠানে কিছু বলবার জন্য উপাচার্য মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেছেন। বর্তমান উপলক্ষ্যে কোনো জটিল বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, সে চেষ্টা সঙ্গতও মনে হয় না। পরে তার সুযোগ ঘটলে খুশী হব। আপাততঃ সংক্ষেপে একটি সরল প্রস্তাব আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এটি বিবেচনা করবেন আশা রাখি।

অধ্যয়নের নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকে। রবীন্দ্রনাথ সচেতন প্রযত্নে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে শিশু, কিশোর এবং তরুণ মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে সাড়া দেবার সামর্থ্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যাভিনয় চর্চার সূত্রে ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রকাশ এবং কল্পনা-শক্তির বিকাশ, নানা দেশ থেকে বিদ্বজ্জনের সমাগম ঘটিয়ে ছাত্রছাত্রীদের চেতনাকে গ্রাম্যতা এবং আঞ্চলিকতা থেকে বৈশ্বিকতার বোধে উত্তরণ, নানাবিধ প্রযুক্তি-বিদ্যা এবং উন্নয়ন-উদ্যোগের সূত্রে কৃষক এবং কারিগর সমাজের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আন্তর সম্পর্ক গড়ে তোলা, এ সবই তিনি যথার্থ শিক্ষার অঙ্গ-রূপে দেখেছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টার কতখানি আজো এখানে জীবন্ত, আপনারা তা বলতে

পারবেন। তিরিশ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা এবং প্রয়াস যেমন অভিনব তেমনি অসামান্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

সর্বাঙ্গীন বিকাশের আদর্শ স্বীকার করার পরও কিন্তু আমার মনে হয় অধ্যয়নের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধিসাধন। এই সহজ কথাটিতে যদি আপত্তি না ওঠে তাহলে এবার আমার মূল প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারি। সেটি হল জ্ঞান সম্পর্কে। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে পরম্পরাসূত্রে একটি ধারণা দৃঢ়মূল যে পরাজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান ; এই জ্ঞান পরিশুদ্ধ চেতনায় অপরোক্ষানুভূতিরূপে প্রতিভাত হয় ; তারপর সেই জ্ঞান সূত্রাকারে বা মন্ত্রাকারে শব্দে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞান অপ্রতর্ক্য, স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণিক। এই সব সূত্রের ভাষ্য করা চলে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে না।

জ্ঞান সম্পর্কে পরম্পরাপোষিত এই ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ত্যাগ করেন নি। কিন্তু জ্ঞানের যে অন্যরূপ এবং প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আছে সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন, এবং আমার মনে হয় 'সবুজ পত্রে'র যুগ থেকে এই চেতনা তাঁর মনে ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রহ্মজ্ঞানে বিশ্বাস সম্ভবত তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু অন্য চেতনা তাঁকে ক্রমেই কিছুটা দ্বিধান্বিত, কিছুটা সংশয়ী করে তুলেছে।

জ্ঞানের এই অন্য রূপটি কি? সেটি হোল এই যে স্থানকালপাত্রনির্ভর যে অস্তিত্ব সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞানেই পূর্ণতা সম্ভবপর নয়। এই জ্ঞান আরোহী, তথ্য এবং বিশ্লেষণ-নির্ভর ; এই জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিটি প্রকল্পই বিচার এবং প্রমাণসাপেক্ষ। এই জ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ; যাঁরা এই জ্ঞানের সাধনায় নিযুক্তপ্রাণ তাঁরা স্বপ্নেও ব্রহ্মজ্ঞতা দাবি করেন না। তাঁরা বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে এক একটি সূত্রে তাদের ধারণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সচেতন যে নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে অথবা অপর জ্ঞানান্বেষীদের সমালোচনার আঘাতে তাঁদের প্রকল্পিত সূত্র অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে পারে। তাঁদের অধ্যাবসায়ের কেন্দ্রে যে শক্তি নিয়ত সক্রিয় তার নাম জিজ্ঞাসা। যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীকৃষ্ণ অথবা মনুপরম্পরাদের দ্বারা তাঁরা এই শক্তির সংবেশন হতে দেননা। শুধু স্মৃতিকে নয়, শ্রুতিকেও তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ অথবা অব্যয় বলে মেনে নিতে একেবারেই গররাজি।

ভারতবর্ষেও যে একসময়ে আরোহী জ্ঞানের চর্চা ছিল তার কিছু কিছু

ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে, কিন্তু সেই ধারা একসময়ে অবসিত হয়। কেন হয় তারা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি, এখানে সেকথা তুলবনা। জিজ্ঞাসাবোধের অবচয়ের ফলে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা প্রায় লোপ পায়, নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চা গড়ে ওঠেনা। তার বদলে আমাদের মননের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র—এবং অধিকাংশ মানুষ আচারবিচারের দমবন্ধ কড়াকড়ি থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তির আশায় আশ্রয় খোঁজে গুরুভজনায় এবং ভক্তিমার্গে। উনিশ শতকে পশ্চিমী শিক্ষার সূত্রে এদেশে আবার ইতিহাস এবং বিবিধ বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়, এবং আমার ধারণা বাঙলাদেশে আমরা যাকে রেনেসাঁস আখ্যা দিয়ে থাকি সেটি মুখ্যত এই পশ্চিমী শিক্ষার ফল।

এখন রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একদিকে যেমন উপনিষদ্ অপ্রতর্ক্য জ্ঞানের সূত্র হিশেবে উপস্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তিনি বিজ্ঞানের আরোহী, পরোক্ষ, প্রশ্নশীল এবং প্রায়োগিক রূপটিকেও বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু এই দুই রূপের মধ্যে তিনি যে কোনো সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন, এ সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ আছে। বস্তুত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা থেকেই জ্ঞান সম্পর্কে দ্ব্যর্থক প্রতিন্যাস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থিত এই বিশ্বাসে রামমোহন রায় বিভিন্ন নির্বাচিত উপনিষদের অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং প্রচার করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে ভারতবর্ষ যদি প্রাক্-বেকনীয় ইয়োরোপের মত তামসিকতায় আচ্ছন্ন না থাকতে চায় তাহলে ইংরেজির সূত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে অবিলম্বে আবশ্যক। পুরো উনিশ শতক ধরে বাংলাদেশের ইংরেজিশিক্ষিত মনীষীরা মনস্থির করতে পারেন নি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আরোহী পদ্ধতিকেই তাঁরা প্রাধান্য দেবেন, না বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির অপ্রতর্ক্য প্রাধিকার ঘোষণার দ্বারা স্বাজাত্যাভিমানকে তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন। আমার সন্দেহ যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চকোটির ভাবুকদের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যে দোনামনা ভাবটি কমবেশী চোখে পড়ে অনেকটা তারি সুযোগ নিয়ে উনিশ শতকের শেষ পাদে কেশবচন্দ্র-বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের ভক্তিবাদ বাঙালীর চিন্তাজগৎকে আচ্ছন্ন করে। সেই ভক্তিবাদ জাতিপ্রেমের মিশ্রণে এক প্রচণ্ড ভাবাদর্শের মাদক হয়ে ওঠে।

এখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ভক্তির একটি গভীর এবং প্রবল ধারা ছিল যা

বিশেষ করে তাঁর বহু সার্থক গানে উৎসরিত। কিন্তু জ্ঞানের চর্চায় জিজ্ঞাসা এবং আরোহী প্রক্রিয়াকে তিনি তুচ্ছ করেন নি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে "সবুজ পত্রে"র যুগ থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতির ওপরে জোর তাঁর রচনায় স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। "চতুরঙ্গে"র "জ্যাঠামশাই"-এর মধ্যে তিনি যে মহাব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অজ্ঞাবাদী পুরুষের ছবি এঁকেছেন তা থেকে সম্ভবত রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের কিছুটা ইঙ্গিত মেলে। পরে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর যে প্রবল মতবিরোধ ঘটে তার নানা সূত্রের মধ্যে একটি প্রধান সূত্র হল বিজ্ঞান-সম্পর্কে উভয়ের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য। এটি বিশেষ করে তাঁর "সত্যের আহ্বান" নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন :

"মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না ; আমরা বিশ্বাস-যোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবী করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।...বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয় তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।...বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলিনে। কিন্তু সুবিধা এই যে বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।"

কিন্তু এসব কথা বলা সত্ত্বেও ঐ "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে সরে গিয়ে এমন উপমা-উদ্ধৃতির প্রয়োগ করেছেন যা জিজ্ঞাসাবুদ্ধির সমর্থক নয়। তিনি লিখেছেন : ৮

"একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্দ্ধরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা॥

জল সকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে, ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে... !"

মুস্কিল হল, প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী কোনো দীক্ষাগুরুর "সত্যজ্ঞান"কে যদি বিনা বিচারে এবং প্রমাণে "অমর" বলে গ্রহণ করা যায়, তবে গান্ধীজীর "সত্যজ্ঞান"কেই বা অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্ত বলা চলে কোন ভিত্তিতে? জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাধিকার মানলে গান্ধীজীর প্রাধিকার অস্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক গুরুই নিজের জ্ঞানের স্বয়ংসিদ্ধতা দাবি করবেন এবং চেলারা সেই দাবির সম্প্রচারে নিযুক্ত হবেন। অর্থাৎ আগের মতই বিশ্বাসের কাছে জিজ্ঞাসার বলিদান ঘটবে। আমার অনুমান ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ তাঁর অনুসন্ধিৎসু যুক্তিশীলতাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেতে দেয়নি, এবং শেষের দিকে তাঁর মনে দ্বিধা প্রবল হয়ে উঠলেও তিনি বিশ্বাস বা অপ্রতর্ক্য জ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করেন নি। তিনি যে আনন্দ এবং মঙ্গলময়তার কথা বারবার ঘোষণা করেছেন তাঁর মত মহাশিল্পীর ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত অনুভবের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু আমরা যারা এক মহাযুদ্ধের শেষে জন্মেছি, যাদের যৌবন কেটেছে আরেক মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর এবং দেশভাগের মধ্য দিয়ে তাদের পক্ষে ঐশ্বরিক মঙ্গলময়তার প্রকল্পে বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বানিয়ে পুজো করার মধ্যে আমি তাঁর ভাবুক হিশেবে ব্যর্থতা দেখতে পাই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার রেনেসাঁস যদি ক্ষীণ হয়ে এসে থাকে এরি ভিতরে তার একটি সম্ভাব্য কারণ মিলতে পারে।

ফলত পশ্চিমী শিক্ষার এদেশে প্রসার ঘটলেও যে অদম্য কৌতূহল এবং অক্লান্ত অনুসন্ধান বিজ্ঞানের এবং সমাজজীবনের বিকাশের মূল সূত্র, আমাদের শিক্ষার কেন্দ্রে তা আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আপনারা যাঁরা আগামী দশকের নবীন ভাবুক, যাঁরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের বৃত্তি এদেশের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম, তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবোধকে জাগিয়ে তুলে থাকেন এবং সেই বোধকে অপরের মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনাদের শিক্ষা প্রকৃত ফলপ্রসূ হবে। আপনাদের কাছে আমার এই প্রত্যাশা নিবেদন করি। শিক্ষিত তরুণতরুণীদের কাছে একজন প্রবীন জিজ্ঞাসুর এই প্রত্যাশা কি নিতান্ত অসঙ্গত?

শিবনারায়ণ রায়